

শাইখ ড. মুহাম্মাদ সায়িদ রামাদান বুতি

ফিকহুস সিবাহ

নবি-জীবনের পাঠ : শিক্ষা ও উপদেশ

অনুবাদ

মুসা আমান

উবায়দুল্লাহ তাসনিম

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

ফিকহুস সিরাহ

(নবি-জীবনের পাঠ : শিকা ও উপদেশ)

ফিকহুস সিরাহ (প্রথম খণ্ড)

(নবি-জীবনের পাঠ : শিক্ষা ও উপদেশ)

রচনা

শাইখ ড. মুহাম্মাদ সায়িদ রামাদান বুতি

মধ্যপ্রাচ্যের প্রখ্যাত আলিম ও ফকিহ

অনুবাদ

মুসা আমান

উবায়দুল্লাহ তাসনিম

ভাষা সম্পাদনা

জাবির মুহাম্মাদ হাবীব

ইইদিত

ফিকহুস সিরাহ (প্রথম খণ্ড)
(নবি-জীবনের পাঠ : শিখা ও উপদেশ)

প্রবন্ধক © ইহুদিনা পাবলিকেশন

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

মুকতি হাবীবুল্লাহ, মাওলানা ইয়াহইয়া, যামেদ মুহাম্মাদ, আম্মার আবদুল্লাহ,
কাজী আকরাম, রুহুল আমিন, উবাইদ উসমান ও অন্যান্য

প্রকাশকাল

প্রথম বাংলা সংস্করণ : অক্টোবর ২০২১

দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ : জুলাই ২০২৪

অনলাইন পরিক্ষক

বইকেন্দ্র, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, ইহুদিনা, মানজিল, বইফেরী, বইসদাই

প্রবন্ধ ডিজাইন

ফয়সাল মাহমুদ

পৃষ্ঠাসজ্জা

মানজিল গ্রাফিক্স

ISBN : 978-984-34-7806-1

মুদ্রিত মূল্য : ৬০০ টাকা

প্রকাশনার

ইহুদিনা পাবলিকেশন

দোকান নং-২১, ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৭০৭-৭৫২০৪৪

অর্পণ—

পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটে, অনেক কিছুই ঘটবে; কিন্তু বুকে
হাত দিয়ে বলছি—প্রাণপ্রিয় রাসূল, পৃথিবীতে আপনার
আগমনের চেয়ে বড়ো কোনো ঘটনা নেই।

আমরা আপনার অক্ষম উন্মত। প্রিয় হাবিব, আমাদের সকল
কিছুর চেয়ে আপনার সম্মান ও ইচ্ছিত আমাদের কাছে সবচেয়ে
মূল্যবান। তাই আমাদের এই বই আমরা সযতনে অর্পণ করছি
আপনার ইচ্ছিত ও সম্মানের তরে। এই বইয়ের সাওয়াব তাদের
প্রতিও অর্পিত, যারা আপনার সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট ছিল, আছে
এবং থাকবে। কারণ, আমরা তো আপনাকেই জীবনের চেয়ে
বেশি ভালোবাসি, প্রিয় রাসূল!



প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহর অশেষ কৃপা, বইটি অবশেষে আপনাদের জন্য প্রস্তুত করা গেল। এ শুধুই আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানি। আমাদের কোনো যোগ্যতা নেই; আল্লাহ তায়ালার দয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল।

‘ফিক্‌হুস সিরাহ’ ছিল ইহদিনা পাবলিকেশনের স্বপ্ন পূরণ প্রজেক্ট। আল্লাহ তায়ালা তা পূরণ করেছেন। এরচেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে! এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমরা হৃদয় নিংড়ে কিশুণ্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার কাছে নিবেদন করতে চাই—হে আল্লাহ, আপনার প্রিয় হাবিবের জীবনীর ওপর আমাদের এই আন্তরিক কাজের বদলা হিসেবে আপনি আমাদের জ্ঞানাত দান করবেন। এটিই আমাদের জীবনের প্রধান চাওয়া। এই দুআ প্রজেক্ট-সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তির জন্য। লেখক, অনুবাদক, সম্পাদকসহ এই বইয়ের বিভিন্ন অংশে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন, এই দুআ তাদের প্রত্যেকের জন্য।

বইয়ের ঢাকা ও হাদিসের নক্সাবিবয়ক একটি কথা আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলে রাখতে চাই—এগুলোর অধিকাংশ মূল বইয়ে থাকা রেফারেন্সের অনুগামী। কয়েকটির ক্ষেত্রে অবশ্য অনলাইন সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। বেশ অনেক টীকাই আবার আমাদের সম্মানিত অনুবাদক ও সম্পাদকের পক্ষ থেকে সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে এগুলো শতভাগ অকাটি নয়। অকাটি নয়, এর মানে হলো—রেফারেন্স দেওয়া বইটি ঠিক কোন প্রকাশনীর, কোন সালের এবং কততম সংস্করণের—তা নির্দিষ্ট নয়। যে কারণে এই সংশ্লিষ্ট বিভ্রান্তি এড়াতে আমরা আশা করব, কেউ এগুলোকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহারের আগে এই বিষয়ে যথাসম্ভব মুদ্রিত কোনো কিতাবের সাথে মিলিয়ে অথবা অন্য কোনোভাবে খোঁজখবর নিয়ে নেওয়া এবং তারপর রেফারেন্স



হিসেবে ব্যবহার করা ভালো হবে। এমনিতে বইয়ে পরিবেশিত তথ্য শুল্ক ও যথার্থ রাখার শতভাগ চেষ্টা আমরা করেছি—এটুকু আমরা দাবি করতেই পারি। তবুও শ্রেফ সতর্কতার জন্যই কথাগুলো বলে রাখা।

দ্বিতীয় আরেকটি কথা আমরা নোট হিসেবে বলে রাখতে চাই। তা হলো—লেখকের ইলমি যোগ্যতা পুরো দুনিয়াক্যাপী স্বীকৃত। দেশখ্যাত প্রতিষ্ঠান লালবাগ মাদরাসার সাবেক প্রিন্সিপাল মুফতি ফজলুল হক আমিনি রহ.-সহ আমাদের এই বাংলাদেশের অনেক বিখ্যাত আলিমও লেখককে খুব চিনতেন ও পছন্দ করতেন। তারা তার লেখা রচনাবলি ও বয়ানের মুগ্ধ পাঠক ও শ্রোতা ছিলেন। তা ছাড়া সম্মানিত লেখক ছিলেন সমকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ফকিহ আলিম; কিন্তু তারপরও কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নন। অন্য সকলের মতো তিনিও একজন মানুষ ছিলেন। তাই পরবর্তী জীবনে এক-দুটি বিষয়ে তার ইজতিহাদি ইলমি অবস্থান ছিল সমকালীন আলিমগণের চেয়ে ভিন্ন। ফলত তিনি কিছুটা নীরব সমালোচনার শিকার ছিলেন।

তবে এই বই যখন প্রকাশিত হয়, তখন তিনি সমালোচনার বাইরে একেবারে ক্রিন ইমেজের একজন আলিম ছিলেন। এ ছাড়া আলাদা করে বলতে হয়, বিশেষভাবে এই বইটি, সিরাহ বিষয়ে বা ইলমি দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইয়ের বিচ্যুতি বা সমালোচনা নেই। উপরন্তু বইটি নবিজির সিরাতে আলোচনায় নতুন এক দিগন্ত পৃথিবীকে দেখিয়েছিল। যে কারণে পুরো আরব বিশ্বে বইটি ক্যাপক প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছিল। আমরা আশা করি, এই বিষয়ে সম্মানিত ও বিদগ্ধ কোনো পাঠকের আপত্তি থাকলে তা নিরসনে আমাদের ছোট্ট স্বীকারোক্তিটুকু দারুণ ভূমিকা পালন করবে।

পরিশেষে কথা হলো—আমাদের ভুল হতে পারে, সেই সম্ভাবনা ও শঙ্কা থেকে বলে রাখি, কোনো হৃদয়বান পাঠক যদি বইটিতে কোনো বিচ্যুতি লক্ষ করেন এবং এরপর তিনি মেইলে বা কোনো মাধ্যমে যোগাযোগ করে আমাদের জানালে, আমরা তা সংশোধনে আন্তরিক থাকব বলে আশাবাদী। আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন, আমিন।

বিনয়বত

প্রকাশক, ইহদিনা পাবলিকেশন



বিক্রম সিরাহ



সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি সমগ্র সৃষ্টির কারিগর; যিনি সকল কিছু প্রতিপালক। সালাত ও সালাম প্রেরিত হোক আমার প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাদ্দাদ্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার ও সাহাবিগণের ওপর।

ফিকহুস সিরাহ। খ্রিষ্ট কোটিরও বেশি মানুষের মুখের ভাষা ‘বাংলায়’ এমন একটি বইয়ের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে, যা আরও অনেক আগেই হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। পরে হলেও ‘হচ্ছে তো’ বিবেচনায় অন্তরের গহিন থেকে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি—আলহামদুলিল্লাহ।

ফিকহুস সিরাহ আসলে কী? এটি কি নিছক নবিজির জীবনী? না, জীবনী বাদ দিয়ে জীবন থেকে পাওয়া শুধু শররি মাসয়ালার সংকলন? যদি তা-ই না হয়, অসংখ্য জীবনীর ভিড়ে তাহলে নতুন এই বইয়ের প্রয়োজনীয়তাই-বা কী? আর আমি কেন এবং কীসের আশায় পড়ব বইটি?

প্রশ্নগুলো যেকোনো সচেতন পাঠকেরই মনে আসতে পারে। বইটির কাজ করতে গিয়ে আমার কাছে যা মনে হয়েছে, আমি তাহলে সেই কথাগুলো বলি; *ফিকহুস সিরাহ* হলো সেই বই—যে বইয়ে নবিজির জীবনী জানার পাশাপাশি আমরা জানব, তাঁর জীবন থেকে আমাদের মতো সাধারণ উম্মতের শেখার কী আছে। আমরা দেখব, আল্লাহ তায়াল্লা আমাদের আদর্শ হিসেবে যাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর জীবনে আমাদের জন্য কী কী আদর্শ রয়েছে। কী কী শিক্ষা আমরা তাঁর জীবন থেকে গ্রহণ করব।

ফিকহুস সিরাহ নিছক কোনো সিরাতগ্রন্থ নয়, আবার নয় কোনো মাসয়ালার কিতাব; বরং *ফিকহুস সিরাহ* হলো—নবিজির নির্ভরযোগ্য জীবনীর অসাধারণ বিন্যাসের অসামান্য সংকলন। এখানে বর্ণিত হয়েছে নবিজির জীবন ঠিক কেন এমন ছিল। ঠিক কেন নবিজিকে আল্লাহ তায়াল্লা এইভাবে প্রতিপালন করেছেন। কেন তার জীবন ছিল উম্মাহর সকলের জন্য আদর্শ। নবিজির জীবনী জানা এবং তার সুরভিত জীবন থেকে



প্রাপ্ত শিক্ষার এত বড়ো ও সুন্দর আয়োজন; খ্রিয় পাঠক, আমি বলতে পারি—এর আগে আপনি পাননি।

বইটির মান রক্ষা করে, বলতে গেলে সত্যিকার অর্থে আমার মতো অযোগ্য মানুষের চেয়ে সম্পাদকের স্থানে শ্রান্ত কোনো ভাববিদ হলেই ভালো হতো। কিন্তু আল্লাহর কী দয়া, এই ক্ষুদ্র মানুষকে আল্লাহ তায়াল্লা তাঁর খ্রিয় হাবিবের জীবনীর সামান্য বিদয়াত করার তাওফিক দান করেছেন। আল্লাহ তায়াল্লা রাহে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই—আলহামদু লিল্লাহ।

ফিকরুস সিরাহ দুই খণ্ডে মোটামুটি বৃহৎ কলেবরের বই। তাই বইটি পাঠকের কাছে পাঠবান্ধব করার লক্ষ্যে কয়েকটি কাজ করেছি—

- মূল আরবি বইয়ে শিরোনাম খুবই কম ছিল। তাই মূল আরবির চেয়ে সহজে বোঝার জন্য, অনুদিত বইয়ে আমরা অসংখ্য শিরোনাম যুক্ত করেছি, যাতে করে বইটির কোনো অংশ পড়া শেষে আমরা মূলত কী পড়লাম, তা মাথায় রাখা সহজ হয়ে ওঠে।
- আলোচনাগুলো আমরা পয়েন্ট আকারে ভিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছি। তাতে করে বইটি অনেক বেশি পাঠকবান্ধব হয়ে উঠেছে।
- বইয়ের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য টীকা যুক্ত করেছি। যা বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানের পরিচয়, ব্যক্তি ও অন্যান্য বিষয়ের পরিচিতির ক্ষেত্রে পাঠককে দারুণভাবে সহযোগিতা করবে বলে আমরা মনে করি।

আমরা খারশা করছি, বইটি আপনাদের ভালো লাগবে। নবিজির জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের জীবন সাজাতে বইটি আপনাকে সহযোগিতা করবে।

আমরা সকলেই মানুষমাত্র। ভুল আমাদের জীবনের আটপেঁট জড়িয়ে আছে। আমরা সকল কাজেই প্রায় ভুল করি। বিশেষত আমি নিজে ভুল একটু বেশিই করি। তাই এই বইয়ে নিজ পাঠকের চোখে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমার মেইল বরাবর জানালে, পরবর্তী সংস্করণে শূন্যে নেওয়ার ইচ্ছে রাখি। আল্লাহ তায়াল্লা আমাদের জিন্দেগি তাঁর রাসুলের দেখানো পথে যাপনের তাওফিক দান করেন, আমিন!

বিনয়ত—

জাবির মুহাম্মদ হাবীব

৪ অক্টোবর, মধ্যরাত, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ



ফিকরুস সিরাহ



দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে লেখকের কথা

০১.

নবিজির জীবনী যারা ভালো করে বুঝতে চান, সিরাতু মুত্তকা থেকে মণি-মুক্তা লাভের সবিশেষ আশ্রয় যাদের রয়েছে, তাদের জন্য দ্বিতীয় সংস্করণের এই ভূমিকা। এ সংস্করণে অতিরিক্ত কিছু আলোচনা যুক্ত করেছি। কোনো কোনো আলোচনার ক্ষেত্রে ঘষামাছা এবং পরিমার্জনের কাজটাও হয়েছে। আমার প্রত্যাশা—এতে করে বইটির গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা আরও বাড়বে। তবে গ্রহণযোগ্যতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছা কোনো দিনও সম্ভব নয়। কারণ, অবশ্যই এতে ভুলচুক হয়ে থাকবে। ভুলত্রান্তির ওপরে থাকতে পারাটা মানুষের সাথের বাইরে।

তবে এক্ষেত্রে নবি-রাসুলগণের ব্যাপারটা ভিন্ন। আল্লাহর বিশেষ কৃপায় তারা প্রতি-বিব্রাট থেকে বেঁচে থাকতে পারেন; যেটা কেবল তাঁদেরই বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষের সাথে নবিগণের এই পার্থক্যের কথা শুধু ‘বিভাজনের’ জন্য। বিভিন্ন বিষয়ে যারা নিজেদের ইজ্জতিহাদ ও চিন্তাকে মানদণ্ড বানায়, তাদের এবং নবি-রাসুলগণের মাঝে যেন পার্থক্য হয়, সেজন্য আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসুলগণকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেন, যা সাধারণ মানুষের মাঝে পাওয়া যায় না।

০২.

বইটি ছাপার অক্ষরে আসার পর বিভিন্ন আরবরাষ্ট্রে তা এতটা পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করবে, স্বল্পসময়ের ভেতর এভাবে ফুরিয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি। আমার এ বইটি নতুন কিছু—নতুন রঙের, নতুন আঙ্গিকের—এ হয়তো অনস্বীকার্য এক বাস্তবতা।

১. ধর্মীয় বিধান প্রণয়নে গবেষামূলক প্রয়াস।

২. তাদের এই পার্থক্য হলো তীক্ষ্ণ স্মৃতি, প্রবল চিন্তা, বোধ ও সুদৃষ্টিসারী দৃষ্টিভঙ্গির অবিকারী হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে যাদের নিকট ওহি অবতীর্ণ হওয়া এবং ইলহাম হওয়া—এগুলো।



আমি এতে নবি-জীবনকে যেভাবে উপস্থাপন করেছি, বইয়ের পাতায় নবি-জীবন নিয়ে আমার চিন্তাকে যেভাবে সাজিয়েছি, হয়তো-বা এটি নতুন কোনো আন্দোলন; যার প্রধান চরিত্র হলো নবি-জীবন নিয়ে এ কালে রচিত রচনাগুলোর ভুল খরিয়ে দেওয়া। বিভিন্ন লেখক ও প্রাচ্যবিদ নিরন্তর যেসব ভুল করে চলছেন এবং উনিশ শতকে বেড়ে ওঠা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেসব ভুলের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলছে—ফেগুলোর প্রভাব আজও বিরাজমান—সেসব ভুলের আবরণ সরিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া।

০৩.

আমার এই মেহনতকে কেন্দ্র করে পাঠকগণ যেই প্রশংসা উপহার দিয়েছেন, এ থেকে বুঝতে পারলাম', (তারা এই বইটি পেয়ে বেশ খুশি হয়েছেন। এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সেইসব মিথ্যাচারের মাধ্যমে) বাস্তবে খুব বেশি মানুষকে প্রভাবিত করা যায়নি। কারণ, নবি-জীবনের শাস্ত্র বাস্তবতাগুলো সদা দেদীপ্যমান, উজ্জ্বল। কোনো তাবিল ও তাহলিল (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) ছাড়াই নিরপেক্ষ, স্বাধীন চিন্তা' তার দিকে ঝুকবে, তাকে বিশ্বাস করবে।

০৪.

ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষকরা মনে করছেন, ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ হলো—জ্ঞানবিজ্ঞান; চোখ ঝলসানো ইউরোপীয় জগরণ, যা ঝিগুজসম্বন্ধ আরবকে প্রভাবিত করেছিল। ইউরোপের সেই চোখ ঝলসানো রূপে তাদের এতটাই ভ্রম হয়েছিল যে, তাদের বিশ্বাস ছিল—ইউরোপের মতো মুসলিমদের মধ্যে গণজাগরণ সৃষ্টি করতে চাইলে ইসলামকে ইউরোপের আয়নাতেই দেখতে হবে। ইউরোপ যেভাবে ইসলামকে বোঝে, মুসলিমদেরও সেভাবেই ইসলাম বুঝতে হবে। ইসলামের অদৃশ্য (গায়েবি) শাস্ত্র বিষয়াবলিকে কতুবাদী বিজ্ঞানের মানদণ্ডে বুঝতে হবে। সুতরাং বিজ্ঞান যেহেতু অদৃশ্য বিষয়াবলিকে অস্বীকার করে, তাই সেগুলো মানা যাবে না। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার যদি মুজিজা (নবি-রাসূলগণের সত্যায়নে ঘটা অলৌকিক সব বিষয়)'র ব্যাপারে সত্যায়ন না করে, তাহলে সেটা অগ্রহণযোগ্য। পুরোপুরি ইউরোপীয় আদলে যদি কেউ ইসলামকে বিচার করতে পারে, তাহলে জ্ঞানবিজ্ঞান, উন্নতি-অগ্রগতি সবকিছুতেই ইউরোপীয়

৩. উনিশ শতকে বেড়ে ওঠা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান, যেগুলো মূলত প্রাচ্যবিদদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছিল এবং সেইসব প্রতিষ্ঠান ও তাদের প্রোগ্রামভিত্তিক খুব বেশি মানুষকে প্রভাবিত করা যায়নি।

৪. তবে শর্ত হলো, নবি-জীবন নিয়ে অস্বল্প চিন্তা ও প্রচারণা বাব দিয়ে বাস্তব অর্থেই টিকভাবে চিন্তা করতে হবে।



জাগরণের মতো জাগরণ-স্ফুরণ ঘটতে পারবে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা স্কাররাই পরবর্তী সময়ে তথাকথিত ‘ধর্মীয় সংস্কার’ আন্দোলনের প্রবর্তন করেছেন; অথচ এই দ্বীন তার বিশুদ্ধ আদলে টিকে আছে, আদৌ যার সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে না।

তো, তাদের এই ধর্মীয় সংস্কারের প্রথম অপারেশন হলো—ইউরোপীয় মানদণ্ডে নবি-জীবনকে বিশ্লেষণ। অর্থাৎ নবিজির জীবনকে ইউরোপীয় চিন্তা ও কাঠামোতে, আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করা। সুতরাং ইউরোপের বিশেষ এই কাঠামোতে বিশ্লেষিত নবি-জীবন লেখায় কেউ বলতেই পারে, সে বিজ্ঞানের সমর্থন ছাড়া নবি-জীবনকে বুঝতে পারে না। তাই মুজিজার ব্যাপারগুলো থাকবে নবি-জীবনে অন্তর্নিহিত; যেহেতু তা বিজ্ঞান সমর্থন করছে না। আর সেই মুজিজাটি হচ্ছে—কুরআন, কুরআন এবং শুধুই কুরআন।

বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর শাইখুল আজহার শাইখ মুহাম্মাদ মুস্তফা আল মারাগি (১৮৮১-১৯৯৫) এ দিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং বইয়ের প্রশংসা করে ধন্য করেছেন। আর মুহাম্মাদ ফরিদ; তিনি বইটির সমালোচনা করে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করছিলেন। তার প্রবন্ধে তিনি ইসলাম ও নবি-জীবনকে বিজ্ঞানের মানদণ্ডে বোঝার আহ্বান করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি যদি কুরআন-সুন্নাহ প্রমাণিত সত্য থেকে বিমুখতা প্রদর্শনের ইচ্ছা করে থাকেন, তাহলে তিনি তার বিজ্ঞানসম্মত এই বক্তব্য বলতে চাচ্ছেন—মুজিজা ও অদৃশ্যের বিষয়বলি, যদিও তা মুতাওয়াতির (পারম্পরিক সনদ সুদৃঢ়) পর্ষায়ে বর্ণিত হয়ে আসুক; যেহেতু যুক্তির গন্ডির বাইরে, তাই সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ, যা আপনার বোঝাম্য, সেটা মানতে অসুবিধে নেই। কিন্তু যখনই যুক্তিবহির্ভূত কোনো বিষয় হবে, তখন তা মানা যাবে না।

০৫.

সবার জানা আছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তৎকালীন মিশরে কেমন সুযোগ কাজে লাগিয়েছে! ইসলামের ব্যাপারে কিছুসংখ্যক চিন্তাবিদ ও লেখকের নতুন এই বোধ, নতুন এই বিশ্লেষণকে কাজে লাগিয়ে তারা মুসলিমদের হৃদয়ে থাকা নিয়ন্ত্রণশক্তিকে পঙ্খ করে দিয়েছে। যে ব্যক্তি দ্বীনের মৌলিক বিষয় ‘মুজিজা’-কে ‘না’ বলে, তার অন্তরে আবার নিয়ন্ত্রণশক্তি থাকবে কী করে? মুজিজার মাঝেই তো দ্বীনের মূল অস্তিত্ব; কারণ ওহি, কুরআন, সবই তো মুজিজা। এভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম

৫. যে শক্তি প্রত্যেক মুসলিমকে অমূলক চিন্তা অপারেশন করে মূল চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করে।



উন্মাহকে তাদের মূল আদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে থাকে এক নতুন আদর্শের—
যা ইউরোপের জয়গানে মুখর—আমদানি করে।

০৬.

এভাবে দিনরাতের পালা বদল হতে থাকল। বছরের পর বছর কটিতে লাগল।
এরপর গবেষক লেখকরা বুঝতে পারলেন—ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কখনোই স্থায়ী
ও নিরপেক্ষ চিন্তার ধারক-বাহক ছিল না, জ্ঞানগত নিরৈক্য গবেষণার জন্য ওইসব
প্রতিষ্ঠান ছিল না; ভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ওগুলোর জন্ম।

ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য ছিল—সেখানে ইউরোপীয় জীবন, ইউরোপীয় চাকচিক্য
ও ভোগ-উপভোগের জৌলুসকে মানুষের সামনে মেলে ধরা হবে; যেটাকে তারা
জীবনের চূড়ান্ত চাপরা-পাওয়া মনে করবে। এক আবেগের বশবর্তী হয়ে সেটাকেই
তাদের চিন্তা, বোধ, বিবেকের প্রভু ও নিয়ন্ত্রণকারী মনে নেবে।

এ ছাড়া এর মাধ্যমেই তারা ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক আরও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে;
যার বার্ষিক প্রকাশ ‘ধর্মীয় সংস্কার’ আর অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা—পশ্চিমের
জাগরণের সামনে মানসিক দাসত্ব এক চিন্তার দৈন্য।

প্রত্যেক চিন্তকের কাছে এটাও প্রতিভাত হলো, তথাকথিত ইউরোপীয় জাগরণের
মতো ওইসব প্রতিষ্ঠান জ্ঞানের জাগরণ-স্কুরণ ষ্টাতে পারেনি। এই ‘ধর্মীয়
সংস্কারের’ পাদ্রার যারা পড়েছে, তারা দুটি কাকতবতাকে একই সঙ্গে বিসর্জন
দিয়েছে—

- এক. তারা ধর্মের প্রকৃত ও বিশুদ্ধরূপে থাকেনি।
- দুই. জ্ঞানের জাগরণেও স্বাক্ষর রাখতে পারেনি।

০৭.

সুতরাং আমার আশ্রয় হয়েছে—এ বইয়ে আমি ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের
ধ্বংসাবশেষের শেষ পঙ্ক্তিলাতটুকুও দূর করার ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব দেবো।

‘নবিজি একজন বিশাল প্রতিভাবান, দুঃসাহসী সেনাপতি, অভিজ্ঞ কুশলী’—এভাবে
নবি-জীবনকে চিত্রায়ণ করা একজন মুসলিমের জন্য আদৌ ঠিক নয়; এটা একপ্রকার
প্রকৃত বাস্তবতাবর্জিত বিষয়; মুহাম্মাদ সাদ্লাম্মাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমৃদ্ধ
জীবনের সাথে যা যায় না; বরং নবিজির সমৃদ্ধ জীবনকে অনেকটা হেয় করে। শাশ্বত

৬. এই সংস্করণে ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে বিভিন্ন কথা বলেছি। সামনে পাবেন।



বাস্তবতা এই যে, নবিজি সাদ্ধায়াহু আল্লাইহি ওয়া সাদ্ধাম ছিলেন সব ধরনের পূর্ণতার (নৈতিক, জ্ঞানগত, মানসিক) পূর্ণাঙ্গা ও সমৃদ্ধ মানব।

আর এ সবগুলো পূর্ণতাই একই বাস্তবতা থেকে উৎসারিত—তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবি। এটাই সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গাতার মূল চিত্র। এ যেন ‘আসল’ (মূল) বাদ দিয়ে ফুরু’ (শাখাগত ও প্রাসঙ্গিক)—কে ধরা। অথচ আসলের অস্তিত্ব সম্পর্কেই অসচেতন থাকে এক চরম অর্থার্থ ব্যাপার; এ ধরনের ‘অর্থার্থ’ কাজ থেকে বাঁচতে হলে আমাদের স্রেফ আসলের দিকে ফিরতে হবে।

একজন মুসলিম যতক্ষণ সিরাত থেকে নবি-জীবন বোঝার ব্যাপারটা মানবে, ততক্ষণ সে ‘কুরআনই নবি-জীবনের একমাত্র মুজিছা’—এটা বলতে পারে না। কেউ যদি সিরাতের এই দিকের (কুরআন ব্যতীত অন্যান্য মুজিছা) অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে কুরআনের মুজিছাকেও অস্বীকার করতে হবে। কারণ, অন্যান্য মুজিছা যেই পদ্ধতিতে এসেছে, কুরআনের মুজিছা সেই একই পদ্ধতিতে এসেছে।

এই ধরনের তাকিল (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) করতে যাওয়া, এবং তা মেনে নেওয়া মানে প্রবৃত্তির অনুসরণ। জ্ঞান-গবেষণা ও বোধের ক্ষেত্রে চরমভাবে নিচে নেমে আসা; যার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ আছে, সে এই কাজে কখনো অগ্রসর হবে না।

০৮.

আমার সামান্য এই কাজটুকুর ফলে আমি যেই পাঠকশ্রিয়তা, ভালোবাসা ও সম্মতি পেয়েছি—এ থেকে বোঝা যায়, প্রাচ্যবিদ, পশ্চিমাবাদে বিশ্বাসী আশ্রাসী চিন্তাবিদ ও ইউরোপীয় দায়িরা (প্রচারকরা) যতই চেষ্টা করুক, যত বিপুল সময় ও শ্রম ব্যয় করুক; তারা যতই সমৃদ্ধ রচনা লিখুক, সবকিছুর পরও তারা সত্যকে মিথ্যা এক মিথ্যাকে সত্য বানাতে পারবে না। বাস্তব ও সত্য চিন্তাকে কখনো নিঃশেষ করে দেওয়া যায় না। যদি ধোঁকা ও প্রতারণা অথবা অন্য কোনো হুচলচাতুরীতে সত্য-মিথ্যাকে গুলিয়ে ফেলা সম্ভবও হয়, তবুও এর স্থায়িত্ব নেই; কেবল তা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এরপর ধোঁকা, প্রতারণা ও সংশয়ের আবরণ দূর হয়ে যাবে। নিরোঁট সত্য ও বাস্তবতা তখন নতুন করে প্রকাশ পাবে। এতে গবেষকদেরও উপকার হবে। তারা সতর্কতা অবলম্বন করে তাদের চিন্তাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

মানুষ যতই বলুক, মুসলিমরা এই শেষ যুগে এসে তাদের প্রকৃত আদর্শ থেকে সটকে পড়েছে। এরপরও আমি বিশ্বাস করি—মুসলিম উম্মাহর একটি দল আজ ইসলাম বিষয়ে সচেতনতা ও সূক্ষ্ম চিন্তায় যতটা অগ্রসর হয়েছে, ইতঃপূর্বে কোনো সময়ে তা



ছিল না। আমার বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে (ইনশাআল্লাহ) তা একটি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করবে; যা সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ করবে।

০৯.

এ বইয়ের সুন্দর আরেকটি দিক এই যে, এখানে আমি ‘অ্যাকাডেমিক ধারা’র আলোচনা করেছি; যা কাওরায়িদ ও আহকামের (মূলনীতি-বিবিধিধান) ইসতিনবাতের (উদবাটন) ওপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রেণ ‘বিল্লেবশমূলক সাহিত্যের ধারা’র আলোচনা করিনি। যদিও এরও আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য তার আপন জায়গায় ঠিক। আমার এই ধারা (অ্যাকাডেমিক ধারা) প্রথম ধারার (সাহিত্যের বিল্লেবশমূলক ধারা) সাথে অসাংখ্যিক।

এই অনন্য ধারায় লেখার ফলে আমার বই যে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে, এটা আমাকে আরেকটু বিশদ ও সূক্ষ্ম আলোচনায় প্ররাসী করে তুলেছে। যদিও আমার বিশ্বাস—আমি এতে যথার্থ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তুলে ধরতে পারিনি। সব সংকটের সমাধান করতে পারিনি। আর না পারার প্রথম কারণ হলো আমার নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতা।

দ্বিতীয়ত, আমি এখানে মাসাইল ও আহকাম সবিস্তারে—যা পাঠকের জন্য কষ্টকর—বর্ণনা করার ইচ্ছে করিনি। অন্যথায় এটা একদম সহজলভ্য ও নিত্যসঙ্গী কোনো বই হওয়ার পরিবর্তে একটা ‘মারজি’ (উৎসঙ্গ) কিতাব হয়ে বাবে; শ্রেণ প্রয়োজনের সময়ই যার শরণাপন্ন হয় মানুষ।

তবে আবার কিছু মহোদয় এমনও আছেন, যাদের আমার নতুন ধারার এই কাজ আকৃষ্ট করতে পারেনি; বরং তাদের কেউ কেউ নিরপেক্ষ জ্ঞানগর্ভ আলোচনার (সমালোচনা) পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষে কলুষিত সমালোচনা করেছেন। আমি আমার বইয়ের আলোচনায় যদি কোনো ভুল করে থাকি, অসচেতনতার কারণে কোনো ভুলুম বা দলিল বলার সময় যদি কোনো বিষয়ের শিকার হই এবং শূভাকাঙ্ক্ষী কোনো মুখলিস ভাই তা ধরিয়ে দেন, তাহলে আমি তাকে কৃতজ্ঞতাপাশে রাখব, তার জন্য কল্যাণের দুআ করব; কিন্তু বাস্তবতাবিবর্জিত একইরকম কোনো কথা (সমালোচনা) শুনব, সে প্রতুতি আমার নেই।

১১.

নবিজির আদর্শ ও সাহাবায়ে কিরামের আমলের দিকে লক্ষ রাখতে গিয়ে একটা অস্পষ্ট ব্যাপার স্পষ্ট হয়েছে। তা হলো, নবিজি—জীবিত হন বা মৃত—তাকে ‘ওসিলা’ (মাধ্যম ও অবলম্বন) বানানো জারিজ আছে। সুতরাং শক্তিশালী



ফিকহুস সিরাহ

দলিলের ভিত্তিতে আমি সেই ওসিলা বানানোর বৈধতাকে স্বীকৃতি দিলাম। নবিজির সিরাত বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আরেকটি বিষয়ও পষ্ট হয়েছে, তা হলো—আগভুক্তের সম্মানার্থে দাঁড়ানো জায়িজ আছে। এর সব দলিল আমি উল্লেখ করেছি। ‘আগভুক্ত ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো এবং বসা ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো’—এই দুটোর মাঝে আলিমগণ যেই পার্থক্য করেন, তা আমি স্পষ্ট করেছি। এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত হওয়া হাদিসগুলোও উল্লেখ করেছি। সহিহ হাদিসে বর্ণিত শর্তাবলি যখন পাওয়া যাবে, উসূল (নীতিমালা) যখন ঠিক থাকবে, তখন এ ধরনের কিয়াম জায়িজ বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ছুটে যাওয়া সালাতের—ভুলে বা ইচ্ছায়—কাজার ব্যাপারটাও এখানে সুস্পষ্ট হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি বিভিন্ন দলিল এনে সে আলোকে হুকুম নির্ধারণ করেছি।

আমার মতের বিপরীত যদি বিভিন্ন দলিল পাওয়া যায়, তাহলে আমি বিপরীতই বলব। দলিলের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সব সময় আমি বক্ষণপরিকর; কিন্তু আমি কিছু মানুষের—যারা আয়িম্মা (মহান ইমামগণ) ও জুমহুর উলামার বিপরীতে নতুন মাজহাব সৃষ্টিতে প্রয়াসী, যাদের অধিকাংশ আয়িম্মায়ে কিয়ামের মর্যাদা হ্রাস করতে, এমনকি জনসম্মুখে তাদের কটু কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করে না, তাদের মনোরঞ্জনের জন্য কোনো অবস্থাতেই সত্য ও সত্যের দলিল থেকে মুখ ফেরাতে পারব না। জ্ঞানগত আলোচনা-পর্যালোচনাটা এ ধরনের এককৈরিক আত্মসী বিষয়ে পরিণত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

১২.

আল্লাহর শপথ! এসব সম্প্রদায় যদি বিচ্ছিন্ন ইজতিহাদি বিষয়ে মানুষকে জড়ানোর ব্যস্ততায় না থেকে, এসব ব্যাপারে অনর্থক ঝগড়া না করে, বিদেব না ছড়িয়ে উম্মাহর অন্যান্য আরও বড়ো বড়ো সংকট নিয়ে মাথা ঘামাত, উম্মাহর সমূহ সংকট নিরসনে প্রচুর শ্রম ব্যয় করত, তাহলে কতই-না ভালো হতো! কিন্তু চরম আশ্চর্যের বিষয়, তারা যুগের এসব দুর্বিপাক, ধীন ও ইমান বিধ্বংসী ভয়ংকর তুফান সম্পর্কে নিতান্তই অজ্ঞ।

তাদের এই কাজের (ইজতিহাদি বিষয়ে ডুবে থাকা) উদ্দেশ্য যদি থাকত আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাহলে তাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি হতো। নিজেদের কাছে যেই মতকে ঠিক মনে হয়, সেটাকে তারা গ্রহণ করত। আর অন্যরা যেটাকে যেটাকে ঠিক মনে করে, অন্যরা যেই মাজহাব গ্রহণ করে, সেটাকে তারা তাদের আপন অবস্থায়



ছেড়ে দিত। মানুষকে নিজেদের অষ্টোপাসে জড়িয়ে ফেলার যেই অদম্য স্পৃহা, তা নিষ্ক্রিয় থাকত।

আমাদের পূর্ববর্তী জুমহুর মুসলিম উম্মাহও ইজতিহাদি বিষয়ে ইখতেলাফ করতেন; কিন্তু এর ধরন ছিল ভিন্ন, যথার্থ। তারা ‘কাতয়ি’-ভাবে (নিশ্চিত) প্রমাণিত বিষয়গুলোকে (আকিদাসংক্রান্ত হোক বা আমলসংক্রান্ত) আঁকড়ে ধরতেন। এগুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন এবং এসবের প্রতিরক্ষা করতেন। এরপর ইজতিহাদি বিষয়ে (যা জম্মি) অনুমাননির্ভর আলোচনা-পর্যালোচনার সময় একই বিষয়ে তাদের বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন মাজহাবের সৃষ্টি হলে তাদের নিকট ব্যাপারটা ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক। কেউ অন্য কারও ওপর জবরদখলের চেষ্টা করতেন না। নিজের সিদ্ধান্তকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাতেন না। অন্যথায় (আত্মসী মনোভাব থাকলে) শিকড়েই ইসলামি ঐক্য নস্যাৎ করে দিতেন। আমাদের এই সমৃদ্ধ ইতিহাস—মুসলিম সভ্যতা, গৌরব ও মর্যাদা—গড়ে উঠত না।

১৩.

আলোচনার এ পর্যায়ে এসে পাঠককে অনুরোধ করব, যেসব মাসয়ালায় তাদের (ওই সকল কটর ইজতিহাদকারী) সাথে বিরোধ উল্লেখ করেছি এবং এর মোকাবিলায় জুমহুরের মাজহাবকে তুলে ধরেছি, সেসব মাসয়ালার ক্ষেত্রে ভালো রকম দলিল ও দলিলের প্রয়োগ স্পষ্ট হওয়ার পর, আপনি দলিলের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা যাচাই করে দেখবেন। এইটুকুর পর আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি যেটা গ্রহণযোগ্য—যাতে একরৈখিক মনোভাব ও চিন্তার কোনো ছাপ থাকবে না—সেটিই গ্রহণ করবেন। একটি মাসয়ালায় (যেখঁটি দলিল হাতে থাকার শর্তে) ইখতিলাফ বা মতানৈক্য বিপজ্জনক নয়; বিপদ তখনই হবে, যখন নিজের মতকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার একরৈখিক মনোভাব থাকবে।

আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সত্যের পথে নিয়ে আসেন। আমাদের সবাইকে সঠিক পথপ্রদর্শন করেন। শূধু তাঁর জন্যই আমাদের যাবতীয় আমলকে কবুল করেন। তিনি সবকিছু শোনেন, সবার ডাকেই জবাব দেন।

মুহাম্মাদ সান্নিদ ইবনে রামাদান আল বুতি

দিম্যশক, সিরিয়া

১৭ জুমাদাল উলা, ১৩৮৮ হি.

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ খ্রি.



ফিকহুস সিরাহ



সূচিপত্র

ক	নিবন্ধনাম	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায়	
	ইসলাম বুঝতে সিরাহর গুরুত্ব	২৫
	সিরাহ অধ্যয়নের ক্রমবিকাশ এবং বর্তমানে সিরাহ বোঝার অপরিহার্য পদ্ধতি	২৮
	আরবকে ইসলাম উদ্ভবের উৎসভূমি বানানোর রহস্য	৫৪
	নবিজির দাওয়াতের সাথে পূর্ববর্তী দাওয়াতের মিল-অমিল	৬৪
	জাহিলি সমাজ : নিভুনিভু সত্যের প্রদীপ	৭১
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
	নবিজির বংশ, জন্ম ও দুধ পান	৮৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৮৭
	শামের প্রথম সফর : জীবিকার প্রয়োজনে কাজ	৯৩
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৯৬
	খাদিজা রা.-এর মূলখন, নবিজির ব্যবসা ও বিয়ে	১০১

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১০৩
কাবা নির্মাণে নব্বিজির অংশগ্রহণ	১০৮
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১১০
হেরা গুহায় নির্জনবাস	১১৮
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১১৯
ওহির সূচনা	১২৩
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১২৭
তৃতীয় অধ্যায়	
নবি-জীবনে ইসলামি দাওয়াতের নানা স্তর	১৩৬
প্রথম প্রকার : গোপন দাওয়াত	১৩৭
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৩৯
দ্বিতীয় প্রকার : প্রকাশ্য দাওয়াত	১৪৬
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৫০
কুরাইশদের অত্যাচার-নির্ধাতন	১৫৮
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৬১
আপসের সব ব্যর্থ চেষ্টা	১৬৮
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৭৪
অর্থনৈতিক বয়কট	১৮৩
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৮৭
ইসলামে প্রথম হিজরত	১৯৬
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২০১
প্রথম প্রতিনিধিদলের আগমন	২০৭
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২০৯
শোকের বছর	২১৩

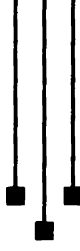


আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২১৫
তায়ফ যাত্রা	২২০
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২২৫
ইসরা ও মিরাজ	২৩৭
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৪৩
প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ ও ইসলাম গ্রহণের সূচনা	২৫১
বাইয়াতে আকাবায়ে উলা	২৫৫
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৫৭
বাইয়াতে আকাবায়ে সানিয়া	২৬৫
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৭০
মদিনায় হিজরতের অনুমতি	২৭৭
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৭৯
মদিনার পথপানে	২৮৩
কুবায় আগমন	২৮৯
আবু আইয়ুব আনসারির ঘরে	২৯১
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৯৩
চতুর্থ অধ্যায়	
প্রথম বুনিয়াদ : মসজিদ নির্মাণ	৩০৪
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩০৭
দ্বিতীয় বুনিয়াদ : মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা	৩১৩
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩১৫
তৃতীয় বুনিয়াদ : মুসলিম ও অন্যদের মাঝে চুক্তিপত্র প্রণয়ন	৩২০
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩২৩



	পঞ্চম অধ্যায়	
	প্রতিরোধ-যুদ্ধের পূর্বকথা	৩২৯
	গাজওয়াত বাদরিল কুবরা	৩৩১
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৩৫
	বনু কাইনুকা : ইহুদিদের প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা	৩৫৩
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৫৭
	গাজওয়ায়ে উহুদ	৩৬৮
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৮১
	ইয়াওমুর রাজি ও বিরে মাউনা	৩৯৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৪০০
	বনু নাজিরের দেশান্তর	৪০৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৪০৯
	অনুবাদক পরিচিত	৪১৫





প্রথম অধ্যায়

- ইসলাম বোঝায় ‘সিরাতুন নবি’র গুরুত্ব
- সিরাতুন নবি : নবি-জীবন অধ্যয়নের ক্রমবিকাশ ও বর্তমানে তা বোঝার অপরিহার্য পদ্ধতি
- নবিজিকে জাজিরাতুল আরবে প্রেরণের রহস্য
- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : খাতামুন নাবিয়্যিন
- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত এবং পূর্ববর্তী আসমানি দাওয়াতের সম্পর্ক
- জাহিলি যুগে টিকে থাকা একনিষ্ঠ ব্যক্তির



ইসলাম বুঝতে সিরাহর গুরুত্ব

সিরাতে নববি অধ্যয়ন ও উপলব্ধির উদ্দেশ্য শ্বেক ঐতিহাসিক কিছু ঘটনাবলি জানা, ইতিহাসের কিছু চমকপ্রদ কাহিনি সম্পর্কে অবগত হওয়া, এবং এসবের খুঁটিনাটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে—একজন মুসলিম সিরাতে রাসুলের মাধ্যমে এর মূলনীতি আর বিধিবিধান মাথায় রেখে, রাসুল সাদ্দাদ্ধু আলাইহি ওয়া সাদ্দামের উত্তম জীবনচরিতে ইসলামের বাস্তব রূপ তার মূল আকৃতিতে খুঁজে নেবে।

এজন্যই সিরাতে রাসুলকে অন্যান্য ইতিহাসের পাদ্ধায় মাণা উচিত হবে না। কারণ এমন হলে সিরাতে রাসুল হয়ে যাবে নিছক কোনো শাসকের জীবনচরিত অথবা অন্য কোনো ঐতিহাসিক গালগল্পের মতো—যা সিরাতের উদ্দেশ্য পরিপন্থি।

মোটকথা, সিরাতে রাসুল অধ্যয়নের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এর আমলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে হাকিকতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ, যার সর্বোৎকৃষ্ট উপমা হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাদ্দাদ্ধু আলাইহি ওয়া সাদ্দাম। যদি আমরা এই উদ্দেশ্যের বিভিন্ন দিক লিখিত আকারে সংকলন করার ইচ্ছে করি, তাহলে মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত পর্যায়ে এর বিস্তারিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করতে পারি—

এক.

রাসুলুদ্দাহ সাদ্দাদ্ধু আলাইহি ওয়া সাদ্দামের জীবন থেকে এবং যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতিতে তিনি জীবনযাপন করেছেন, এখেকে তাঁর নববি পরিচয় জানা—নিশ্চিতভাবেই মুহাম্মাদ সাদ্দাদ্ধু আলাইহি ওয়া সাদ্দাম শুধু একজন নেতাই ছিলেন না, যার নেতৃত্বের প্রতিভা তাঁকে স্বজাতির মধ্যে উঁচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে; বরং তিনি সবকিছুর আগে আদাহর পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত একজন রাসুল।



দুই.

মানুষ উত্তম জীবনের প্রতিটি বিষয়ে একটি উত্তম নমুনা পাবে, যাতে সে এর থেকে নিজের জন্য একটি নিয়ম তৈরি করে তার ওপর চলতে পারে। মানুষ যদি তার জীবনের যেকোনো শাখায় উত্তম আদর্শের স্থান করে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে তা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গরূপে পাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শে। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সমগ্র মানবজাতির জন্য উত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয় বানিয়েছেন। যেমন : আল্লাহ বলেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۖ

তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে ।

তিন.

মানুষ নব্বিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত অধ্যয়ন করে এমন দিকনির্দেশনা পাবে, যা তার জন্য আল্লাহ তায়ালায় কিতাব বোঝা এবং এর মর্মোন্মোচন করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। কারণ, পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত এমন রয়েছে, যোগুলো ব্যাখ্যা করেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলি।

চার.

সিরাতে নববি অধ্যয়নকালে মুসলিমের সামনে আসবে বিশুদ্ধ ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির বিপুল অংশ, সেটা হতে পারে আকিদা বা বিশ্বাস-সংজ্ঞিষ্ট অথবা বিধিবিধান ও আখলাক সম্পর্কিত। আর নিঃসন্দেহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন ইসলামের সকল মূলনীতি ও বিধিবিধানের আলোকিত প্রতিবিম্ব।

পাঁচ.

শিক্ষক ও মুসলিম দায়ির (প্রচারকের) নিকট থাকবে শিক্ষাদীক্ষা পদ্ধতির এক জীবন্ত নমুনা। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন একজন উত্তম কল্যাণকামী শিক্ষক। দাওয়াতের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাদীক্ষার অধিকতর উপযোগী পদ্ধতির তালাশে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি।



উল্লিখিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে বিষয়টি রাসুল সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতের পূর্ণতা দেয়, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—রাসুলের পবিত্র জীবন মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক-জীবনের যাবতীয় বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। চাই সে একক স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি হোক কিংবা সমাজের কার্যকর কোনো অংশ হোক।

রাসুলের জীবন নিজ কর্মধারায় অবিচল যুবকের জন্য উত্তম নমুনা; যে নিজ জ্ঞাতি ও জ্ঞাতীগোষ্ঠীর প্রতি আমানতদার ও বিশ্বস্ত। তেমনি প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সুন্দর নসিহতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তির জন্যও রয়েছে উত্তম নমুনা— যিনি নিজের ওপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেহনত করেন। একজন প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ রাষ্ট্রপ্রধানের আদর্শ সামনে আসে, যিনি নিজ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে সকল কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন।

সামনে আসে একজন আদর্শবান স্বামীর নমুনা; যিনি নিজের পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করেন। সামনে আসে একজন আদর্শ পিতার নমুনা; যিনি নিজ স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু, তিনি তাদের হক বখাবথ আদায় করেন। একজন দক্ষ সেনাপতি ও সত্যবাদী অভিজ্ঞ রাজনীতিকের নমুনা সামনে আসে। এমন একজন মুসলিমের নমুনা সামনে আসে; যিনি ন্যায়সংগত এবং যথার্থভাবেই একদিকে আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর প্রতি একাগ্রচিহ্ন থাকেন অপরদিকে নিজ পরিবার-পরিজনদের সাথে মনোরম সুন্দর জীবনযাপন করেন। তাহলে নিঃসন্দেহে সিরাতে রাসুলের উদ্দেশ্য হচ্ছে—মানবীয় এ সকল বিষয়কে উত্তম আকৃতিতে সুন্দরভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা।

* * *



সিরাহ অধ্যয়নের ক্রমবিকাশ এবং বর্তমানে সিরাহ বোঝার অপরিহার্য পদ্ধতি

সিরাতে নববি এবং ইতিহাস

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত ইতিহাসের মহান গতিপথ তৈরিতে এক অনন্য বুনিয়াদ স্থাপন করেছে, যদ্বারা বিশ্ব মুসলিম নিজেদের দেশ-ভাষা-সংস্কৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও বিশ্ব দরবারে- অসামান্য মর্যাদায় আসীন হয়েছে। আর এই সিরাতের গতিপথ ধরেই মুসলিমরা ইতিহাস রচনা করেছে। কারণ, মুসলিম ঐতিহাসিক ও লেখক-সাহিত্যিকগণ সর্বপ্রথম ইতিহাসের যেসব ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করেছেন, তা ছিল সিরাতে নববি সম্পর্কিত ঘটনাবলি। পরবর্তী সময়ে এই ধারাবাহিকতায় অন্যান্য ইতিহাস সংকলন শুরু হয়, যা বর্তমানে আমাদের সামনে দৃশ্যমান।

এমনকি ইসলামি সীমান্ত ছাড়িয়ে আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জাহিলি যুগের ইতিহাসকেও মুসলিমরা অন্যান্য আরব-অনারবদের থেকে জেনেছেন এবং ইসলামের আলোকে এগুলো সংরক্ষণ ও সংকলনের প্রয়াস পেয়েছেন। প্রাক-ইসলামি ইতিহাসকে ‘জাহিলি যুগের ইতিহাস’ নামে নামকরণ করেছেন। আর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শূভাগমন এবং তাঁর সিরাত ও হায়াতকে ‘ইতিহাসের সোনা লি অধ্যায়’ সাব্যস্ত করেছেন।

সেক্ষেত্রে সিরাতে নববি কেন্দ্রের রূপ পরিগ্রহ করে—যার চারপাশে ইসলামের ইতিহাস সংকলন আবর্তিত হয়। সিরাতের এই সংকলন এমন এক মহান কীর্তি, যা প্রথমে আরব উপদ্বীপে প্রভাব বিস্তার করে পরবর্তী সময়ে তামাম ইসলামি জগৎকে নিজের প্রভাববলয়ে নিয়ে আসে।



বিক্রম সিরাহ

আরব ও মুসলিমদের হাতে বর্ণনা সাহিত্য ইতিহাসের শূন্য-অশূন্য যাচাই এবং বিশুদ্ধ ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য এমন একটি জ্ঞানগর্ভ ও সুন্দর কারিকুলাম লাভ করেছে, যা অন্য কোনো জাতি লাভ করেনি।

তবে কথা হচ্ছে—যদি সিরাতে নববি সংরক্ষণের ধীনি জব্বুরত তাদের এমন বিশুদ্ধভাবে সিরাত সংকলনের জন্য উৎসাহিত না করত, যাতে মিথ্যা ও ছলচাতুরী এবং গোঁজামিলের লেশমাত্র থাকবে না, তাহলে তারা এই কারিকুলাম রচনায় ব্রতী হতেন না। কারণ, তাদের জানা ছিল, মুহাম্মাদ সাদ্দাম্‌আহু আলাইহি ওয়া সাদ্দামের সিরাত ও তাঁর সুন্নাহ হচ্ছে কিতাবুন্নাহ বোঝার অন্যতম ও প্রথম চাবিকাঠি। অতঃপর তা কুরআনের বিধান অনুশীলন ও বাস্তবায়ন পন্থতির শ্রেষ্ঠতর নমুনা।

তাদের এ কাজে উৎসাহিত করেছে তাদের এ দৃঢ় বিশ্বাস—মুহাম্মাদ সাদ্দাম্‌আহু আলাইহি ওয়া সাদ্দাম আদ্বাহর রাসুল, কুরআন আদ্বাহর কালাম এবং তারা এ কাজের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে, আদ্বাহ এ ব্যাপারে তাদের কঠিন হিসাব নেবেন—এই দৃঢ় বিশ্বাসই তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে এমন একটি জ্ঞানগর্ভ পন্থতিতে উপনীত হতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যাতে সিরাতে রাসুল ও পবিত্র সুন্নাতে নববির বাস্তব রূপ অবিকল সংরক্ষিত থাকবে।

জ্ঞানগর্ভ কারিকুলাম ও নীতিমালা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হাদিসশাস্ত্রের পারিভাষিক নিয়মনীতি এবং ইলমে জারহ তাদিল ইত্যাদি। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, এসব বিষয় সৃষ্টি হয়েছে সুন্নাতে নববির খেদমতের জন্য; সিরাতে নববি ছিল যার মূল ভিত্তি। অতঃপর তা সাধারণভাবে ইতিহাসের কল্পনিষ্ঠতা বা বিশুদ্ধতা যাচাই-বাছাই করার নীতিমালা ও মানদণ্ডে পরিগণিত হয়।

এটা সুস্পষ্ট কথা—সিরাত সংকলনের কাজটি একটি সুবিস্তৃত সুবিশাল অধ্যায়, যার মাধ্যমে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ব্যাপক আকারে অন্যান্য ইতিহাস অধ্যয়ন ও সংকলনের প্রয়াস পেয়েছেন। আর ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তারা যেসব মূলনীতির আশ্রয় নিয়েছেন, তা হচ্ছে খোদ ওই সকল নীতিমালা—যা মুসলিম বিদ্যানগণ ইসলামের মূল উৎসধারা তথা কুরআন ও সুন্নাহ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে প্রণয়ন করেছেন; যাতে কোনো অনুপ্রবেশকারী সেখানে জলঘোলা না করতে পারে।

সিরাত রচনার সূচনা ও ক্রমবিকাশ

যুগ হিসেবে সুন্নাতে নববির তুলনায় সিরাতে নববি রচনা শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে। নিঃসন্দেহে সুন্নাহ তথা হাদিসে নববির সর্বাত্মক লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়, তারপর ব্যাপক আকারে সিরাত রচনা শুরু হয়। আর এটা সবার জানা যে, হাদিস লেখার কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই আরম্ভ হয়েছিল, এ ব্যাপারে শুধু তাঁর অনুমতি নয় বরং নির্দেশ ছিল! যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরোপুরি নিশ্চিত হলেন—তাঁর সাহাবীগণ কুরআনের অলৌকিক বাকরীতি এবং হাদিসে নববির অলংকারপূর্ণ বক্তব্যের মাঝে সুস্পষ্ট ব্যবধান করতে পারছে, এ দুটি বিষয়ে তারা আর তালগোল পাকিয়ে ফেলবে না, তখন তিনি তাদের এ নির্দেশ দেন।

সুন্নাহ সংকলনের পরেই ব্যাপকভাবে সিরাত ও মাগাজি সংকলন শুরু হয়। যদিও সাহাবায়ে কিরাম মৌখিকভাবে সিরাত ও মাগাজি বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব দিতেন।

সম্ভবত প্রথম বিদ্বত পরিসরে সিরাত রচনার উদ্যোগ নেন উরওয়া ইবনেজ্জ জুবাইর (মৃত্যু : ৯২ হিজরি), এরপর আবান ইবনে উসমান (মৃত্যু : ১০৫ হিজরি), তারপর ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (মৃত্যু : ১১০ হিজরি), অতঃপর শুরাহবিল ইবনে সাআদ (মৃত্যু : ১২৩ হিজরি), এরপর ইবনে শিহাব জুহরি (মৃত্যু : ১২৪)

সিরাত রচনায় সর্বপ্রথম যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছেন, এরাই তাদের অগ্রগণ্য। তেমনি এদের রচনাবলিও এই মহান ইলমি কাজের প্রাথমিক সূচনাকর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়। বলা যায় বিদ্বত পরিসরে সিরাত রচনার প্রথম পদক্ষেপ এটাই, যেমনটি আমরা পূর্বেও বলে আসছি।

এই বিবেচনা বাদ দিয়ে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক সিরাত তো কুরআন ও হাদিসের বহু জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে; বিশেষত শরিয়তের বিভিন্ন বিধান-সংক্রিষ্ট সিরাতের ঘটনাবলি। নতুবা স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে সিরাতশাস্ত্র হাদিসশাস্ত্রের পরেই সংকলিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত সিরাত বিশেষজ্ঞগণ বা কিছু সংকলন করেছিলেন, সেগুলো যুগের বিবর্তনের কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের পর্বস্ত সৌধেঁনি। যা অবশিষ্ট ছিল, সেগুলোও



বিকশিতভাবে কিছু কিছু ছিল। সেগুলো থেকে কিছু ইমাম তাবারি রহ.' (২২৪-৩১০ হি.) সংগ্রহ করতে পেরেছেন। আর কথিত আছে, আরও কিছু জার্মানির বিখ্যাত হাইডেলবার্গ শহরে সংরক্ষিত আছে। সেগুলো ওয়াহাব ইবনে মুনায্জিহ রহ.' (৩৪-১১৪ হি.)-এর লিখিত আংশিক বর্ণনা।

তবে তাদের পরে এমন একদল সিরাত বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব ঘটে, যারা প্রথম সারির বর্ণিত বর্ণনাগুলোকে নিছক নিছক কিতাবে উত্তম পদ্ধতিতে এবং চমৎকার বিন্যাসে বিন্যস্ত করেছেন। সেগুলো আলহামদুলিল্লাহ, অতি উত্তম পদ্ধতি ও বিন্যাসের সাথে আমাদের পর্বন্ত পৌঁছেছে।

এই পরবর্তী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম আসে ইবনে ইসহাক রহ.' (মৃত্যু ১৫২ হি.)-এর। বিশ্লেষক উলামায়ে কিরামের সবাই একমত, ইবনে ইসহাক সিরাতশাস্ত্রে যা কিছু লিখেছেন, সেগুলো সে যুগে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হয়েছে।

২. আবু জাকর মুহাম্মাদ ইবনে জারির আমুলি তাবারি। কাজবিন সাগরের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত পাহাড়-পর্বতবরা তাবারিডানের রাজধানী আমুলে তার জন্ম। তিনি একাধারে সুজতাহিদ ইমাম, মুকদসির, হাকিম্ হাদিস। কবি। ইতিহাসবিদ। ভাষাবিজ্ঞানী। বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারী। বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তার এতগুলো উপাধি তার মর্যাদা ও বিদ্যাসাপন্ন হওয়া প্রমাণ করে।

৩. হাইডেলবার্গ (Heidelberg)। জার্মানির দক্ষিণ-পশ্চিমে নেকার নদীর তীরে অবস্থিত বাডেন-ডুর্টেমবার্গ-এর একটি বিশ্ববিদ্যালয় শহর। হাইডেলবার্গ ব্র্যান্সকফুর্ট-এর ৭৮ কি.মি. (৪৮ মাইল) দক্ষিণে অবস্থিত। হাইডেলবার্গ বাডেন-ডুর্টেমবার্গের পশ্চিম বৃহত্তম শহর। এটি জনবহুল রাইন-নেকার মেট্রোপলিটন অঞ্চল-এর একটি অংশ। ২০১৬ সালের আদমশুমারিতে এর জনসংখ্যা ছিল ১,৫৯,৯১৪ জন। যার মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশই ছাত্র।

হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। এটি জার্মানির প্রাচীনতম এবং ইউরোপের অন্যতম নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়। হাইডেলবার্গ জার্মানির একটি বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র এবং এর বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন গবেষকামূলক সুবিশাল ইউরোপীয় অনুবিজ্ঞান পরীক্ষাগার এবং চারটি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের আবাসস্থল।—অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত ও সংযোজিত।

৪. আবু আবদুল্লাহ ওয়াহাব ইবনে মুনায্জিহ আফফানি ইব্রাহিম। তৃতীয় খলিফার রাসুলি উসমান ইবনে আফফান রা.-এর ক্বিলাকতকালে ইয়ামানে তার জন্ম। তিনিও একাধারে বিদ্বৎ পণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও ইমাম ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদিস সংগ্রহের সৌভাগ্য তার হয়েছে। তার ইচ্ছাকাল কারও মতে ১১০, আবার কারও মতে ১১৩ হিজরি।—অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত ও সংযোজিত।

৫. আবু বকর বা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক কুরাইশি সুত্তালিবি মাদানি। বিখ্যাত তাবিয়ি। বিদ্বৎ পণ্ডিত। প্রখ্যাত হাকিম্ হাদিস। ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। সিরাত ও মালাজিসাত্বজ্ঞ। কোনো কোনো বর্ণনায় তার জন্ম ৮০ হিজরি ও মৃত্যু ১৫১ হিজরিতে।



যদিও তার গ্রন্থ ‘আল মাগাজি’ ধারাবাহিক সূত্রে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেন; কিন্তু তার পরবর্তী সিরাত লেখক ইবনে হিশাম রহ.’ (মৃত্যু ২১৩ হি.) সিরাতশাস্ত্রের ওপর একটি দলিলভিত্তিক গ্রন্থ বিন্যস্ত করেছেন, যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। এই গ্রন্থটি ইবনে ইসহাকের ‘আল মাগাজি’-এর ৫০ বছর পর সংকলন করা হয়।

ইবনে খাল্লিকান বলেন—

ইবনে হিশাম হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ইবনে ইসহাকের *আল মাগাজি* ও *আস-সিয়ার* কিতাব দুটি থেকে বর্ণনাগুলো সংগ্রহ ও একত্রীকরণের কাজ করেছেন। যিনি সেই সকল বর্ণনা একত্র করে সেগুলোকে সুন্দরভাবে বিন্যাস দিয়েছেন। আর এটিই আজকের সেই কিতাব, যাকে *সিরাতে ইবনে হিশাম* নামে মানুষের হাতে দেখা যায়।

যাহোক, সিরাত-রচনায় যে সকল উৎসের ওপর রচয়িতাগণ নির্ভর করেছেন, তা এমন—

এক. কুরআনে কারিম।

এটিই সিরাতে নববি রচনার অন্যতম ও প্রধান ভিত্তি বা উৎসমূল। কুরআনে কারিমেই নবজির পবিত্র জীবনের প্রাথমিক, সংক্ষিপ্ত ও প্রধান পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

দুই. ঋনিসুন নবি।

হাদিস সংকলনকারী উলামায়ে কিরাম। তারা যোগুলো সংকলন করেছেন নবজির জীবনীর ব্যাপারে, এগুলো হলো সিরাত রচনার দ্বিতীয় উৎসমূল। আর হাদিস সংকলনকারী উলামায়ে ইসলামের দীনদারি, তাদের একনিষ্ঠতার ব্যাপারে সকলেরই জানা আছে। এর মধ্যে তাদের লিখিত সংকলনের তালিকায় আছে *মুজাভা ইমাম মালিক*, *মুসনাদু ইমাম আহমাদ* ও অন্যান্য। যদিও এই সংকলনগুলো এ উদ্দেশ্যে করা হয়নি যে, এগুলো নবি-জীবনের ইতিহাস রচনা করবে; বরং এই সংকলনগুলোর উদ্দেশ্য ছিল, নবজির আমল, তাঁর বাণী

৬. আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম মাআকিরি হিমরারি বসরি মিসরি। তার জন্ম বসরায় হলেও মৃত্যু মিশরে। তিনিও একাধারে সিরাত-শাস্ত্রজ্ঞ। কশখিখারদ, সমাজবিজ্ঞানী ও জাবাবিদ। আরবের ইতিহাস-ঐতিহ্য ছিল তার নখদর্পণে। কোনো বর্ণনার তার মৃত্যু ২১৮ হিজরি।

৭. *ওলাকারাফুল আইয়ান*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১০, মিসরি সংস্করণ।



নির্দেশনাগুলো সংরক্ষণ করা। এজন্য দেখা যাবে, এখানে ইতিহাস সংরক্ষণের কোনো ধারাকে অনুসরণ করা হয়নি। এখানে শুধু নবিজির কথা-কাজ এবং আহকামগুলোর বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়া এগুলো সাজানোও হয়েছে ফিকহি অধ্যায় হিসেবে। আবার কখনো দেখা যাবে—যে হাদিস যে সাহাবি বর্ণনা করেছেন, সেই সাহাবির নামেই বর্ণনাটি এসেছে। কারণ ওই একটিই, এখানে নবিজির জীবনী বর্ণনা উদ্দেশ্য ছিল না।

তিন. সেই সকল বর্ণনাকারীর বর্ণনা, যেগুলো বর্ণনাকারীরা নবিজির জীবনী হিসেবেই বর্ণনা করেছেন।

বেশ কয়েকজন সাহাবি রয়েছেন, যারা নবিজির আশেপাশে হয়তো বিশেষ কোনো সময়, বিশেষ কোনো ঘটনা অথবা কথা বলার সময় ঘটনাম্বলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই কথা বা বর্ণনা অপর কোনো সাহাবির কাছে বর্ণনা করেছেন। তবে কোনো সাহাবি সকল বর্ণনা একত্র করার ব্যাপারে, বা সেগুলো সংকলনের ব্যাপারে মনোযোগ দেননি। আর এখানেই মূলত আমি আপনাদের সেই পার্থক্যটা দেখাতে চাই যে, সাধারণভাবে রচিত নবিজির সিরাত রচনা এবং বিশেষভাবে নবিজির সিরাত রচনার উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত সিরাতের কী পার্থক্য।

সিরাতুরবি বা নবি-জীবনী বর্ণনার তাত্ত্বিক পদ্ধতি

সিরাত রচনা যে আংশিক ইতিহাস রচনা, তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট ও পরিষ্কার। সিরাত সংকলন ইসলামি ইতিহাস রচনার ভিত্তি এবং এই শাস্ত্রই নবিজির নবুয়তপ্রাপ্তির আগে-পরের সকল ঘটনা ও খবরাখবর সংকলন ও বিন্যাসের চালিকাশক্তি; কিন্তু তাই বলে সিরাতশাস্ত্রজ্ঞগণ নবি-জীবনের ঘটনাপ্রবাহ সংকলন ও গ্রন্থ রচনায় কি লাগামহীনভাবে কাজ করেছেন নাকি বিশেষ কোনো পদ্ধতি ও নীতিমালার ওপর নির্ভর করেছেন, তা জানা একান্ত প্রয়োজন।

হ্যাঁ, এ ব্যাপারে তারা জ্ঞানভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তারা তাত্ত্বিক মূলনীতি ও নিয়মকানুনের আলোকে একটি নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। আজকের ইতিহাস রচনাকারীরা সেই পদ্ধতিকে ‘সাবজেক্টিভ তরিকা বা বিষয়কেন্দ্রিক পদ্ধতি’ পরিভাষায় আখ্যায়িত করেছে।

এর অর্থ—সিরাত সংকলক ও শাস্ত্রজ্ঞগণ নবি-জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে নির্ধারিত মূলনীতি ও নিয়মকানুনের কটিপাথরে যাচাই-বাছাই করেছেন। তাদের এই কটিপাথর

সনদ-মতন (ঘটনার বর্ণনাসূত্র ও মূল ঘটনা), জরহ-তাদিল (বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও পরিমার্জন) এবং বর্ণনাকারীদের জীবনী জানার ওপর প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি ও নিয়মকানুন অর্থাৎ হাদিসশাস্ত্রেরই যাবতীয় নিয়মনীতি দিয়ে গঠিত ও প্রণীত।

তারা সিরাতের কোনো ঘটনা বা সংবাদ পেলে সেটাকে এসব মূলনীতি ও নিয়মকানুনের আলোকে যাচাই-বাছাই করতেন এবং এই যাচাই-বাছাইয়ের ওপর নির্ভর করেই তথ্য-উপাত্ত সংকলন ও নথিবদ্ধ করতেন। সংকলন করতে গিয়ে তারা নিজেদের চিন্তাগত কোনো দিক, মানসিক প্রবৃত্তির কোনো ছাপ এবং সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক ঝোঁক কোনোভাবেই সংকলনে স্থান দিতেন না।

তারা মনে করতেন, এই চূড়ান্ত পর্যায়ের সূক্ষ্ম ও জ্ঞানভিত্তিক মূলনীতির কঠিণাথরে যাচাই-বাছাইয়ের পরে যেই ঐতিহাসিক ঘটনার দেখা মিলেছে, তা একটি পবিত্র বাস্তবতা ও আমানত। একে তার মূল অবস্থা ও আকৃতিতেই মানুষের সামনে পেশ করা উচিত ও কর্তব্য।

তারা আরও মনে করতেন, অধিকাংশ সময় পরিবেশের প্রভাব এবং গোঁড়ামির কুফলস্বরূপ ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ ও মনের কুপ্রবৃত্তিকে নিজের ওপর চাপিয়ে নিয়ে ইচ্ছেমতো লেখা এবং ইচ্ছেমতো মুছে ফেলা অধার্মিকতা ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এসব ইলমি কায়দাকানুন ও ইতিহাসের ‘অবজ্ঞেস্তিত তরিকা বা দৃশ্যমান বস্তুকেন্দ্রিক পদ্ধতি’-এর ভিত্তিতে নব্বিজির জীবনী আমাদের পর্বন্ত পৌঁছেছে।

তাঁর জীবনচরিতের সূচনা তাঁর বরকতময় জন্ম থেকে। সিরাতের আলোচ্য বিষয়ে রয়েছে তার বংশধারা, শৈশব, বাল্যকাল ও যৌবনের বর্ণিত ঘটনাসমূহ। পাশাপাশি তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির আগপর্বন্ত এই সময়গুলোতে যেসব অলৌকিক ঘটনা নবুয়তের পূর্বলক্ষণরূপে দেখা গেছে, সেগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সর্বোত্তম চরিত্র-অভ্যাস, সততা ও আমানতদারির আলোচনাও স্থান পেয়েছে। এভাবে নবুয়ত লাভের ঘোষণা দেওয়ার পর আদ্বাহশাক সময়ে সময়ে তাঁর হাতে যেসব অলৌকিক ঘটনা ও মুজিব্বা প্রকাশ করেছেন, সেগুলোও এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। আদ্বাহ তায়ালার হুকুম অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে দাওয়াতের যেসব ধাপ তিনি অতিক্রম করেছেন এবং সেই সময়ে সখি, প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা, জিহাদ এবং দাওয়াতি পথে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন, সেগুলোর বর্ণনাও রয়েছে। এসব কিছুই কুরআন ও কুরআনের ব্যাখ্যা হাদিসের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি।



নবি-জীবনের এই ধারাবাহিকতার সম্পর্ক ঐতিহাসিক সংরক্ষিত আমাদের মাধ্যম ও মধ্যস্থতায় আমরা পেয়েছি। এবং সকল তথ্যই একটি নিবিড় পরিচর্যাগত পন্থতির ভেতর দিয়ে যাচাই-বাছাইপূর্বক সংকলন ও গ্রন্থবন্ধ করা হয়েছে। তাই যতক্ষণ এসব ঘটনাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে এগুলো থেকে সারাংশ ও ফলাফল, আমলি জিন্দেগির বিধিবিধান, আকিদা-সংশ্লিষ্ট মূলনীতি ও গভীর অর্থ উদ্ভাবনের সম্পর্ক রয়েছে, ততক্ষণ এটি একটি ইলমি কাজ ও গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কীর্তি। এর সাথে সাধারণ ইতিহাসশাস্ত্রের নূনতম সম্পর্ক নেই। এতে এক অবস্থাকে আরেক অবস্থার সাথে মেলাও যাবে না।

চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করে ঘটনাপ্রবাহ থেকে ফলাফল ও শিক্ষা, মূলনীতি ও নীতিমালা উদ্ভাবন করে এবং সেগুলোকে এক বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণনা করে সন্দেহ ও মনের কুশ্রব্ধি মুক্ত রাখায় উইলিয়াম জেমস'-এর মতো ব্যক্তির এগুলোকে 'ইরাদাতুল ইতিকাদ' নামে গ্রন্থবন্ধ করেছেন।

সেসব নিয়ম ও নীতিমালায় আছে কiyাসে ইসতিকরায়ি (অভিজ্ঞতালব্ধ যুক্তি), বিভিন্ন রকম কানুনে ইলতিজাম (বাধ্যতামূলক আইন) ও নানা ধরনের দালালাত (বৃক্ষিবৃত্তিক নির্দেশনা)।

এগুলো মূলত সেই ইলমি অনুসন্ধানের গুপ্তধন—যা ইলমি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের চার দেওয়ালের সীমারেখায় মুকুলিত। ইতিহাস ও ইতিহাস সংকলন এবং এর মর্মার্থ ও বিষয়বস্তু থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা।

ইতিহাস রচনার নতুন পন্থতির বিচারে সিরাতের অবস্থান

উনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস রচনা ও সংকলনের নানামুখী পন্থতি উদ্ভাবিত হয়। সেগুলোর মধ্যে একটি অবজ্ঞেস্তিভ পন্থতি আছে, যেটাকে 'বৈজ্ঞানিক পন্থতি'-ও বলা হয়। উদ্ভাবিত সবগুলো পন্থতির মধ্যে অভিন্ন বিষয়টিকে 'ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি/অভিমত' বলে নাম দেওয়া হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির বড়ো বড়ো দাবিদারের

৮. উইলিয়াম জেমস (William James, 1842-1920)। জন্ম-মৃত্যু আমেরিকায়। একসাথে দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও মনোবিজ্ঞানী। যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানের কোর্স তিনিই প্রথম চালু করেন। তাই তাকে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোবিজ্ঞানের জনক' বলে গণ্য করা হয়।—অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত ও সংযোজিত।

৯. ইংরেজি মূল সংস্করণের নাম হলো—The will to believe.

মধ্যে সিগমুন্ড ফ্রয়েড^{১০}-কে সবার উর্ধ্ব গণ্য করা হয়। এই অজ্ঞানে তিনি খুবই প্রসিদ্ধ ও মশহুর ব্যক্তিত্ব।

এই দৃষ্টিভঙ্গির বড়ো বড়ো দাবিদাররা ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাহিনির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আড়ালে নিজস্ব চিন্তাচেতনা, নিজ ধর্মের প্রতি আহ্বান এবং নিজের রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতি উদ্ঘোষকরণকে দোষের কিছু মনে করে না; বরং একে তারা ইতিহাস লেখকের দায়িত্ব-কর্তব্য বলে বিবেচনা করে। তাদের ধারণা, ঐতিহাসিকদের কাজ শুধু গতানুগতিক অতীতের সংবাদ প্রদান এবং ঘটনাপ্রবাহ সংকলনেই সীমাবদ্ধ নয়। (বরং নিজের একটা অভিমত বা সিদ্ধান্ত দেওয়াও তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ।)

এই পদ্ধতি ইতিহাস সংকলনকে কেবল একটি শাস্ত্রীয় বিষয়ে পরিণত করে যেটাতে এর ইলমি ও তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম কাজ সমাধিষ্ণু হয়ে যায়। এখানে সেন্সব পদ্ধতি এবং সেগুলোর সমালোচনার ব্যাপারে কিছু বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং আফসোস হচ্ছে, আজকের যুগে বৈজ্ঞানিক মূলনীতি ও নিয়মকানুনকে খুবই মূল্যায়ন ও বিবেচনার চোখে দেখা হয়। অথচ এ যুগেও সেই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিমতের দাবিদারও আছে। আবার সেই দাবি গ্রহণ করার মতো পাবলিকও আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি লালন সেই সকল বাস্তবতা ও ঘটনাকে একেবারে পরিবর্তন ও বিকৃত করে দেয়, যেগুলোকে সময় তার পরতে পরতে ভাঁজ করে রেখেছে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম চর্চার মাধ্যমে সংরক্ষণ করে আসছে।

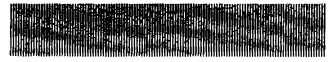
এই নব আবিষ্কৃত দৃষ্টিভঙ্গি মোতাবেক ওইসব সংরক্ষিত ঘটনায় ব্যক্তিগত চাহিদা, গোঁড়ামি এবং চিন্তাগত ধ্যানধারণাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ফলে এ ধরনের ধারণা ও কল্পনাপ্রসূত এবং অন্যায় দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনা করে না-জানি কত বাস্তব বিষয়কে বিকৃত করা হয়েছে, কত শতসহস্র ঘটনাকে পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে, কত সম্মানিত লোকের মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং না জানি কত নিরপরাধ মানুষের ওপর অন্যায় জুলুম করা হয়েছে!

এবার কথা হলো—সিরাতশাফেও কি এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ফেলা হয়েছে?

১০. সিগমুন্ড ফ্রয়েড Sigmund Shlomo Freud, 1856-1939। জন্ম অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যে, বৃহৎ বুদ্ধরাজ্যে। অস্ট্রিয়ান নিউরোলজিস্ট ও সাইকোরোনলিসিস (মনোব্যাক্সির চিকিৎসাপদ্ধতি)-এর প্রতিষ্ঠাতা।





হ্যাঁ, হয়েছে। ইতিহাস রচনার এই নতুন পদ্ধতি একদল মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের মতে, সিরাত অখ্যায়নের একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম বা নতুন চিন্তাকেন্দ্র রয়েছে; কিন্তু এই চিন্তাকেন্দ্রের সূত্রপাতের প্রেক্ষাপট, কারণ এবং আজকের যুগে এর সুফল-কুফল ইত্যাদি সম্পর্কে সামান্য ধারণা থাকাও প্রয়োজন।

এই চিন্তাকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় মিশরে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কালে। যেমন : আমরা জানি, সে সময় মিশর ছিল গোটা মুসলিমবিশ্বের প্রাণকেন্দ্র ও মারকাজ। ইসলামের কোনো ব্যাপারে মুসলিমদের জ্ঞানার প্রয়োজন পড়লে মিশরি আলিমদের চিন্তা ও জ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হতো। ঠিক হাজার উদ্দেশ্যে বের হলে বা সালাতে দাঁড়ালে যেমন খানায় কাবার দিকে মুখ করা হয়, তেমনই।

মিশরের দিকে গোটা মুসলিমবিশ্বের তাকিয়ে থাকার সুযোগটিকে কাজে লাগানোর চিন্তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নীরবে ও শান্তিতে বসে থাকতে দেয়নি। ব্রিটিশরা যদিও আগুন-লোহার বলে জোরপূর্বক মিশরের বুকে তাদের শাসনদণ্ড দাঁড় করিয়েছিল; কিন্তু এটা ছিল তাদের সাময়িক দখল। ফলে এতটুকুতেই তারা স্বস্তি পাচ্ছিল না। কারণ, যতক্ষণ জামে আল আজহার"-এর জীবন্ত নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আছে, ততক্ষণ তারা পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বলতে গেলে বিফল। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দুটি সমাধানের যেকোনো একটি অবলম্বন করা অপরিহার্য ও আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়—

এক. জামিয়া আজহারের সাথে মুসলিমবিশ্বের সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাহলে মুসলিম উন্মাহর ওপর এর কোনো প্রভাব ও কর্তৃত্ব থাকবে না।

দুই. স্বয়ং আজহারের কার্যগত কেন্দ্র একেবারে মাঠে-ময়দানে নেতৃত্বদান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এবং নেতৃত্বের বাগডোর সেদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া, যেদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ লাভে পুরোপুরি সফলতা অর্জিত হয়। তাহলে পরিশেষে এই কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতাও থাকবে না।

ব্রিটিশরা দ্বিতীয় পথটি দ্বিধাভ্রম্ভ ছাড়াই বেছে নেয়। কারণ, এ পথে গন্তব্যে পৌঁছা ছিল অতি সহজ এবং এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল একেবারে ক্ষীণ।

১৭. পৃথিবীর প্রাচীন ও বিখ্যাত ইসলামি বিদ্যাপীঠ জামে আল আজহার, মিশর।

১২. 'আল ইত্তিজাহাতুল ওয়াতনিয়াহ ফিল আদাবিল হাদিস' দ্রষ্টব্য।



জামে আল আজহারের ইসলামি ও ফিকহি নেতৃত্বের মস্তিষ্কে ঢোকার একটি রাস্তা ছিল মুসলিম উম্মাহর দুর্বল ও মর্যাদাসিক বিষয়গুলোকে চর্চার রূপ দেওয়া। ফলে মিশরের মধ্যস্থতায় গোটা মুসলিমবিশ্বের অনুভূতি ও উপলব্ধি হবে ক্ষতবিক্ষত।

সেই অনুভূতি ছিল, মুসলিম উম্মাহ একদিকে দুর্বল, শতধা বিভক্ত ও অনৈক্যের শিকার আরেক দিকে পশ্চিমা ও ইউরোপীয় চিন্তাচেতনা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও কৃষ্টিকালচারের বিস্ময়কর অগ্রগতি ও সফলতা দৃশ্যমান। এসব দেখে মুসলিম জাতিও সেই দিনের অপেক্ষার গ্রহর গনা শুরু করে, যেদিন তারাও পিঠের ওপর চাপানো বোঝা থেকে হালকা হবে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সাথে তাল মিলিয়ে চলবে। (কিন্তু সেদিন কবে?)

ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই চিন্তা ও স্বপ্নটাই মিশরের কয়েকজন চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী নেতার মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই চিন্তার কথা বলে তাদের বোঝানো হয়—পশ্চিমা বিশ্বও আজকের মুসলিমদের মতো একসময় হাত-পায়ে শিকল বাঁধা ছিল; কিন্তু যখন তারা ধর্মকে বিজ্ঞানের অনুগামী করতে পেরেছে, ঠিক তখনই তারা তাদের শিকল ভাঙতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, ধর্ম এক বিষয়, বিজ্ঞান আরেক বিষয়। তবে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির অনুগামী করা গেলেই দুটির মাঝে সামঞ্জস্য ও আনুকূল্য হতে পারে। সুতরাং মুসলিমবিশ্ব বাস্তবে এবং সত্যিই যদি এ ধরনের স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রত্যাশী হয়ে থাকে, তাহলে তাকেও একই পথে চলতে হবে। মুসলিম উম্মাহকেও ঠিক সেভাবে ইসলাম বুঝতে হবে যেভাবে পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামি ধর্ম অনুশাবন করেছে; কিন্তু ইসলামি চিন্তাকে অবোধগম্য অদৃশ্য-বিষয়ক আকিদা-বিশ্বাস থেকে আলাদা করা অথবা সেগুলোকে আধুনিক বিজ্ঞানের মাপকাঠি ও মানদণ্ডের অধীন না করা পর্যন্ত এই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। বাস্তবে এবং কার্যগতভাবে এর প্রতিফলন ঘটবে না।

এই কানামুয়া বিদ্যুৎগতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি মুক্তচিন্তার রূপ নেয়। চিন্তাটি ইউরোপের অগ্রগতির সামনে অন্ধ চিন্তাবিদদের খুবই মনে ধরে। তারা একে সাদরে বরণ করে নেয়। এরা এমন সব মুসলিম বুদ্ধিজীবী, যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান তখনও দৃঢ় ও বশ্বমূল হয়নি। আবার আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানও তাদের কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তারা আধুনিক বিজ্ঞানের যাচাইয়ের উর্ধ্বে বা

১৩. 'গাইব-বিষয়ক বিশ্বাস', যা শুধু আল্লাহ তায়লা অথবা নবির কোনো বর্ণনা শুনে 'না দেখে'-ই মুসলিমগণ বিশ্বাস করে থাকেন।



মানুষের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের আওতার বাইরের সব আকিদা-বিশ্বাস মন থেকে বের করে দেয়। এ ব্যাপারে তারা যতটুকু সামনে অগ্রসর হয়, সেটাকে ‘ধর্মীয় সংস্কার’-এর নাম দিয়ে সমাজে প্রচার করে। বিভিন্ন বিষয়ে সংশোধনের নামে হাজার রকমের সংস্কারের কাজ তারা করে। সিরাত রচনা এবং সিরাত বোঝার সহায়ক শাখা-প্রশাখাও তাদের এই সংস্কার নামক হিংস্র থাবা থেকে মুক্তি পায়নি। এ শাখায় তারা সিরাতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ ও উপযোগী একটি চমকপ্রদ ও সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে। তারা মূলনীতি বানায়, অদৃশ্য বিশ্বাস বা গাইব-সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় যদি অভ্যাস পরিপন্থি হওয়ার সাথে সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিকূল এবং মানবিক চিন্তার উর্ধ্বে থাকে, তাহলে সেটাই পরিত্যক্ত ও বর্জিত। তা গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়ার কোনো সুযোগ বা অবকাশ নেই।

এসব দুর্বল ঈমানদারদের জন্য ইতিহাস রচনার উক্ত আধুনিক পদ্ধতি অর্থাৎ ‘ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি/অভিমত’ অতি উত্তম একটি আশ্রয়স্থলের রূপ নেয়। এভাবে তারা নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী ইতিহাসশাস্ত্র তো বটেই, নবিজির পবিত্র সিরাতকেও বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার আওতাভুক্ত করে নেয়।

ধীরে ধীরে সিরাতশাস্ত্রের ওপর এমন সব গ্রন্থ আসতে থাকে, যেগুলোতে রেওয়াজাত, সূত্র, নীতিমালা ও হাদিস যাচাইয়ের শর্তাবলি দৃঢ়করণের পরিবর্তে ব্যক্তিগত উদ্ভাবন-পদ্ধতি ও মানসিক প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণকেই ভিত্তি করা হয়। ফলে এভাবে লেখকের ব্যক্তিগত আকর্ষণ, বিশেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তার ধর্মীয় ঝোঁকের প্রতিচ্ছবিও লেখায় ঢুকে পড়ে। আর পরিণতি হিসেবে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে করতে একসময় সেসব ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকরা নবি-জীবনের সাধারণ অভ্যাস-পরিপন্থি অস্বাভাবিক ঘটনা এবং জাগতিক পর্যবেক্ষণবিরোধী মুজিজাগুলোকে মেনে এবং স্বীকার করে নিতে বেকঁর বসে।

তারা নবিজির অসাধারণ তীক্ষ্ণতা, মাহাত্ম্য, অসম্ভব সাহসিকতা এবং এ ধরনের হাজারো গুণের কথা চমৎকার সব শব্দ-বাক্যে লিখতে গিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কালো করে ফেলে। অথচ তার নববি সন্তার আলোচনায় একফোঁটা কালিও খরচা করেনি। উদ্দেশ্য, পাঠকের মনোযোগকে নবিজির এসব বাহ্যিক গুণাবলিতেই ব্যস্ত ও মগ্নগুল রাখা আর নবিজির মানবসন্তার সাথে আটপুঠে জড়িত বিশেষ গুণ নব্যুত, রিসালাত এবং নব্যুত-সংশ্লিষ্ট এ ধরনের বহু গুণের দিক থেকে পাঠকের চোখ ফিরিয়ে রাখা।



সিরাত লেখার এই প্রকৃতি ও প্রবণতার সর্বোত্তম নমুনা হুসাইন হাইকাল"-এর 'হায়াতে মুহাম্মাদ' গ্রন্থ। লেখক তার এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ও অনুরাগের কথা গর্বের সাথে বলতে গিয়ে লেখেন—

নিঃসন্দেহে সিরাত ও হাদিসের কিতাবাদিতে যা কিছু লেখা আছে, আমি সেখান থেকে কিছুই নিইনি; বরং এই আলোচনা ইসলামি (বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক) পদ্ধতিতে উল্লেখ করাকেই আমি প্রাধান্য দিয়েছি।

সিরাত বোঝার এই নতুন পদ্ধতির একটি নমুনা নূরুল ইসলাম পত্রিকায় 'বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে সিরাতে মুহাম্মাদ' শিরোনামে প্রকাশিত মরহুম মুহাম্মাদ ফরিদ ওয়াজ্জি"-এর ধারাবাহিক প্রবন্ধ। ধারাবাহিক প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি লেখেন—

আমাদের পাঠকসমাজ খেয়াল করলে দেখে থাকবেন, সিরাত রচনায় আমাদের ইচ্ছানুযায়ী আমরা নবির অলৌকিক ঘটনা ও মুজিজা বর্ণনায় অনেক বেশি দীর্ঘ আলোচনা করি না। যতক্ষণ সেটার কারণ বর্ণনা সাধারণ উপায়-উপকরণ দিয়ে সম্ভব, শুধু ততক্ষণই করি। কৃত্রিম বিষয় দিয়ে কোনো ব্যাখ্যা আমরা করি না। (বরং তখন আমরা ব্যাখ্যা ছাড়াই বিশ্বাস করতে বলে থাকি।)"

নব আবিষ্কৃত এই পদ্ধতিতে সিরাতচর্চার নমুনায় প্রাচ্যবিদদের অসংখ্য গ্রন্থ আছে। তাদের যাবতীয় রচনা সেই 'ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিমত'-সংবলিত ইতিহাসগ্রন্থের চেয়ে বেশি মূল্যের কিছু নয়।

প্রাচ্যবিদদের রচনাবলি খুললেই দেখা যায়, নবির বড়োড় ও মাহাত্ম্য বর্ণনায় কোনো কমতি নেই। তাঁর মান-মর্যাদা ও উত্তম গুণাবলি আলোচনায় সামান্য ঘাটতি নেই; কিন্তু তাঁর পবিত্র জীবনে ওহি ও নবুয়ত বলে যে একটা কিছু ছিল, তা আর তাদের রচনায় হারিকেন জ্বালিয়েও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর জীবন যে কুরআন নামক সংবিধানমাত্রিক পরিচালিত হয়েছে, তার হাদিস আর তাদের লেখা রচনায়

১৪. মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকাল (১৮৮৮-১৯৫৬)। জন্ম-মৃত্যু নিশেরে। কবি। সাহিত্যিক। রাজনৈতিক চিন্তাবিদ। ১৯১২ সালে তিনি ফ্রান্সের সোরবোন ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

১৫. মুহাম্মাদ ফরিদ ওয়াজ্জি (১৮৭৮-১৯৫৪)। জন্ম : আলেক্সান্দ্রিয়া, মৃত্যু : কায়রো। তিনি গায় এক বৃন্দ আল আছহার পত্রিকার محرর ছিলেন। বিশিষ্ট কলামিস্ট ও গবেষক। তার একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে সিরাতে মুহাম্মাদ তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

১৬. নূরুল ইসলাম, 'বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে সিরাতে মুহাম্মাদ' শিরোনামে প্রকাশিত রচনা।



মেলে না। তো এভাবে নবুয়তবিহীন জীবনালেখ্য লেখার উদ্দেশ্য—পাঠকের মনোযোগ ও খেয়াল যেন তাঁর নববি সত্তা থেকে সরে যায়।

অনুরূপ এরা তথ্য পরিবেশনে সূত্র ও বর্ণনার নিয়ম অনুসরণ করে না। ফলে যেসব ঘটনার ওপর নির্ভর করা বা যেগুলো বর্ণনার গুরুত্বদানে পাঠকের তেমন কোনো লাভ নেই, সেগুলোও পাঠককে মেনে নিতে এবং বিশ্বাস করতে হবে। এভাবে এই নতুন চিন্তাক্ষেত্রের ইতিহাস রচনায় ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিমতের অনুসরণে একটি প্রশস্ত ময়দান তৈরি হয়; যেখানে তারা নবি-জীবনে তাদের অগছন্দনীয় বাস্তবতাগুলো অনায়াসেই ছাঁটাই করে দিতে পারে। সেসব বাস্তবতা জ্ঞান ও বিশ্বাসের যতই শক্তিশালী ও মজবুত দলিল হোক না কেন; তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ঝোঁক, মনের কুপ্রবৃত্তি ও বিভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে ইতিহাসের স্বরূপ এবং এর আড়ালে নিহিত কারণসমূহের অধীনে মানদণ্ড ও কষ্টিপাথর বানিয়ে নেয়। আর কোনো বর্ণনাকে গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে নিজেদের মনের চাহিদাকেই সাধারণ ফয়সালাকারী নির্ধারণ করে।

এ ব্যাপারে আমরা দেখেছি, তারা কুরআন বা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত অভ্যাস পরিপন্থি ঘটনাগুলোর এমন অপব্যাখ্যা করেছে, যার ফলে এসব ঘটনাও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ও অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেসব ঘটনার ব্যাখ্যায় তারা অত্যন্ত কৃত্রিমতা ও লৌকিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সূরা ফিলের ‘আবাবিল’ (ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি)-’এর অর্থ আয়াতে কারিমা থেকে একেবারে সুস্পষ্ট। তবুও তারা একে ‘বসন্ত রোগ’ বলে এর অপব্যাখ্যা করেছে।

ইসরা ও মিরাজের ঘটনা কুরআনে কারিমের সূরা বনি ইসরাইলে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। অথচ এর অপব্যাখ্যাও তারা করেছে ‘আধ্যাত্মিক ভ্রমণ এবং স্বপ্ন দেখা’ বলে। অনুরূপ বদরের প্রান্তরে আব্রাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মাধ্যমে চাক্ষুষ যেই সাহায্য করেছেন, সেটার বিকৃত ব্যাখ্যাও তারা করেছে আব্রাহ তায়ালা ‘অদৃশ্য বা অর্ধগত সাহায্য’ বলে।

তাদের এ ধরনের আজগুবি ও হাস্যকর শতসহস্র অপব্যাখ্যার মধ্যে আরেকটি হলো—নবিজির নবুয়তপ্রাপ্তি; তাঁর ওপর সাহাবায়ে কিরামের ঈমান আনয়ন এবং দিয্বিদিব জয়ের রহস্য ও ব্যাখ্যা। তাদের বক্তব্য, এই সবকিছুই নাকি অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সচ্ছলতা লাভের প্ররোচনায় ডানপন্থিদের

মোকাবিলায় বামশঙ্খিদের অভ্যুত্থান। এবং ধনিক শ্রেণির প্রতি হিংসার অনলে প্রজ্বলিত গরিবদের বিরোধিতা।

সিরাত অধ্যয়নের বিবেচনায় ‘বিশেষ করে’ এবং ইসলামি ইতিহাসের বিবেচনায় ‘সাধারণভাবে’ এই নতুন পন্থতি একটি মারাত্মক ও গভীর বড়ঘত্র ছিল। বিষয়টি সাধারণ মুসলিমদের কাছে আরও ঝোঁলাটে ও ঝামেলার হয়ে দাঁড়ায় যখন তাদের চোখের সামনেই মুনাক্কি ও প্রবৃত্তিপূজারি কিছু নামধারী মুসলিম একে পছন্দ করে এবং সাদরে বরণ করে নেয়।

এসব সরলমনা লোকদের কাছে গোপন থেকে যায়, ‘ইসলামি আকিদার সংস্কারমূলক আন্দোলন’ আখ্যা দিয়ে মুসলিমদের যেই দিকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, তা একটি ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার নীলনকশা। যেটার হীন উদ্দেশ্য—ইসলামি আকিদার মূলোৎপাটন। তাদের কাছে গোপন থেকে যায়, ইসলামকে যদি তার গায়েবি মৌলিকত্ব থেকে খালি করে ফেলা যায়, তাহলে এই শূন্যতা পূরণে এমন কিছু বিষয় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে, যেগুলো একে ধ্বংস ও বরবাদ করে ছাড়বে।

এজন্য যে, আল্লাহ তায়ালায় ওহিই হলো ইসলামের উৎস ও ফোয়ারা এবং এই ওহিই সকল অভ্যাস-পরিপন্থি অলৌকিক ঘটনা ও যাবতীয় অদৃশ্য বাস্তবতার প্রধান ও প্রথম বিষয়। এখন যে ব্যক্তি নবি-জীবনের অভ্যাস পরিপন্থি কাজ ও অলৌকিক ঘটনাসুলোকে শুধু জগতের স্বাভাবিক রীতিনীতির বিপরীত এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিকূল হওয়ার কারণ দেখিয়েই অস্বীকার করবে, সে এই একই দলিলের ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালায় ওহি এবং ওহির সংবাদ-সংশ্লিষ্ট হাশর-নাশর, হিসাব-নিকাশ, জন্মাত-জাহান্নাম প্রভৃতিকেও একবাক্যে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করবে।

তাদের থেকে আরও লুকানো হয়েছে, যেই ধর্ম আপাদমস্তক কল্যাণকর, কোনো যুগেই তার কোনো সংস্কারক বা সংশোধনকারীর প্রয়োজন নেই। (বরং সংস্কারের প্রয়োজন হবে সেই ধর্ম পালনকারীদের।)

এই সবকিছুই তাদের থেকে লুকানো ও গোপন করা হয়েছে। অথচ সেসব চিন্তাবিদে এই বিষয়গুলো বোঝা ও অনুধাবন করা বিজ্ঞানেরই একটি দাবি ও চাহিদা। এই শর্তে যে, সাধারণ মুসলিমরাও তাদের থেকে এসবের বাস্তবতা ও যুক্তি সম্পর্কে অবগত হবে; কিন্তু তাদের নিজেদের চোখ ও দৃষ্টিই ইউরোপীয় নব উন্নতি ও দ্বিতীয় পুনর্জাগরণের ব্যাপারে রাতকানা হয়ে ছিল এবং বৈজ্ঞানিক ও শাসনিক জাদুতে তারা ছিল বিকারগ্রস্ত। তাই জ্ঞান ও যুক্তির বাহ্যিক শিরোনাম ও অনুভূতি



ছাড়া সেগুলোর ভেতর ও বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছতে তারা সক্ষম হয়নি। অথচ তাদের তীব্র প্রয়োজন ছিল—শুধু শিরোনাম নয়; বরং সেগুলোর বাস্তবতার পুরোপুরি বোধ পর্যন্ত তারা পৌঁছবে এবং সেগুলোর অনুভূতিকে সঠিক পন্থায় হজম করবে।

এ থেকে তো তারা প্রভাবিত হয়েইনি; বরং উল্টো ইউরোপে ইসাযি মতবাদে আগুন ধরানোর মতো ইসলামেও যেন বিশৃঙ্খলা ঘটে, এমন একটি কুসংস্কারমূলক আন্দোলনের ধারণা তাদের মাথায় ঢুকে যায়।

এভাবে এই বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মসনের চিন্তাকেন্দ্র মূলত একটি আকৌ প্রভুলন ছিল—যা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের কোনো ছটা ছিল না; যা বিবেককে আকৃষ্ট করতে পারে।

এই চিন্তা-মতাদর্শের বর্তমান পরিস্থিতি

বাস্তবতা ও আসল কথা হলো, সিরাত রচনা ও বোঝার ব্যাপারে এই নতুন মতাদর্শের পক্ষ থেকে যেই গুরুত্ব পাওয়া গেছে এবং কেউ কেউ আবেগের বশবর্তী হয়ে এই চিন্তাকেন্দ্রের যেই পৃষ্ঠপোষকতা ও সমাদর করেছিলেন, তা ছিল একটি ঐতিহাসিক বাঁক মাত্র; যার সময়কাল পেরিয়ে গেছে।

এই বাঁকের সাথে নিজেরাও ঘুরে যাওয়া মূলত তাদের অপারগতা ছিল। যেমন : পেছনে আলোচনা হয়েছে—এসব বুদ্ধিজীবী তাদের দীর্ঘ উদাসীনতা ও অলসতার পর যখন চোখ খোলে, তখন তাদের সামনে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উন্নতির চিত্র ছিল। আর এটি একটি স্বভাবজাত ও প্রাকৃতিক বিষয়—আলোর ওপর যখন চোখের প্রথম দৃষ্টি পড়ে, তখন চোখে ধাঁধা লেগে যায় এবং কল্পসামগ্রীর স্বরূপ ও বাস্তবতা উন্মোচিত হয় না। এমনকি সমজাতীয় ও সাদৃশ্যপূর্ণ জিনিসের মাঝে তফাত ও পার্থক্য করাটাও মুশকিল হয়ে পড়ে। তবে ধীরে ধীরে কিছু সময় গেলে এবং চোখের সাথে আলো খাপ খেয়ে গেলে চোখ দৃশ্যমান জিনিসের মাঝে পার্থক্য ও তফাত করতে পারে এবং কল্পের স্বরূপ ও বাস্তবতা পুরোপুরি উন্মোচিত হয়। যার মধ্যে সামান্য লুকোচুরি বা সন্দেহ পর্যন্ত আর থাকে না।

উপর্যুক্ত ব্যাপারেও হুবহু তা-ই হয়েছে। আজকের আধুনিক যুগের সচেতন ও শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের সামনে থেকে এ ধরনের সকল পর্দা ও আবরণ সরে গেছে এবং সবকিছুই নিজের স্বরূপ ও বাস্তবতা তার আসল বিষয়ের সাথে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

অতীতের লোকেরা শুধু শব্দই আঁকড়ে ধরে ছিল এবং এর বাহ্যিক অনুভূতির খোঁকায় পড়ে ছিল অথচ বর্তমান অবস্থা ও যুগ অনেক পরিবর্তিত। এ ছাড়া আজকের যুগে



তারা প্রত্যক্ষদর্শী বিশ্লেষক ও স্বাধীন চিন্তার গবেষকদের অন্তর্দৃষ্টির ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রেখে মেনে নিয়েছে, অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ও মুজ্জিয়ার মধ্যে কোনো কিছুই তার মূল বিষয়ের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা ও নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক ও বিরোধী নয়।

জগতে সচরাচর ঘটিত ঘটনার বিপরীত কাজকে সাধারণ অভ্যাস পরিপন্থি নাম দেওয়ার কারণ হলো, সেগুলো সাধারণত এবং প্রতিনিয়ত মানুষের চোখে পড়ে না। কিন্তু তাই বলে ‘প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ঘটে চলা বৈশ্বিক কাজকারবার’ এমন কোনো মানদণ্ড নয়, যার ভিত্তিতে আরেকটি বিষয়কে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য বলে নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট করা যায়। আজকের আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে—মানুষের চোখ সাধারণত যেগুলো দেখে অভ্যস্ত এবং যেসব কর্মকাণ্ড তাদের কাছে পরিচিত, শুধু সেগুলোই ঘটতে পারে আর যেগুলো দৃশ্যমান ও দৃষ্টিগোচর নয় এবং মানুষের কাছে পরিচিত নয়, সেগুলো আসলে ঘটতেই পারে না—এটি একটি ভুল ধারণা। বিজ্ঞান এমন কোনো বৃথা দাবির পক্ষাবলম্বন করে না। বর্তমান যুগের প্রত্যেক মুহাব্বিক ও শিক্ষিত ব্যক্তিই জানেন, এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের নতুন বিশ্লেষণ ও গবেষণা হলো—‘কারণ’ ও ‘ঘটনা’-এর মাঝে যেই সম্পর্ক আমরা দেখি, তা ধারাবাহিক ও লাগাতার অবলোকন ও প্রত্যক্ষ দর্শনে আগমনকারী সম্পর্ক; যা থেকে বিশ্লেষণ ও কারণ বর্ণনার সীমা পেরিয়ে একটি কানুন উদ্ভাবন করা হয়। আর এই কানুনটি ওই সম্পর্ক প্রকাশের অনুগামী হয়, বিরোধী নয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, অভ্যাস পরিপন্থি কাজ ও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রদর্শিত মুজ্জিয়ার ব্যাপারে তোমার কী মত? তাহলে সে বর্তমানের ভাষায় যেই জবাব দেবে, তা প্রত্যেক জ্ঞানী বরং যেকোনো সভ্য ব্যক্তিই বুঝতে পারবে। সে বলবে—অভ্যাস পরিপন্থি ও অলৌকিক বিষয় আমার বিষয়বস্তু ও বিশেষ জ্ঞানের কোনো কিছু নয়। আমি এসবের ওপর কোনো বিধান আরোপ করতে পারি না। (কারণ, আমার বিষয়বস্তু নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ।) তবে এ ধরনের কোনো ঘটনা যদি আমার সামনে পেশ করা হয়, তাহলে তখন এটি একটি স্বতন্ত্র বিষয়ে পরিণত হবে। যেটা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করতে হবে, বিশ্লেষণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করতে হবে। তারপর এই ঘটনা থেকে একটি কানুন বের করতে হবে।”

নিশ্চয়তার সাথে বলা যায়—সেই যুগের অবসান অবশ্যই ঘটেছে, যেই যুগের কোনো বিজ্ঞানী ধারণা করতে পারত—

এই প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব তার সংঘটিত ঘটনার ওপর চূড়ান্ত হয়ে গেছে। কাজেই এখন আর এতে কোনো পরিবর্তন বা বদল হতে পারবে না।

এ ব্যাপারে আসল ও বাস্তবিক কথা সে সময়েই পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে গেছে, যখন উলামায়ে কিরাম মাঠে নামেন এবং বিশেষ করে ইমাম গাজালি রহ.”-এর মতো বিদ্বৎ পণ্ডিত ও দার্শনিক এর মোকাবিলায় বলেন—

কারণ ও ঘটনার মধ্যবর্তী সম্পর্ক কেবল কল্পনামূলক সম্পর্ক থেকে মোটেও বেশি কিছু নয়। এর হুকুম-আহকাম ও নীতিমালার মাধ্যমে জ্ঞান একটি প্রাচীর তুল্য, যা এই কল্পনামূলক সম্পর্কের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই কল্পনামূলক সম্পর্কের রহস্য বা ভেদ কী?

তো এর জ্ঞান সেই মহান আল্লাহর কাছে, যিনি নিখিল বিশ্বের অণু-পরমাণু সৃষ্টি করেছেন এবং সবাইকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। আমরা দেখেছি, প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডেভিড হিউম^{১৮} কতটা স্পষ্ট করে এই বাস্তবতা তুলে ধরেছেন।

হ্যাঁ, প্রত্যেক বিবেকবান ও বাস্তববাদীই নৈমিত্তিক স্বাভাবিক ঘটিত বা অভ্যাস পরিপন্থি যেকোনো ঘটনার সংবাদ গ্রহণে একটি শর্ত রেখে দেন। তা হলো, সংবাদ প্রদানকারী পর্যন্ত পৌঁছার সংরক্ষিত কোনো ইলমি রাস্তা থাকা, যেই পথ বর্ণনা ও সূত্রের নীতিমালা; যাচাই-বাছাই এবং এর সকল চাহিদা পুরোপুরি পূরণ করতে পারে। এভাবে যে—এর দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাস ও অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হবে। এই মর্যাদা

১৮. আবু হামিদ মুহাম্মাদ আল গাজালি তুসি নিশাপুরি (৪৫০-৫০৫ হি.)। জন্ম-মৃত্যু তুস নগরীতেই। একাধারে ফকিহ। সুফি। উসুলবিদ। দার্শনিক ও মৌলিক চিন্তাবিদ। দার্শনিক হিসেবেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত ও সুশ্রীষ্ট। অধিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ও সুন্নিবাদ প্রভৃতি বিষয়ে চারশোর অধিক মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো—“তুহফুল কলামিকা”, “ইয়াহইয়াউ উলুমিনি”, “মাকসিদুল কলামিকা”। এগুলোর মধ্যে “ইয়াহইয়াউ উলুমিনি” সর্বশ্রেষ্ঠ। অনেক পণ্ডিতের মতে—যদি সকল মুসলিম চিন্তাবাদী বিলুপ্ত হয় এবং উক্ত গ্রন্থ সংরক্ষিত থাকে, তবে ইসলামের পক্ষে সে কতি সামান্য মাত্র। সুন্নিরা এ গ্রন্থকে কুরআনের পরে অন্যতম দ্বিতীয় গ্রন্থের মর্যাদা দান করেন।

১৯. ডেভিড হিউম (David Hume, 1711-1776)। স্কটিশ সংস্কারক। দর্শনের শিক্ষক। ঐতিহাসিক। অর্থনীতিবিদ। লাইব্রেরিয়ান ও প্রাবন্ধিক। বর্তমানে তিনি তার দার্শনিক অভিজ্ঞতাবাদ, সংস্কারবাদ ও প্রকৃতিবাদ সম্পর্কীয় উচ্চ মানের প্রভাবশালী মতামতের জন্য খুবই পরিচিত।



ও গুরুত্বপূর্ণ ইলমি মাপকাঠির বিস্তারিত বিবরণের জন্য দীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন, এখানে তা উল্লেখ সমীচীন নয়।

নিঃসন্দেহে আচ্ছ যে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই হুসাইন হাইকালের মতো ব্যক্তির লেখাটি পড়ে বিস্ময়ের সাথে দুঃখও বোধ করবেন। তিনি তার ‘হায়াতে মুহাম্মাদ’ গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন—

আমি আমার এই গ্রন্থে সিরাত ও হাদিসের কোনো কিতাব থেকে সহায়তা নিইনি; বরং ইলমি (বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতিতে তথ্য-উপাত্ত পরিবেশনকেই প্রাধান্য দিয়েছি।

অর্থাৎ, তিনি পাঠককে বোঝাতে চেয়েছেন, তিনি ইলমের এত কদর করেছেন এবং এত মর্যাদা দিয়েছেন যে, *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*-এর মতো প্রমাণিত বিশুদ্ধ হাদিস নেওয়ারও দরকার পড়েনি। ভাবখানা এমন যে, ইমাম বুখারি রহ. নবির হাদিস ও সাহাবায়ে কিরামের বাণী সংগ্রহ ও সংকলনে যেই অতুলনীয় ও বে-নজির ইলমি সতর্কতা অবলম্বন করে বিস্ময়কর ও আকর্ষণীয় মূলনীতি ও শর্তাবলি আরোপ করেছেন, তাদের সেসব কীর্তি যেন ইলমি তরিকাকে বিকৃত করারই নামান্তর। ইমাম বুখারি ও মুসলিমের যুগে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, অনুমান, নিরূপণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমগুলো কাজে লাগানোর কারণে ইলমের মাহাত্ম্য, মনোযোগ এবং এর পদ্ধতি ও মানদণ্ডের চাহিদা বেড়ে গেছে। সুতরাং আচ্ছকের যুগেও যদি সেগুলো গ্রহণ না করা হয়, তাহলে এটা ইলমের জন্য মারাত্মক হুমকি এবং মন্ত বড়ো বিপদ নয় কি?

আচ্ছ কীভাবে সিরাত পড়ব

এই কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট, আরব উপদ্বীপে যখন মুহাম্মাদ সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নববি সন্তার আবির্ভাব ঘটে, তখন তিনি নিজেকে গোটা মানবজাতির জন্য আচ্ছ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত নবি ও রাসূলগুপেই প্রকাশ করেন। যেন অতীতের নবি-রাসূলগণ যেই সত্য ও বাস্তবতা নিয়ে আগমন করেছিলেন, তা তিনি মানবজাতির সামনে পরিষ্কার করতে পারেন এবং বোঝাতে পারেন—পূর্ববর্তী নবির নিজ নিজ উদ্ভূত ও সম্প্রদায়ের ওপর যেই দারিদ্র্য ন্যস্ত করেছিলেন, এটি সেই আদিম কাজ। মুহাম্মাদ সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার সামনে পরিষ্কার করে দেন—তিনি নবি-রাসূলগণের সেই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ প্রেরিতজন। তিনি নিজের আরও পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, তিনিও আর সবার মতো একজন মানুষই। মানবীয় সব ধরনের বিষয়-আশয় তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। তবে



আল্লাহ তায়ালা সবার বিপরীতে তাঁর ওপর দয়া করে তাকে ওহির মাধ্যমে বিশেষ গুণে গুণাঙ্কিত ও বিশেষিত করেছেন। গোটা দুনিয়ার মানুষের কাছে আল্লাহ তায়ালায় পরগাম ও বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ও আমানত তাঁর কাঁধে অর্পণ করেছেন। যেন তারা নিজ নিজ ব্যক্তিসত্তার দ্বারা পরিচিত ও অকণত হয় এবং জানতে পারে, আল্লাহর সাত্রাজ্যের মানচিত্রে কাল ও স্থানের বিবেচনায় এই পার্শ্ব জীবন-জগতের অবস্থান বা মূল্যায়ন কতটুকু? আর মৃত্যুর পর তাদের পরিণতি কী হবে? অনুরূপভাবে সেদিকেও যেন তাদের খেয়াল ও দৃষ্টি থাকে যে, তাদের ব্যক্তিসত্তার সাথে ঐচ্ছিক কর্মকাণ্ডের মিল থাকাও জরুরি। যা থেকে কেউই পালাতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ, তাদের জন্য আবশ্যক—তারা ঈমান-ইয়াকিন এবং ঐচ্ছিক কর্মকাণ্ডে আল্লাহ তায়ালায় বান্দা ও দাসরূপেই নিজেকে প্রকাশ করবে; যেভাবে দাস ও বান্দারূপেই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন।

তারপর তিনি সার্বিকভাবে তাদের কাছে পরিষ্কার করে দেন, গোটা মানবজাতির কাছে আল্লাহ তায়ালায় বার্তা পৌঁছে দেওয়ার যেই দায়িত্ব তিনি তাঁর ওপর নাস্ত করেছেন, তাতে কমবেশি বা রদবদল করার সুযোগ বা ক্ষমতা তাঁর নেই। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালায় বাণীই তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝

সে যদি আমার নামে কোনো কথা বানিয়ে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত, তাহলে অবশ্যই আমি তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তাঁর জীবন-ধমনী। তোমাদের কেউ তাঁকে আমার থেকে বাঁচাতে পারতে না।”

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবজাতির সামনে নিজেকে রাজনৈতিক লিডার, জাতীয় নেতা, কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠাতা বা সমাজসংস্কারক হিসেবে প্রকাশ করেননি। এমনকি তার গোটা জীবনের কোনো পর্বেই এমন কোনো দিক বা দাবির প্রকাশ ঘটেনি, যা থেকে অন্তত ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তিনি এসবের কোনো কিছু অর্জন ও হাসিলের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনা করেছেন।



অন্তএব, আমাদের কাছে বিবেক ও যুক্তির দাবি, এমন ব্যক্তির জীবনী অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে আমরা তাঁর সাধারণ জীবন অধ্যয়নের সময় তাঁর সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে সামনে রাখব, যার ভিত্তিতে তিনি নিজেকে সবার সামনে তুলে ধরেছেন। যেন তাঁর সত্যবাদিতা বা বিশ্বাসবাদিতার দলিল তাঁর কথা ও বক্তব্য মাক্ফি যাচাই-বাছাই করতে পারি।

তাই আমাদের জন্য আবশ্যিক, সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে গিয়ে তার জীবনের সকল মানবিক দিক ও ব্যক্তিসত্তা অধ্যয়ন করব। তবে শর্ত থাকবে অধ্যয়ন থেকে যেন এমন কিছু মূলনীতি আমাদের অর্জিত হয়, যোগুলোর মাধ্যমে ইলমি ও অবজেক্টিভ দলিল-প্রমাণের সাথে তাঁর উদ্ভিষ্ট ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ ঘটে।

হ্যাঁ, তাঁর ব্যক্তিসত্তা সংশ্লিষ্ট নব্যত-রিসালাতের যেসব গুঢ় অর্থের দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের ইচ্ছা তিনি করেছেন, আমাদের চিন্তাশক্তি ও মস্তিষ্ককে সেগুলো উদ্বাটনে এবং সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ফিকিরে ব্যতিব্যস্ত করে রাখার কথা আসত না, যদি তাঁর বিষয়টি আমাদের শেষ পরিণতির সাথে এবং আমাদের স্বাধীনতা ও আমলি জিন্দেগির সাথে সম্পৃক্ত না হতো; কিন্তু ব্যাপারটি যেহেতু আমাদের ব্যক্তিসত্তার সাথে গভীর ঘনিষ্ঠ এবং এ থেকে ইলম, জ্ঞান ও আমলের বিবেচনায় আমাদের ওপর কিছু দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়, তাই এর জন্য আমরা যদি সামান্য চেষ্টাও না করি, তাহলে আমাদের কপালে দুর্ভাগ্য, বশ্চনা ও বরবাদিই চেপে বসবে। এমতাবস্থায় এ বিষয়কে আমাদের সত্তার সাথে যুক্ত মনে না করা বা দৃষ্টি এড়িয়ে চলে যাওয়া খুবই মারাত্মক ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।

তাঁর জীবনের উদ্ভিষ্ট সন্তাগত অংশ অধ্যয়ন বাদ দিয়ে যেই দিকগুলোর সাথে আমাদের জীবনেরও কোনো সম্পর্ক নেই এবং তিনি নিজেও তার পরিচিতি প্রদানে সেগুলো বিবেচনা করেননি, সেগুলো নিয়ে পড়ে থাকা আমাদের আহমকি, বোকামি ও পণ্ডিত্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর চেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে, এক লোক আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন—

আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ।

তারপর পরিপূর্ণ ইয়াকিন ও অকাট্য বিশ্বাসের সাথে সংবাদ দিয়ে বলছেন—



বিক্কাস সিরাহ

আল্লাহর কসম! তোমরা দিন শেষে রাতে যেমন ঘুমাও, ঠিক সেভাবে
হাল্লাত শেষে একদিন মারাও যাবে। এবং ঘুম শেষে তোমরা যেভাবে
জেগে ওঠো ঠিক সেভাবেই তোমাদের মৃত্যুর পর আবার তোমরা জীবিত
হবে। আল্লাহর কসম! তারপরের জীবনের কোনো পরিসমাপ্তি ঘটবে না।
হয়তো জাহান্নাম, নয়তো জাহান্নাম।

কিন্তু আমরা তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও তাঁর কথার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে তাঁর
তীক্ষ্ণতা, কথার মাধুর্য, বাস্তবতা, অলংকার ও সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ ইত্যাদি নিয়ে
চিন্তা-ফিকিরে লেগে গেলাম?

এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ, কেউ চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। এমতাবস্থায় আরেকজন তার
কাছে গিয়ে তার উদ্দিষ্ট গন্তব্যের পথ দেখিয়ে দিলো। পাশাপাশি বিপজ্জনক ও
ক্ষতিকর পথের ব্যাপারেও সতর্ক করল; কিন্তু এই লোক তার পথনির্দেশনার দিকে
মনোযোগ না দিয়ে তার দৈহিক আকার-আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদের রং-ডিজাইন
এবং তার কথা বলার ধরন ও ভঙ্গিমার দিকেই বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল এবং তারপর
সেগুলোর ব্যাখ্যা ও বিচার-বিশ্লেষণেই ডুবে থাকল।

বিবেক ও যুক্তির দাবি, আমরা নবিজির জীবনী থেকে তাঁর আবির্ভাব, সর্বোত্তম
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি, তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, তাঁর ধৈর্যধারণ
ও সহনশীলতা এবং সংগ্রাম ও সাধনা, লড়াই ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, শত্রু-মিত্রের
সাথে আচরণ-ব্যবহার, দুনিয়া এবং এর ভোগবিলাস ও স্বাদ গ্রহণে তাঁর অবস্থান-
সংশ্লিষ্ট জীবনের নানা দিকে চিন্তা-ফিকির করে এমনভাবে অধ্যয়ন করব, যা
সত্যতা ও তীক্ষ্ণতার ভিত্তিতে ইলমি মূলনীতির আলোকে হবে। যেই অধ্যয়নে
বর্ণনা ও বর্ণনার সূত্রধারার নির্ধারিত কায়দাকানুন ও মূলনীতি এবং শর্তাবলির প্রতি
পূর্ণ দৃষ্টি ও লক্ষ থাকবে।

এ ব্যাপারে আমার অভিমত, নিঃসন্দেহে বিবেক ও যুক্তির দাবি তো হলো—
আমরা এ সবকিছুই অধ্যয়ন করব। তবে আমাদের সকল গবেষণা, বিশ্লেষণ ও
পর্যালোচনায় শর্ত থাকবে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল ফলাফলে পৌঁছা। যেন নবিজির নব্যুত
এবং তাঁর জীবনে ওহির স্বরূপ ও বাস্তবতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগতি লাভ করা
যায়। এমনকি প্রবৃত্তির তাড়না বা গোঁড়ামির আশ্রয় না নিয়ে আমরা যখন
নিরপেক্ষভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই ফলাফলে
পৌঁছব, তখন আমাদের সামনে পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে যাবে, যেই শরিয়ত ও



সংবিধান তিনি আমাদের দিয়েছেন, তা তিনি নিজ থেকে রচনা বা উদ্ভাবন করেন, নি; বরং তা তিনি পূর্ণ আমানতদারির সাথে আজ্ঞাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর ইচ্ছা ও চাহিদা মোতাবেক আমাদের পর্যন্ত কেবল পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আর নিশ্চয়তা ও অকাট্য বিশ্বাসের সাথে এ কথা আমাদের জানা হলে অবশ্যই আমাদের বুঝে আসবে—শরিয়ত ও হুকুম-আহকামের হিকাযত এক সেগুলো বাস্তবায়নে কত দায়দায়িত্ব আমাদের ওপর চেপে আছে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নবি-জীবনের শুধু মানবিক দিকগুলোর যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে এবং তাঁর জীবনের সেই উদ্দিষ্ট দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না, সে নিজের সামনে এমন সব কঠিন-জটিল বিষয় ও ঝামেলার সমাবেশ দেখতে পাবে, যেগুলোর সমাধান বের করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে না।

উদাহরণস্বরূপ, তারা ইসলামি বিজয়গাথা দেখে পেরেশানি ও দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে যে, পারম্পরিক খুনখারাবি, সংঘাত ও সহিংসতার ব্যবহৃত সেই পুরোনো কয়েকটি তরবারিই পরে কীভাবে জাদুর মতো ইরানি সংস্কৃতির প্রাসাদের পর প্রাসাদ এবং রোমীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দাপটকে মুহূর্তেই ধূলিসাৎ করে দিয়েছে!

অনুগ্রহ তৎকালীন সময়ে আরব উপদ্বীপে সর্বপ্রথম পূর্ণতাপ্রাপ্ত সংবিধানের শাসনব্যবস্থা দেখেও তারা হতবাক হয়ে যাবে। কারণ, আরব উপদ্বীপ ঠিক ওই সময় একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান লাভ করে, যখন সে জানবিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ঝামেলায় জর্জরিত সামাজিক জীবনের চেষ্টা-প্রচেষ্টার নর্সারির ছাত্র ছিল। ইতঃপূর্বে তার বুকে প্রকৃত কোনো সভ্যতা বিকশিত হয়নি, কোনো সংস্কৃতিও তার পর্যন্ত পৌঁছনি।

ভাবা যায়—এসব কীভাবে সম্ভব হয়েছে? অথচ সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, চাক্ষুষ ও সুস্পষ্ট খিওরি হলো—কোনো জাতির মধ্যে পরিপূর্ণ সংবিধান ঠিক তখনই অস্তিত্ব লাভ করে, যখন তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পরম্পরায় চলতে চলতে সমাজে পাকাপোক্ত ও সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং তাদের সামাজিক কাঠামো ও আদর্শ উন্নতির ধাপগুলো একে একে অতিক্রম করে।

এগুলো এমনই প্যাঁচানো ও ঝামেলাপূর্ণ মন্তব্য ও অভিব্যক্তি, যেগুলোর সমাধান নবিজির নবুয়তের বিষয়ের বিবেচনা ও চিন্তা বাদ দিয়ে কেবল সাধারণ কারণ-ইস্যু



এবং ঘটনা বোঝার চার দেওয়ালে আবদ্ধ থেকে কেউই কোনোভাবেই সমাধান করতে পারবে না।

এই শ্রেণির একাধিক বিশ্লেষক চোখে পড়েছে, যারা এসব ঝামেলার নিরসন করতে গিয়ে উলটো নিষেধ চিন্তা-ফিকিরের মধ্যেই এদিক-সেদিক, ডান-বামে ফেঁসে গেছে। পরিশেষে পেরেশানি ও দুশ্চিন্তার শিকার হয়েছে। অথচ এই পেরেশানি থেকে নিষ্কৃতির পথ কিছু অতি সহজ। আমরা নবি-জীবনী অধ্যয়নে যৌক্তিক ও নিরপেক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করব এবং তার সাধারণ জীবন অধ্যয়ন করতে তাঁর ওই ব্যক্তিসত্তাকে দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু ও মেরুদণ্ড বানাব, যেই পৃথক বিবেচনায় তিনি নিজ সত্তার পরিচয় তুলে ধরেছেন। ব্যস, তাহলেই সব ঝামেলা শেষ!

এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করায় আমাদের অকাটা ও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত নবি। তাঁর নবুয়ত-রিসালাত নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার দ্বারা সেসব পেরেশানি ও ঝামেলাপূর্ণ বিষয় থেকে মুক্তির রহস্য আমাদের সামনে উন্মোচিত হবে। কারণ, তিনি যেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন, সেই মহামহিম সত্তার পূর্ণ সমর্থন তাঁর হাসিল হওয়া এবং তাঁর থেকেই তার ওপর কুরআন নাজিল হওয়া আবশ্যিক ও জরুরি। এই ধারাবাহিকতায় তাঁর প্রচারিত পূর্ণাঙ্গা সংবিধানও সেই পবিত্র সত্তা ও স্রষ্টার পক্ষ থেকেই আগত ও আনীত বলে বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যিক। বুঝতে হবে, কুরআন কোনো অক্ষরজ্ঞানহীন সম্প্রদায়ের রচিত বা লিখিত কিতাব নয়।

কাজেই এই প্রস্থের ব্যাপারে অবাক বা পেরেশান হওয়ান্ন কোনো কারণ নেই। এ কথাটিই আল্লাহ তায়ালার তাঁর কালামে পাকে বলেন—

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

তোমরা হীনমুণ্ডতায় পড়ো না এবং দুঃখ করো না। তোমরাই বিজয়ী হবে; যদি তোমরা খাঁটি মুমিন হয়ে থাকো।^১

আল্লাহ তায়ালার বলেন—



وَتُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ.

আমি চাইলাম দেশে (মিশরে) দুর্বল করে রাখা লোকদের ওপর দয়া
করতে, তাদের নেতা বানাতে এবং তাদের উত্তরাধিকার বানাতে।”

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِذْ نَسْتَفِيتُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ
الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝

স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের
কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে। তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া
দিয়ে বলেছিলেন—আমি অবশ্যই তোমাদের পরপর আগমনকারী এক
হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করব।”

তিনি আরও বলেন—

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِن
عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

আল্লাহ এমনটি করেছেন কেবল সুসংবাদ প্রদানের জন্য। এবং যেন
তোমাদের অন্তরগুলো প্রশান্তি লাভ করে। আর সাহায্য তো কেবল
আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী,
মহাপ্রজ্ঞাময়।”

এসব সুস্পষ্ট আয়াতে কারিমাকে চোখের সামনে রাখলে মুহূর্তেই সকল দ্বিধাভ্রমের
অবসান ঘটে; বরং সমাধান বেরিয়ে আসে এবং সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়।
আবার বিষয়টিও তার স্বাভাবিক গতিতে চলে যে, সেই মহাশক্তির ও
মহাপরাক্রমশালী সত্তার যেই মুমিন বান্দা তাঁর দেখানো ও নির্দেশিত পথ ও রাস্তা

২২. সূরা কাসাস, আয়াত : ৫

২৩. সূরা আনকাল, আয়াত : ৯

২৪. সূরা আনকাল, আয়াত : ১০



মজবুতি ও দৃঢ়তার সাথে ঝাঁকড়ে ধরে, তিনি তার সকল প্রয়োজন ও চাহিদা অবশ্যই পূরণ করেন। আর স্রষ্টা ও মালিক যাকে ইচ্ছা তাকে বিজয়ী ও সাহায্য করতে পারেন; বরং পেরেশানির কথা তো তখন, রাসুল যখন তাঁর দায়িত্বপালন সন্তোষে এবং মুমিন বান্দারা তাঁর নির্দেশিত পথে চলার পরও সেই পরম সন্তা তাঁর রাসুলকে দেওয়া সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এবং মুমিন বান্দাদের দেওয়া সহযোগিতার ওয়াদা মুজিজারূপে পূরণ না করবেন।

* * *





আরবকে ইসলাম উদ্ভবের উৎসভূমি বানানোর রহস্য

নবিস্ত্রির বরকতময় জন্ম জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপে*। তার গোটা জীবন এখানেই কাটে। তিনি আরবেরই কুরাইশ বংশের সন্তান।

এ পর্যায়ে তাঁর পবিত্র জীবনীর ওপর আলোচনা শুরু করা এবং পৃথিবীতে তাঁর আগমন, নবুয়ত-রিসালাত প্রাপ্তিস্থল আরব নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার আগে পৃথিবীর সকল ভূখণ্ড বাদ দিয়ে আরব ভূমিকে আল্লাহ তায়ালায় বেছে নেওয়া এবং দুনিয়ার অন্য সব সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর মোকাবিলায় আরব জাতিকে ইসলামের প্রথম পতাকাবাহী বানানোর রহস্য কী, তা জানা খুবই জরুরি মনে করছি।

২৫. আরব উপদ্বীপ : সরলীকৃত আরব (আরবি : شِبْهُ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ Shibhu L-jazīrati L-'arabiyyah, 'আরব দ্বীপ' বা আরবি : جَزِيرَةُ الْعَرَبِ Jazīratu L-'arab, 'আরব দ্বীপ'), আফ্রিকা উত্তর-পূর্ব

আরব প্লেটের ওপর অবস্থিত পশ্চিম এশিয়ার একটি উপদ্বীপ। ভূতাত্ত্বিক আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে এটি এশিয়া উপমহাদেশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

এটি পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ, ৩,২৩৭,৫০০ কি.মি. (১,২৫০,০০০ বর্গমাইল)। আরব উপদ্বীপে ইয়েমেন, ওমান, কাতার, বাহরাইন, কুয়েত, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং জর্ডান ও ইরাকের কিছু অংশ রয়েছে। ৫৬ থেকে ২৩ মিলিয়ন বছর আগে লোহিত সাগরে যাত্রা শুরু হওয়ার পর এই উপদ্বীপটি পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে লাল সাগরের সীমান্তে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পারস্য উপসাগর, উত্তরে লেভান্ট এবং ভারত মহাসাগরের সীমানা দক্ষিণ পূর্ব থেকে আরব উপদ্বীপের মধ্যমাঠে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূতাত্ত্বিক ভূমিকায় এবং আরব বিশ্বে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশাল ভান্ডারের কারণে এটির ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক যুগের আগে এটি চারটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত : হিজাজ (তিহামা), নাঈদ (আল ইয়ামামা), দক্ষিণ আরব এবং পূর্ব আরব হিজাজ এবং নাঈদ সৌদি আরবের বেশির ভাগ সদস্য। দক্ষিণ আরব ইয়েমেন এবং সৌদি আরবের কিছু অংশ (নাঈদান, জিহান, আসির) এবং ওমান গঠিত।



অবশ্য এই রহস্য খুলে বলার আগে ইসলামপূর্ব আরবদের স্বভাব-প্রকৃতি ও চারিত্রিক গুণাবলি, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি কেমন ছিল, তাও জানা জরুরি মনে করছি। পাশাপাশি তার আবাসভূমি এবং সেই ভূখণ্ডের আশপাশের অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান কী, তাও জানা আবশ্যিক। তা ছাড়া আরব উপদ্বীপের পার্শ্ববর্তী এলাকার জাতিগোষ্ঠী যেমন : ইরান, রোম ও হিন্দুস্থান প্রকৃতি ভূখণ্ডের বসবাসরত সম্প্রদায়ের স্বভাব-প্রকৃতি, চালচলন, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার এবং ধর্মীয় রীতিনীতি কেমন ছিল, সে সম্পর্কেও ধারণা থাকা অপরিহার্য।

প্রথমে পার্শ্ববর্তী এলাকার জাতিগোষ্ঠীর আলোচনা দিয়ে শুরু করা হচ্ছে; যাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ইসলামি সভ্যতার উত্থানের কিছু আগপর্যন্ত নিজ নিজ অঞ্চলে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তৎসময়ের প্রধান দুটি সাম্রাজ্য

তৎসময়ের গোটা পৃথিবীতে প্রধানত দুটি সাম্রাজ্যের উত্থান ছিল। সুসভ্য ও উন্নত সংস্কৃতির ধারক-বাহক বলতে তাদেরই বোঝাত। একটি অগ্নিপূজারি পারস্য সাম্রাজ্য, দ্বিতীয়টি ইস্রায়েল ধর্মাবলম্বী রোম সাম্রাজ্য। এদের পরের স্তরে ছিল তুলনামূলক অনালোচিত ইউনান বা খ্রিস্ট ও হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষ।

২৬. পারস্য ইরানের প্রাচীন নাম। ১১৩৫ সাল পর্যন্তও বহির্বিধে ইরান 'পারস্য' নামে পরিচিত ছিল, যদিও ইরানিয়া বহু যুগ ধরে নিজেদের দেশকে ইরান নামেই ডেকে এসেছে।

অর্ধজাতির বিভিন্ন পোত্র খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের দিকে ইরানীয় মালভূমিতে বসতি স্থাপন করে। এদের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে পুরতপূর্ণ ছিল মেদেস ও পারসিক গোত্রবর্ষ। পারসিকদের প্রথম বড়ো নেতার নাম ছিল হাখমানেশ; এক সুস্বাচ্ছন্দ সেনাপতি। হাখ'মানেশ ৬৮১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নগাদ জীবিত ছিলেন। ৫৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে কুরোশ পারসিকদের রাজা হন। কুরোশ মেদেসীয় বা মেদীয়দের পরাজিত করেন, ৫৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নগাদ সিংহাসন আরোহণ করেন।

কুলত কুরোশের অধীনেই পারস্য এশিয়ার অন্যতম মহাশক্তিতে বা সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। কুরোশের পুত্র ২য় কামবুজিয়েহ ৫২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মিশর বিজয় করে পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। ৫২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে স্রাট ১ম দরিয়ুশ কামবাজের অঙ্গার পর শিশু নব পর্বত পারস্যের পূর্ব সীমানা প্রসারিত করেন। ৬০২ সালে বাইজেন্টীয় সাম্রাজ্যের সাথে তাদের এক দীর্ঘ যুদ্ধ শুরু হয়। ৬১৯ সাল নাগাদ তারা এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ এবং মিশর দখল করতে সক্ষম হয়; কিন্তু বাইজেন্টীয় স্রাট হেরাক্লিউস এসে তার গতিরোধ করেন এবং ৬২২ থেকে ৬২৭ সালের মধ্যেই পারসিকেরা তাদের পুরোনো সীমান্তে ফেরত যেতে বাধ্য হয়। এক এরপর সর্বশেষ মুসলিমদের কাছে পরাজিত হওয়ার মাধ্যমে পারস্যশক্তির কিল্বিষ্ট ঘটে।

২৭. রোমান সাম্রাজ্য (লাতিন : Imperium Rōmānum) প্রাচীন রোমান সভ্যতার একটি অংশ। রোমান সাম্রাজ্যের শাসনাধীন অঞ্চলসমূহ ভূমধ্যসাগরের চারিদিকে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ১০০-৪০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রোম পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম নগরী ছিল, এবং রোমান সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা ৫০-৯০ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছিল; যা তৎকালীন পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ২০% ছিল। রোমান সাম্রাজ্য অর্থনৈতিক,



ইরান : ইরানের পারস্য সাম্রাজ্য সে সময় পারম্পরিক সংঘাত, বিভিন্ন দর্শন মিশ্রিত ধর্মীয় মতবাদের নিশানাম্বল হয়ে ছিল। সেগুলোর মধ্যে একটি জরথুষ্ট্রবাদ। এটি ছিল পারস্য সম্রাট ও শাসকদের ধর্ম। এই ধর্মের দর্শন মোতাবেক (নাউজুবুদ্দাহ) নিজের মা, মেয়ে, বোনকে বিয়ে করা সম্মান ও মর্যাদার বিষয় বলে মনে করা হতো। এমনকি ইসায়া পঞ্চম শতাব্দীর শাসক সম্রাট দ্বিতীয় ইয়াজদিগার্দ তার আপন মেয়েকে বিয়ে করে। এ ছাড়াও আরও বহু ও অসংখ্য কুকীর্তি ও নিকৃষ্ট চরিত্রের কাণ্ড এখানে প্রচলিত ছিল যেগুলো সবিস্তারে বর্ণনার সুযোগ এখানে নেই।

এই অঞ্চলে দ্বিতীয় ধর্ম ছিল মুজাকিয়া। ইমাম শাহরাস্তানি রহ. বলেন—

এই ধর্মে ‘দোসর’ দর্শন ছিল। এর ব্যাখ্যা হলো—এই দর্শন অনুযায়ী নারী এবং অন্যান্য মালিকানাধীন সহায়সম্পত্তিতে পরম্পরের এমন সমানাধিকার ও শরিকানা ছিল, যেমনই প্রাকৃতিক আগুন-পানি-বাতাস ও চারণভূমিতে একজন আরেকজনের অংশীদার ও হকদার থাকে। এই

সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে সেই সময়কার সব থেকে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যসমূহের অন্যতম ছিল। এটি ছিল প্রাচীনকালের এক পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যসমূহের একটি।

রোমান প্রজাতন্ত্র প্রায় ১৪০০ বছর ধরে টিকে ছিল। এর প্রথম দুই শতক রাজনৈতিক সুখরতা এবং সমৃদ্ধির কারণে এদের ‘রোমান শক্তি’র যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

২৮. **গ্রিস** (গ্রিক : Ελλάδα এলাদা বা Ελλάς এলাস) ইউরোপ মধ্যদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের একটি রাষ্ট্র— বা কনকান উপদ্বীপের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এর সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে উত্তরে বুলগেরিয়া, উত্তর মেনিডোনিয়া ও আলবেনিয়া; পূর্বে তুরস্ক। গ্রিসের মূল ভূমির পূর্বে ও দক্ষিণে এজিয়ান সাগর অবস্থিত, আর পশ্চিমে রয়েছে আইওনিয়ান সাগর। পূর্ব ভূমধ্যসাগরের উত্তর অংশে গ্রিসের অনেকগুলো দ্বীপ রয়েছে। গ্রিস ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মিলন স্থলে অবস্থিত। বর্তমান গ্রিকদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে একসময়ের পৃথিবী বিজয়ী প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য এবং প্রায় চার শতাব্দীর অটোমান সাম্রাজ্য। এই দেশ পশ্চিমা বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের সূতিকাগার এবং পণতন্ত্রের জন্মদাতক স্থান হিসেবে সুপরিচিত।

বর্তমানে গ্রিস একটি উন্নত দেশ এবং ১৯৮১ সাল থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য। এ ছাড়া এটি ২০০১ সাল থেকে ইকোনমিক অ্যান্ড মনিটারি ইউনিয়ন অব দ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ১৯৫১ সাল থেকে ন্যাটো এবং ১৯৬০ সাল থেকে ওইসিডি-এর সদস্য হিসেবে আছে।

২৯. **ইরাজদিগার্দ** (ফারসি : یزدگرد) (ইরাজদিগার্দ শব্দের অর্থ ‘দেবতার সৃষ্টি’) ছিলেন পারস্যের সাসানি সাম্রাজ্যের অটোরিশ ও শেষ জরথুষ্ট্রীয় সম্রাট (ইরানের সর্বশেষ সম্রাট হচ্ছেন মুহাম্মাদ রেজা শাহ পাহলাভি)।

ইরাজদিগার্দ দ্বিতীয়। সম্রাট বাহরামজোয়ের ছেলে। উপাধি—বাহরাম নরম ও বাহরাম সিপাহ। শাসনকাল ৪৩৮-৪৫৭ খ্রিষ্টাব্দ। তার সময়ে সাম্রাজ্য ছিল বড়ো বড়ো সম্রাট, অশ্বিনতা, অর্জুন্য ও নৈরাজোর নিকার। এ সময়ে আর্মেনিয়ার খ্রিষ্টানদের সাথে সাসানিদের কুখ হয়। খ্রিষ্টানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। কানকুকে করের হাজার খ্রিষ্টান সৈন্য জবাই করা হয়।

৩০. আব্দুল কাতাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল করিম শাহরাস্তানি (৪৭৯-৫৪৮ হি.)। বর্তমান আফগানিস্তানের অভ্যন্তর অতীতের পুরানো শাহরাস্তানে জন্ম। এবং এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একাধারে ধর্মতত্ত্ববিদ। দার্শনিক। কবি। প্রতিষ্ঠিত লেখক। তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘জাল মিলাল ওয়ান নিহাল’।



কিকহস সিরাহ

ধর্মটি প্রবৃদ্ধিপ্রসারি ও বোনোম্মাদদের খুবই পছন্দ হয়। তারা একে সানন্দে গ্রহণ করে।”

রোম : রোমের মাথায় সে সময় ঔপনিবেশিক ভূত চেপে বসেছিল। এর একদিকে অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় মতানৈক্যের ঘনঘটা বাজছিল, আরেক দিকে শাম ও মিশরের ইসায়ীদের বিরোধিতা ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল দাঁউদাঁউ করে। এই সাম্রাজ্য তখন সীমাহীন মনোবৃত্তি, নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ এবং টার্গেট অনুযায়ী ব্রিটিশবাদ প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে নিজের সামরিক শক্তি ও ঔপনিবেশিক খান্ধার ওপর নির্ভর করছিল।

এই সাম্রাজ্যও চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক বস্তুতা ও নষ্টামিতে কোনো দিক দিয়ে ইরানের চেয়ে কম ছিল না। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও আরোপিত কর ও ট্যাক্সের কারণে প্রজা ও জনগণ অর্থনৈতিক জুলুম ও অধঃপতনের শিকার ছিল।

ইউনান (জিল) : এই ভূখণ্ড তখন দার্শনিক অনর্থক কথাবার্তা ও তর্কের খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যেই ডুবে ছিল। যা দ্বারা না হচ্ছিল মানুষের কোনো উন্নতি-অগ্রগতি, আর ছিল না কারও কোনো উপকার লাভের ক্ষীণ আশা।

হিন্দুস্থান (ভারতবর্ষ) : হিন্দুস্থান সম্পর্কে বলার মত যতটুকু আছে, তা আল্লামা আবুল হাসান আলি নদভি রহ. (১৯১৪-১৯৯৯ ইসায়ি)-এর ভাবায় নিম্নরূপ—

হিন্দুস্তানের ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য রয়েছে, ইসায়ি ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে এই সাম্রাজ্য ধর্মীয়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি দিক থেকে অবনতি ও অধঃপতনের শিকার ছিল। এবং পার্শ্ববর্তী ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে সামাজিক, চারিত্রিক যেই অধঃপতন ছিল, হিন্দুস্তানেও তার কোনো কমতি বা ঘটতি ছিল না।”

এখানে এ-ও ছেনে রাখা উচিত, ইতিহাসে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় প্রাপ্ত দুর্ভাগ্য, দুর্ভাবনা ও পথ না পাওয়ার মাঝে অভিন্ন কারণ ও বুনিয়াদি হেতু ছিল

৩১. আল মিলাল ওয়ান নিহাল, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৬-৮৭

৩২. সাইয়েদ আবুল হাসান আলি হাসানি নাদাবি। রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাসিহা হাসান রা.-এর অমৃতন কংশধর। ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলিতে তার জন্ম ও মৃত্যু। তিনি দারুল উলুম নদওয়ার ছাত্র ও রেটর ছিলেন। একজন শিক্ষক লেখক। ঐতিহাসিক। গবেষক। ইসলামি চিন্তাবিদ। দারি ও সুফি। তার সবগুলো বই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার ‘মা জা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমিন’ গ্রন্থটি আরব জাহানে সূচ্যুতি অর্জন করেছে।

৩৩. মানবেতিহাসে মুসলিম জাতির উত্থানের ফল : ২৮



তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি-কালচার। এই সভ্যতা ও কৃষ্টি-কালচারের ভিত্তি ছিল শুধুই জাগতিক বস্তুর মূল্যায়নের ওপর। এই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত করার মতো উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কোনো আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিল না। যাতে তারা বস্তুকে ছুড়ে ফেলে সেই আদর্শে আদর্শবান হতে পারে, অথবা সেই সত্তার অনুকরণ করতে পারে।

এর কারণ, সাংস্কৃতিক উপাদান ও দৃষ্টমান বস্তুসামগ্রী পৃথিবীতে চলার জন্য শুধু ওসিলা ও কারণ হয়ে থাকে। তাই কোনো জাতি ও সম্প্রদায় যদি কিশু চিন্তা ও সর্বোচ্চ আদর্শ থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে সংস্কৃতিই তাদের দুর্ভাগ্য ও দুর্ভাবনার গভীর গর্ত ও খাদে ফেলে দেওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে সেই জাতিই যদি ধর্মীয় সঠিক অনুশাসন এবং আল্লাহ তায়ালার ওহির দ্বারাই অর্জিত সুস্থ বিবেকের সর্বোচ্চ মানদণ্ড বহন করতে পারে, তাহলে সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল্যায়ন পূর্ণাঙ্গা সফলতা ও সৌভাগ্যের বিভিন্ন প্রকার ও প্রকাশস্থলে পৌঁছানোর অতি উত্তম ও সহজ উপায়ে পরিণত হয়। আর তৎকালীন সময়ে এই সঠিক ধর্ম ও সুস্থ বিবেকই ছিল অস্তিত্বহীন।

জাঙ্গিরাফুল আরব : এই ভূখণ্ড তখন উপর্যুক্ত অঞ্চলগুলোর সার্বিক পরিস্থিতির বিবেচনার পুরোপুরি সুস্থির ও শান্তিপূর্ণ ছিল। অন্যান্য অঞ্চলের দুর্ভাবনা ও দুর্বিপাক থেকে দূরে বরং একেবারে পৃথক মেয়ূত্রে ছিল। এখানকার বাসিন্দারা ইরানিদের মতো (ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে) অসভ্যতা ও নিকটতা এবং তাদের আরেশি ও বিলাসী জীবনের মতো জীবনযাপন করত না। ফলে তারাও তাদের মতো অল্পীলতা ও বেহায়াপনা করত না এবং অবাধ যৌনতা ও চারিত্রিক অধঃপতনের দর্শনকে ধর্মের রূপ দেখেনি।

অনুরূপ রোমকদের মতো শক্তি-সামর্থ্যও তাদের ছিল না; যা দিয়ে তারা আশপাশের ও পার্শ্ববর্তী সব এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। তাদের কাছে ছিল না গ্রিক দর্শন ও যুক্তিতর্কও; যার আলোকে তারা অনর্থক কথাবার্তা ও রূপকথার অনিষ্ট ও মন্দভুক্তকে নিজেদের অভ্যাস বানাতে পারে।

তাদের স্বভাব-প্রকৃতি ছিল একেবারে কাঁচা পদার্থের মতো; যাকে এখনও কোনো ফর্মায় ঢালা হয়নি। তাদের স্বভাব-চরিত্রে একেবারে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ মানবিক স্বভাব পরিলক্ষিত হতো এবং উচ্চ পর্যায়ের মানবিক গুণ, যেমন—বিশ্বাস, সহমর্মিতা, বদান্যতা ও দানশীলতা, আত্মসম্মানবোধ, চারিত্রিক স্বচ্ছতা ও



পবিত্রতা ইত্যাদির প্রতি তাদের স্বভাবগত ঝোঁক ছিল; কিন্তু তাদের কাছে সেই জ্ঞান ও পথনির্দেশনা ছিল না—যা তাদের গন্তব্যে পৌঁছার রাস্তা পরিষ্কার দেখিয়ে দিতে পারে।

এরা স্পষ্ট অজ্ঞতা ও আদিম স্বভাব-প্রকৃতির জীবনযাপন করছিল। এ কারণেই তারা সর্বোচ্চ মানবিক মূল্যায়ন পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা হারিয়ে ফেলে।

যে কারণে এরা নিজ বংশীয় মর্যাদা এবং নিজের ব্যক্তিগত সম্মান ও অবস্থান বজায় রাখতে আপন সদ্য ভূমিষ্ঠ কন্যাসন্তানকে পর্যন্ত জীবন্ত পুঁতে ফেলত। বদান্যতা ও দানশীলতার আশ্রয়-উদ্দীপনায় নিজের প্রয়োজনীয় ও জরুরি সহায়সঙ্ঘলও খুঁয়ে দিত এবং নিজের ইমেজ ও আত্মসম্মানবোধ এবং গোত্রীয় সহযোগিতা-মিত্রতা চুক্তি অটুট রাখতে পরস্পরের মধ্যে দিনের পর দিন খুনখারাবি লাগিয়েই রাখত।

এই দুটি অবস্থাকেই আল্লাহ তায়াল্লা তাদের পথ হারানো ও পথভ্রষ্টতা বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং এ প্রসঙ্গেই তিনি বলেন—

وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ ۝

আর ইতঃপূর্বে তো তোমরা ছিলে পথহারী।”

এই অবস্থাকে যদি অন্যান্য জাতির সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার থেকে দূরে থাকার কারণে আরবজাতিকে অপারাগ ও নিরুপায় মনে হবে। সেসব সম্প্রদায় উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচারের আলো পাওয়া সম্ভেও বিকৃতি ও গোমরাহিতে নিমজ্জিত ছিল। তারা যেন বোধ ও অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তা-ফিকির ও পরিকল্পনা-গ্রহণ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নষ্টামির জালে আটকে ছিল।

আল্লামা মুহাম্মাদ আল মুবারক রহ.” লেখেন—

যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আজকের যুগেও পর্যালোচনা করে দেখতে পারে—আরব উপদ্বীপ কীভাবে দুটি সভ্যতার মাঝ বরাবর অবস্থিত। একদিকে বহুনির্ভর পশ্চিমা সভ্যতা—যা মানুষের মনুষ্যত্বের একটি বাস্তববিরোধী ত্রুটিপূর্ণ চিত্র পেশ করে; অপরদিকে আছে কাল্পনিক ও

৩৪. সূরা বাকারা, আয়াত : ১১৮

৩৫. আল্লামা মুহাম্মাদ মুবারক (১৯১২-১৯৮১)। জন্ম দিমাশ্বেক, ইনতিকাল মদিনায়। আরবি ভাষা ও অঙ্কশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা অর্জন করেন। আদিব (আরবি ভাষার খ্যাতিমান সাহিত্যিক) হিঁসবে তিনি এমিস।



আধ্যাত্মিক সভ্যতা—যা ভরতবর্ষ, চীন এবং এগুলোর আশপাশের
সভ্যতার মতোই।”

ইসলামপূর্ব আরব অধিবাসী এবং তার পার্শ্ববর্তী জাতিগোষ্ঠীর চিত্র তুলে ধরলেই
আরবভূমিকে নবজ্বির জন্ম ও তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তিস্থলের মর্যাদায় ভূষিতকরণে আল্লাহ
তায়ালার হিকমতের ইচ্ছা ও দাবি কী ছিল, তা খুব সহজেই বুঝে আসবে। সাথে
জানা যাবে, কেন আরবজাতিকেই গোটা দুনিয়ায় ইসলামি দাওয়াতের প্রথম
পতাকাবাহী বানানো হয়েছে; যার ফলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত
এক বিশাল ও বৃহৎ মানবগোষ্ঠী আল্লাহ তায়ালারই ইবাদতে মগ্নগুল।

কারণ কারণ ধারণা, আল্লাহ তায়ালার হিকমত ছিল বাস্তব ধর্ম ও পচা সংস্কৃতি
লালনকারী জাতির চিকিৎসা এবং তাদের হিদায়াত করা বড়ো কঠিন ও কষ্টকর।
কারণ, তাদের সমাজে প্রচলিত নষ্টামি ও বিকৃতিগুলো গর্ব ও অহংকারের বিষয় হয়ে
থাকে। এর কারণ, তারা সেগুলোকে ভালো মনে করে। বিপরীতে যারা এখনও
সভ্যতা-সংস্কৃতিতে মানুষের কাছে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হওয়ার মতো স্তর
অতিক্রম করেনি এবং তারা নিজেদের অজ্ঞতাও স্বীকার করে আবার নিজেদের জ্ঞান-
গরিমা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির দাবিদারও নয়, তারা নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতির সমাধান
করতে এবং হিদায়াত লাভ করতে বেশি আগ্রহী ও উদ্বীণ থাকে। (ঠিক এ কারণেই
আরব উপদ্বীপকে বেছে নেওয়া হয়েছে।)

কিন্তু এই ধারণা কতটুকু ঠিক? বরং সঠিক উত্তর হলো—আল্লাহ তায়ালার হিকমত
কখনো এমন ছিলই না। এ ধরনের ব্যাখ্যা ও কারণ বর্ণনা তাদের ব্যাপারে করা যায়,
যাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা সীমিত এবং শক্তি-সামর্থ্য সাধারণ এবং তারা সহজ-
কঠিনের মধ্যে পার্থক্য করে নিজেদের আরাম-আয়েশের দিক বিবেচনা করে
সহজটিকে বেছে নেওয়ার যোগ্য ও উপযুক্ত হয়। আর ঝামেলা মনে করে কঠিনকে
ছেড়ে দেয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

যদি প্রশ্ন করা হয় ইরান, রোম বা হিন্দুস্তানের মাটিতে আল্লাহ তায়ালার কেন
ইসলামের আবির্ভাব ঘটালেন না এবং যেভাবে তিনি আরব ভূমিকে ইসলামি
দাওয়াতের সফলতার স্থান বানাতে প্রয়োজনীয় ব্যাক্থা করেছেন, তেমনি এসবের



কোনোটিকে কেন করলেন না? অথচ এ কাজ তার পক্ষে মোটেও কঠিন ছিল না। কারণ, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই প্রতিটি উপায়-উপকরণের অস্তিত্ব দানকারী।

এর উত্তর—এ কাজও ঠিক সেই হিকমত ও রহস্যেরই অংশ, যেই রহস্য বলে তিনি তার প্রিয়নবিকে নিরক্ষর ও অক্ষর জ্ঞানহীন রেখেছেন। তাঁর নবিকে তিনি দুনিয়ার কোনো কিতাব পড়তে দেননি এবং কোনো অক্ষরও তাঁর হাত দিয়ে লেখাননি। যেমন : এর কারণ তিনি নিজেই বলেছেন—

إِذَا لَا زُنَابَ الْمُبْتَطِلُونَ ۝

নইলে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করত।”

অর্থাৎ তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে যেন কারও কোনো সন্দেহ না থাকে এবং তাঁর দাওয়াতের সত্যতায় কারও কোনো দ্বিধা ও সংশয়ের অবকাশ না থাকে।

এই হিকমতের শেষ কথা বা সারাংশ হলো—তাঁর আগমনের পরিবেশ-প্রকৃতিও যেন তাঁর মতো আশপাশের জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় উন্মি হয়। অর্থাৎ, আশপাশের কোনো সংস্কৃতির প্রভাব যেন সেখানে না থাকে। এতে করে তাদের চৈতন্য মাপকাঠি ও মানদণ্ড আশপাশের বাতিল দর্শনের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকবে।

যেমন : মানুষের মনে সন্দেহের উদয় হতো, যদি তারা দেখত—তিনি লিখতে জ্ঞানেন, পূর্ববর্তী কিতাবের জ্ঞান তাঁর আছে, প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত এবং আশপাশের কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে জ্ঞানশোনা আছে। ঠিক তেমনি তাদের মনে সন্দেহ জাগত যদি দেখত—ইসলামি দাওয়াত প্রচারিত হচ্ছে এমন সম্প্রদায় থেকে, যারা কৃষ্টি-কালচার, দর্শন-ইতিহাস ইত্যাদির মোটামুটি একটি পর্যায়ে আছে। ইরান, রোম ও খ্রিস্টের অবস্থা যেমন ছিল আরকি। এমতাবস্থায় যেকোনো ফিতনাবাজ মিথ্যাকের জন্য এই ধারণার সুযোগ থাকত যে, এ তো সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ও দার্শনিক চিন্তা-ফিকিরের প্রদর্শন। যার সূত্র ধরেই এই বেনজির সভ্যতা-সংস্কৃতি ও পূর্ণাঙ্গা শরিয়তের জন্ম হয়েছে। কাজেই এটা আহামরি কোনো কিছু নয়।



هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَنِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

তিনি ওই সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মাঝে তাদের থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যেই রাসূল তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করে শোনান, তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতঃপূর্বে তারা অবশ্যই স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় ছিল।”

আব্বাহ তায়াল্লার ইচ্ছার দাবি ছিল, তাঁর নবি এবং নবির জাতিও যেন উম্মি হয়। যাতে করে নবুয়্যতের মুজিবা এবং ইসলামি শরিয়ত মন-মস্তিষ্কে পুরোপুরি স্পষ্টরূপে বসে যায়। ফলে এই দাওয়াত এবং জাগতিক অন্যান্য দাওয়াতের মাঝে কোনো সাদৃশ্য বা মিল না থাকে। এসব থেকে প্রমাণিত হয়, এটা বান্দাদের প্রতি আব্বাহ তায়াল্লার সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহেরই ফল।

আরব উপদ্বীপকে ইসলামের মারকাজ ও প্রাশকেন্দ্র বানানোর আরও কিছু হিকমত ও রহস্য আছে, যেগুলো মুহাব্বিক গবেষক ও বিশ্লেষকদের কাছে স্পষ্ট ও পরিষ্কার। সেগুলো সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হলো—

এক.

এ কথা সবার জানা, আব্বাহ তায়াল্লা মসজিদে হারামকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন। ইবাদত ও ধর্মীয় কাজকর্ম পালনের লক্ষ্যে এটিই পৃথিবীর বৃক প্রথম নির্মিত ঘর। মক্কার এই উপত্যকা থেকেই অসংখ্য নবি-রাসুলের আদি পিতা ইবরাহিম আ.-এর দাওয়াত প্রচার হয়েছে। ফলে এর আবশ্যকীয় দাবি ও চাহিদা ছিল—মিল্লাতে ইবরাহিমির আকৃতিতেই ইসলামের কেন্দ্র ও সেন্টার এই পৃথ্য ও বরকতময় ভূমিতেই সর্বশেষ নবি ও রাসুলের আবির্ভাব হোক। আর এটা কীভাবে না হয়ে পারে, যেখানে তিনি তাঁরই ঔরসজাত অখন্তন সন্তান!

দুই.

আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানও এমন গুরুত্বপূর্ণ, দাওয়াত প্রচারের ভারী বোঝা বইতে পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। কারণ, এই ভূখণ্ড আশপাশের বিভিন্ন জাতি ও



গোষ্ঠীর একেবারে মধ্যমণি। এ কারণেই এখানে উদ্ভিত ইসলামি দাওয়াতের কিরণ দিগ্বিদিক সকল জাতির কাছে এবং প্রতিটি রাজ্য ও এলাকায় অতি সহজেই পৌঁছে যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগ এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের সময়কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এর শতভাগ সত্যতা প্রমাণিত হয়।

তিন.

আল্লাহ তায়ালার হুকুমত এ-ও ছিল, আরবি ভাষাই যেন ইসলাম প্রচার-প্রসারের ভাষা হয়। এই আরবিভাষাই যেন কুরআনে কারিমের প্রথম সারির মুখপাত্রদের এবং আমাদের পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম হয়।

পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষাগুলোর বৈশিষ্ট্য নিয়ে যদি পর্যালোচনা করা হয় এবং একটির সাথে অন্যটির তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে—আরবি ভাষার এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, যেগুলো অন্য কোনো ভাষায় নেই। ঠিক এ কারণেই এই ভাষারই অধিকার ও হক ছিল, সেটিই হবে বিভিন্ন এলাকা ও অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও মুসলিমদের দীনচর্চার প্রথম বাকরীতি।

* * *





নবিজির দাওয়াতের সাথে পূর্ববর্তী দাওয়াতের মিল-অমিল

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে কোনো নবি প্রেরিত না হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ একমত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবি হওয়ার বিশ্বাসটি ‘জবুরাতুত দ্বীন’-এর (অবশ্যাপালনীয় ধর্মীয় বিষয়াদি) অন্তর্ভুক্ত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবিদের মাঝে দৃষ্টান্তটা এ রকম যে, এক ব্যক্তি খুব চমৎকার করে একটা ভবন বানিয়েছে; কিন্তু কোনো এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিয়েছে। মানুষ যখন তাতে ঘুরতে আসে, তখন ভবনের চমৎকারত্ব দেখে আশ্চর্য প্রকাশ করে। আর তারা (পরস্পরে) বলাবলি করে—এই যে, এখানে ইটটা কেন বসানো হলো না?

আমি হলাম সেই ইট, আমি সর্বশেষ নবি। (অর্থাৎ আমার মাধ্যমে নবুয়তের সমাপ্তি। আমাকে প্রেরণের মধ্য দিয়ে নবুয়তের ধারাবাহিকতা পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে।)“

নবিজির দাওয়াতের মূল প্রকৃতি কী? পূর্ববর্তী নবিদের দাওয়াতের সাথে তাঁর দাওয়াতের মিল কেমন? এসব বিষয় আমরা স্পষ্টভাবে এ হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম। অর্থাৎ তাঁর এই দাওয়াতি মিশন পূর্ববর্তী নবিদের দাওয়াতি মিশনের



পূর্ণাঙ্গতা বহন করে; এবং একে আরও সমৃদ্ধ করে। বিষয়টা একটু স্পষ্ট করি।
প্রত্যেক নবির দাওয়াতই দুটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত—

✓ ১. আকিদা (বিশ্বাস)

✓ ২. তাশরি' ও আখলাখ (প্রণীত বিধান ও নৈতিকতার শিক্ষা)

আকিদার ব্যাপারটা অপরিবর্তনশীল। আদম আ. থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবিই একই রকম আকিদা লালন করার প্রতি মানুষকে আহ্বান করেছেন। সেই আকায়িদ বা বিশ্বাসগুলো কী কী? আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস, আল্লাহর উপযোগী নয়—এমন সব গুণাবলি থেকে তাঁকে উর্ধ্ব রাখার বিশ্বাস, আশিরাতের হিসাব ও জাহ্নাত-জাহান্নামের বিশ্বাস। প্রত্যেক নবিই তাঁর জাতিতে এই মৌলিক বিশ্বাসগুলো লালনের দাওয়াত দিতেন। প্রত্যেক নবি তাঁর পূর্ববর্তী নবির (আকিদার) দাওয়াতকে স্বীকৃতি দিতেন এবং পরবর্তী নবির সুসংবাদ দিতেন।

নবি-রাসূলগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতিতে প্রেরিত হলেও সবাই একই ধরনের মৌলিক কিছু বিশ্বাস লালনে মানুষকে আহ্বান করেছেন। এসব বিশ্বাস মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসার ও এসবের প্রতি মানুষজনকে ডাকা ছিল তাঁদের দায়িত্ব।

আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারটা কুরআনে কারিমে স্পষ্ট করেছেন—

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ؕ

তিনি তোমাদের জন্য ধর্মের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মুসা ও ইসাকে এই মর্মে যে, তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।”

আকিদার বিষয়ে নবিদের দাওয়াতের ভিন্নতার কথা ভাবাই যায় না। কারণ, আকিদাসংক্রান্ত বিষয়াবলি একটা ‘ইখবারের’ (সংবাদ) সমষ্টি। সকল নবি একই সংবাদ দিয়েছেন। এখন মনে করেন, দুজন একই বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিলো।



আর আপনাদের দাবি—তারা দুজনই সত্যবাদী। তাহলে এখানে আপনাদের দাবি বাস্তব হতে হলে দুজনের সংবাদের মাঝে বৈপরীত্য থাকতে পারবে না। একই হতে হবে। এখানেও ব্যাপারটা এমনই।

সুতরাং এটা অসম্ভব যে, এক নবিকে ‘আল্লাহ তায়ালা তিনের একজন’ (খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস)—এই দাওয়াত দিয়ে প্রেরণ করা হবে। তাঁর পরে আরেক নবিকে ‘আল্লাহ তায়ালা এক, তাঁর কোনো শরিক নেই’—এ দাওয়াত দিয়ে পাঠানো হবে। যেহেতু তাঁরা দুজনই একই বিষয়ে অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালায় ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছেন।

এ তো গেল আকিদা সম্পর্কে কথা। আর ‘তাশরি’; এটা ব্যক্তিগত, সামাজিক জীবনবোধ। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনব্যবস্থা। স্থান-কাল-পাত্রভেদে এটা ভিন্ন হতে পারে। এক নবির তাশরিয়ের সাথে আরেক নবির তাশরি মিলবে না। কারণ, তাশরিয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে ইনশা (সৃজনশীল); ইখবার নয়। কাল ও জ্ঞাতিভেদে তাশরিয়ের রূপ-রঙে ভিন্নতা আসতে পারে। কারণ, তাশরিয়ের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে উভয় জগতে মানুষের কল্যাণসাধন। সুতরাং সেই কল্যাণের খাতিরে স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর প্রণীত রূপ ভিন্ন হতে পারে।

এজন্য আমরা দেখি—পূর্ববর্তী নবিদের দাওয়াতের গতি ছিল সীমাবদ্ধ। তাঁদের দাওয়াতি মিশন ছিল নির্দিষ্ট একটা পরিমণ্ডলজুড়ে। এতে ব্যাপকতা ছিল না। ফলত ওই নির্দিষ্ট জাতি ও পরিমণ্ডলের সাথে সংগতিপূর্ণ করে তাঁদের তাশরি ব্যাপারটা হতো।

বনি ইসরাইলের কথা ধরি, তাদের স্বভাব-প্রকৃতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের শরিয়ত কঠিন হওয়াটাই কাম্য ছিল। সেজন্য তাদের শরিয়ত ছিল কঠিন প্রকৃতির। ঈসা আ. যে সময় এসেছিলেন, সে সময়ের প্রেক্ষাপটে তাঁর শরিয়ত সহজ হওয়া কাম্য ছিল। তাই ঈসা আ.—এর শরিয়ত মুসা আ.—এর শরিয়ত থেকে অনেকটা সহজ ছিল। কুরআনের বর্ণনায় ঈসা আ.—এর ভাষায় এ সহজতার রূপটা দেখুন—

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأَجَلٍ لَّكُمْ بَعْضَ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ^৫



আর এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে, যেমন—তাওরাত। আর তা এজন্য, যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দিই কোনো কোনো কস্তু, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল।”

এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে, তাওরাতে আকিদাসংক্রান্ত যতসব বিষয় রয়েছে, এর সবগুলোইকেই ঈসা আ.-এর শরিয়ত স্বীকৃতি দেয়। শুধু স্বীকৃতিই নয়; বরং ওইসব আকিদা-বিশ্বাসকে তা আরও পরিপুষ্ট করে এবং এতে নতুন জাগরণ তৈরি করে।

কিন্তু তাশরি বিষয়ে—হালাল-হারামের ব্যাপারে—এর রূপ ভিন্ন। এখানে অনেকটাই সহজ করা হয়েছে। অনেক কঠোর বিধান পরিবর্তন করে সহজ করা হয়েছে।

এ থেকে থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, প্রত্যেক নবিকে ‘আকিদা ও তাশরি’—এ দুটি বিষয়ের সমন্বয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আকিদার বিষয়ে এক নবি আরেক নবিকে সমর্থন করেন। একজন নবিকে তাঁর পূর্ববর্তী নবি যেসব আকিদার দাওয়াত দিতেন, সেগুলোতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়া আরও দৃঢ়তার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রত্যেক নতুন শরিয়ত তাঁর পূর্ববর্তী শরিয়তকে নসখ (বিলুপ্ত) করে দেয়। তবে পূর্ববর্তী শরিয়তের কোনো ক্ষেত্রে যদি নতুন শরিয়ত মৌন অবলম্বন করে, তাহলে বুঝতে হবে—এটা তাঁর স্বীকৃতি। সে ওই বিষয়টিকে নিজের মাঝেও ধারণ করছে; বরং অনেক ক্ষেত্রে শুধু ধারণ ও স্বীকৃতিই না; বরং পূর্ববর্তী শরিয়তের ওই বিষয়টাকে আরও তাকিদ (দৃঢ়) করে। এটা তাদের মাজহাবের সাথে সংগতিপূর্ণ যারা বলেন—

شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا لم يرد ما يخالفها

পূর্ববর্তী শরিয়তই আমাদের শরিয়ত; যতক্ষণ পর্যন্ত ওই শরিয়তের সাথে তার বিরোধ না হয়।’

আসমানি ধর্মসমূহ মূলত একাধিক না। একাধিক যা, তা হলো—শরিয়ত। এই সবগুলো শরিয়তে মাঝে সর্বশেষ শরিয়ত, যা শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন। আর, আসমানি ধর্ম মূলত একটাই। আদম আ. থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবিরই সে ধর্মের (দ্বীন)



প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। সকল নব্বিই মানুষদের একই ধর্মের প্রতি ডেকেছেন। সে ধর্মের নাম হলো ইসলাম।

এ ধর্ম দিয়েই ইবরাহিম আ., ইসমাইল আ. ও ইয়াকুব আ. প্রেরিত হয়েছেন—

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي
الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٥﴾

ইবরাহিমের ধর্ম থেকে শুধু সেই কতিপয় মুখ ফেরায়, যে নিজেকে বোকা
প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয়ই আমি তাঁকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং
সে পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾

স্মরণ করো, যখন তাঁকে তাঁর পালনকর্তা বললেন—‘অনুগত হও’।
সে বলল—‘আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম।’

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ
فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٣٧﴾

এরই অসিয়ত করেছেন ইবরাহিম তাঁর সন্তানদের এবং ইয়াকুবও; যে,
হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে
মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ
করো না ৷

এ ধর্ম দিয়েই মুসা আ.-কে বনি ইসরাইলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ফেরাউনের
জাদুকরদের সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা—

قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٣٨﴾

তারা বলল—‘আমাদের তো মৃত্যুর পর নিজেদের পরওয়ারদেগারের
নিকট ফিরে যেতেই হবে।’



وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿٥٦﴾

কল্পিত আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পরওয়ারদিগারের নিদর্শনসমূহের প্রতি, যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদের জন্য মৈথবের দ্বার খুলে দেন এবং আমাদের মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করেন ৮
এ ধর্ম দিয়েই ঈসা আ. কে প্রেরণ করা হয়েছে—

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

অতঃপর ঈসা যখন বনি ইসরাইলের কুফরি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন—কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? সঙ্গীসাথিরা বলল—‘আমরা রয়েছি আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকেন যে, আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি।’

এখন প্রশ্ন জাগে—যদি ব্যাপারটা এমনই হয়ে থাকে, তাহলে যারা নিজেদের ঈসা আ.-এর অনুসারী বলে দাবি করে, তাদের (বিশেষ) আকিদা অন্যসব নবির তাওহিদের আকিদার চেয়ে ভিন্ন কেন?

মুসা আ.-এর অনুসারী দাবি করা মানুষদের (বিশেষ) আকিদা অন্যদের আকিদার চেয়ে ভিন্ন কেন? কেন এই বৈপরীত্য? কুআন থেকে এর জবাব নিই—

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ۝

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা

মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরি করে, তাদের জন্য উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত ৷

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۝

এ অংশটুকুর পর বলেন—

وَمَا تَتَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سُبْحَتٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسْتَى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝

তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতভেদ করেছে। যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত রয়েছে ৷

সূত্রাং বুঝতে পারলাম, প্রত্যেক নবিকেই আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম ইসলাম দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আহলে কিতাবরা জানে, ধীন (ধর্ম) একটাই এবং তাদের এটাও জানা আছে, সে ধীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নব্বিই একে অপরকে সমর্থন ও দৃঢ় করতে এসেছেন।

মূলত নবিদের আনীত ধর্মের আকিদা-বিশ্বাসে কোনো ভিন্নতা ছিল না; কিন্তু যেই ভিন্নতা দেখা যায়, তা অনুসারীরা নিজেরা সৃষ্টি করেছে। তারা আকাইদে (বিশ্বাসসমূহ) কোনো ভিন্নতা নেই—এ বাস্তবতা জেনেও পরস্পরে শুধু বিদ্বেষ ও হিংসাবশত (কুরআন যেমন বলেছে) নিজেরা বাস্তব সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে।

* * *





জাহিলি সমাজ : নিভুনিভু সত্যের প্রদীপ

মিলাতে ইবরাহিম

এই পর্যায়ে, জাহিলি সমাজসংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত যে আলোচনটুকু আমরা উপস্থাপন করতে যাচ্ছি, এটুকুও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এখানেও আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

নবিক্রির সিরাত নিয়ে বিশদ আলোচনা এবং এ থেকে আমাদের যে সকল বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের মতো বিষয় রয়েছে, সে সম্পর্কে কথা বলার আগে ভূমিকাস্বরূপ এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলব আমরা। এই আলোচনায় এমন সব বাস্তবতার বিষয়াংশ আসবে, শত্রুরা যাকে বিভিন্ন দ্রাব্য বিশ্বাসবোধে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে।

আর সেই বাস্তবতার সারকথা হলো—সকল নবির পিতা ইবরাহিম আ. যে দীন ও আদর্শের ওপর ছিলেন, ইসলাম তারই সমৃদ্ধ একটি রূপ। শাস্ত্রত এ বাস্তবতা কুরআনে কারিমের বিভিন্ন আয়াতে ফুটে উঠেছে—

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ
وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝



তোমরা আল্লাহর জন্য পরিশ্রম করো, যেভাবে পরিশ্রম করা উচিত। তিনি তোমাদের পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের ধর্মে কায়ম থাকো। তিনিই তোমাদের নাম ‘মুসলিম’ রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও, যাতে রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, জাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব, তিনি কতই-না উত্তম মালিক এবং কতই-না উত্তম সাহায্যকারী!..

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

বলো, আল্লাহ সত্য বলেছেন। এখন সবাই ইবরাহিমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও; যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ভাবে সত্যধর্মের অনুসারী। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

আমরা জানি, আরবরা ইসমাইল আ.-এর বংশধর। এরই সুবাদে আরবরা জাতির পিতা ইবরাহিম আ.-এর মিল্লাত (ধর্ম) ও মানহাজের (পথ ও পদ্ধতি) অনুসারী ছিল। আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর ইবাদত, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ঘোষিত নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা, হুদুমাতকে (আল্লাহপ্রদত্ত মর্যাদার বিষয়াবলি) পবিত্রজ্ঞান করা—তাদের মাঝে এ বিষয়গুলোর উপস্থিতি ছিল। তারা হুদুমাতকে যে পবিত্রজ্ঞান করত, এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো—বাইতুল্লাহকে তাদের মর্যাদা প্রদর্শন, তার প্রতীক-নিদর্শনকে সমীহ করা, বাইতুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ, এর তত্ত্বাবধান, খেদমত—এসব পবিত্র কাবাকে তাদের পবিত্রজ্ঞান এবং এর প্রতি তাদের সম্মানপ্রদর্শনের অন্যতম পরিচায়ক।

কিন্তু কালের আবর্তনে তারাই একসময় সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটায়। তাদের মাঝে নানান শ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসের সংক্রমণ ঘটে। এটাই প্রত্যেক জাতির চিরচিরিত নিয়ম। কালের আবর্তে মূর্খতা তাদের পেয়ে বসে, শ্রান্ত ও পথহারাদের মাধ্যমে তাদের মাঝে পঙ্কিলতার ছড়ায়; আর তখন তাদের মাঝে ঘটে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ।



এসব সংক্রমণ থেকে আরকরাও বাঁচতে পারেনি। কালের বিবর্তনে তাদের মাঝে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটে। তারা মূর্তি-প্রতিমাপূজায় মগ্ন হয়। দ্রাষ্ট আকিদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়, মন্দাচার ইত্যাদির সংক্রমণ ঘটে। এর ফলে তারা তাওহীদের (একত্ববাদ) আলো থেকে দূরে থাকে, মানহাজুল হানাফি (ইবরাহিম আ.-এর ধর্মীয় ধারা ও রীতিনীতি) থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ব্যাপকভাবে তাদের মাঝে জাহালাত (অজ্ঞতা) ছড়ায়। দীর্ঘকাল পর্তু এভাবেই চলছিল। অবশেষে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তপ্রাপ্তির মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

আম্রবে মূর্তিপূজার সূচনা

আরবদের মাঝে সর্বপ্রথম যে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটায়, তাদের মূর্তিপূজায় অনুপ্রাণিত করে, তার নাম আমর ইবনে লুহাই। ইবনে ইসহাক আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, তিনি আকসাম ইবনে জাউন আল খুজায়িকে বলছেন—

আমি আমর ইবনে লুহাই (ইবনে কামকা ইবনে হানিক)-কে দেখেছি, সে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে টেনে জাহান্নামে চলছে। তোমার মতো তার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউক দেখিনি, এবং তার মতো তোমার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকে দেখিনি।

আকসাম তখন বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, (আমার সাথে) তার এই সাদৃশ্য তাহলে তো মনে হয় আমার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে!

নবিল্লি বললেন—না, এমনটা হবে না। তুমি তো মুমিন, আর সে হচ্ছে কাফির। সে-ই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে ধীনে ইসমাইলে পরিবর্তন ঘটায়। সে মূর্তি স্থাপন করে, সে-ই প্রথম ‘বাহিরা’, ‘সায়িবা’, ‘ওসিলা’ ও ‘হাম’—এগুলোর প্রচলন শুরু করে।

৪৯ সিরাতে ইবনে কাসিম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৬;

ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম, দুজনেরই বর্ণনা আবু হুরায়রা রা. থেকে প্রায় কাঙ্ক্ষনহি শব্দেই—

رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ لَاحِي بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خَنْدَفٍ يَجْرُ قَصْبِهِ فِي النَّارِ

আমি আমর ইবনে লুহাই (ইবনে কামকা ইবনে হানিক)-কে দেখেছি, সে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে টেনে জাহান্নামে চলছে।

বকীয়া : এমন উট, যাকে প্রতিমাদের জন্য কান কেটে ছেড়ে দেওয়া হতো। এ ধরনের উটের দৃশ্য দেখন নিষেধ ছিল।



আমর ইবনে লুহাই কীভাবে আরবে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটায়? এ ব্যাপারে ইবনে হিশাম লিখেছেন—

কোনো এক প্রয়োজনে আমর ইবনে লুহাই মক্কা থেকে শামের উদ্দেশে বের হলো। সে বালকার মা'বে- পৌঁছে দেখতে পেল, সেখানকার অধিবাসীরা মূর্তিপূজা করছে। সে তাদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা যে মূর্তিগুলোর পূজা করছ, এগুলো তোমাদের কী উপকার করে? তারা জবাব দিলো, আমরা যে মূর্তিগুলোর ইবাদত করছি, বৃষ্টি চাইলে এসব মূর্তি আমাদের বৃষ্টি দেয়। তাদের কাছে সাহায্য চাইলে তারা সাহায্য করে।

এরপর সে তাদের বলল, তোমরা কি তাহলে আমাকে একটি মূর্তি দেবে? আমি এটা আরব দেশে নিয়ে যাব, সেখানকার অধিবাসীরা তাকে পূজা করবে? তারা তাকে 'হুফল' নামের একটি মূর্তি দিলো। সে মূর্তি নিয়ে মক্কা এলো। এরপর মূর্তি স্থাপন করে মানুষকে তার ইবাদত ও সম্মান প্রদর্শনের আদেশ করল।

মূর্ত্য—সকল জাতির মূল

এবার আজিরাতুল আরবে শুরু হলো মূর্তিপূজা। মানুষের মাঝে শিরক ছড়াল। একত্ববাদের বিশ্বাস এখন তাদের ভেতর থেকে উঠাও। হীনে ইবরাহিম ও ইসমাইল থেকে তারা এখন বিচ্যুত। তার এখন অন্যান্য ব্রাহ্ম জাতির মতোই। যাদের বিশ্বাস ও কাজ এখন ব্রাহ্মতা ও মন্দেতে ভরপুর।

ব্রাহ্মির এই অতল গহবরে তাদের সহজেই যা নিক্ষেপ করতে পেরেছিল, তা হলো—অজ্ঞতা, মূর্ত্যতা, নিরক্ষরতা। এক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক প্রভাবেও তারা আক্রান্ত হয়েছিল। আশপাশের বিভিন্ন জাতির প্রভাব তাদের ওপর পড়েছিল।

সমীক্ষা : এমন উট, জাহিলি যুগে কোনো কাজে মুশি হয়ে থাকে প্রতিশ্রুতের জন্য ছেড়ে দেওয়া হতো।

ওসিল : যে উট পরপর দুটি নাকী উট জন্ম নিয়েছে, তাকে প্রতিশ্রুতের জন্য ছেড়ে দেওয়া হতো।

হযির : কৃষ পশুর উট, যার নর সন্তান বাচ্চা জন্ম দেওয়ার উপস্থিতি হয়ে পড়েছে। সেই কৃষ উটের ওপর সওয়ার হতো না, তার ওপর কোনো কিছু বহনও করত না।

৫০ সে সময় আমালিকারা সেখানে বসবাস করত, যারা আমলাক এর কংশধর। যার কংশধারাটা এ রকম বলা হয়— আমলিক ইবনে লাউজ ইবনি সাম ইবনি নুহ।

৫১ ইবনে হিশাম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৭; দেখুন—كتاب أصنام لابن الكلبي



ফিকহুস সিরাহ

তবে এসব কিছুর মাঝে নিভুনিভু কিছু প্রদীপ জ্বলছিল। কিছু মানুষ—কালের বিবর্তনে যাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য—তারা নির্জলা তাওহিদের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেছিল। যা ছিল মানহাজুল হানাকিয়াহর ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশের বিশ্বাস সক্রিয় ছিল। যেখানে আনুগত্যকে আল্লাহর প্রতিদান ও পাপিষ্ঠকে আল্লাহর শাস্তি দেওয়ার বিশ্বাস গুরুত্বের সাথেই লালন করা হতো। যা আরবদের মূর্তিপূজা, তাদের দ্রাব্ধ আকিদা-বিশ্বাসকে অপছন্দ করত। এ দুঃসময়েও সত্য বিশ্বাসের ওপর অটল অবিচল থেকেছেন—এ রকম অনেকের নাম পাওয়া যায়। যেমন : কিস ইবনে সাইদা আল ইয়াদি, রিয়াব আশ-শিম্মি, বুহাইরা আর-রাহিব।

তাদের আচার-অভ্যাসে ইবরাহিম আদর্শ ও স্বীনে হানিকের কিছুটা বাকি ছিল। তাদের জাহিলি সময়টা ছিল সত্যের রঙে কিছুটা রঙিন। কালের আবর্তনে যদিও তা ছিল খুবই ক্ষীণ। যদিও এসব শাআয়িরের (ইবরাহিম আ.-এর ধর্মীয় নিদর্শন) মাঝে তারা দ্রাব্ধির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল।

যেমন—বাইভুদ্রাহর তাজিম (সম্মান প্রদর্শন), তাওরাক, হজ্জ, উমরাহ, উকুফে আরাফা (হজ্জের সময় আরাফার ময়দানে বিশেষ পন্থতিতে অবস্থান) উটকে হাদি (হজ্জ-উমরাহর সময় যে পশুকে আল্লাহর জন্য জবাই করা হয়) হিসেবে প্রেরণ করা ইত্যাদি এগুলো তাদের মাঝে ছিল। ইবরাহিম আ.-এর সময় থেকে এসব তাদের মাঝে পরম্পরায় চলে এসেছে; কিন্তু সমস্যা হলো—তারা এগুলো ঠিকঠাক যেভাবে পালনের কথা, সেভাবে করত না। তারা তাতে ভিন্ন পন্থতি অবলম্বন করত। তারা এতে যা ছিল না, এমন অনেক কিছুরও অনুপ্রবেশ ঘটাত। যেমন—তারা হজ্জ-উমরাহর সময় তালবিয়া^১ ও তাহলিলের^২ ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ—ইবনে হিশাম যেমনটা বলেছেন—এর স্বীকার করত। এরপর তারা এর সাথে তাদের মূর্তিদের কথাও আনত। আবার তাদের মালিকানা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করত। কুরাইশ ও কিনানা গোত্রের লোকেরা তালবিয়া পাঠ করত এ রকম :

لِيكَ اللَّهُمَّ لِيكَ، لِيكَ لَا شَرِيكَ إِلَّا شَرِيكَ هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَ مَا
مَلِكٌ ۝

৫২ ‘লাব্বারিক, আল্লাহুমা...’ বলে হজ্জের সময় হাক্কিয়া যেমন পাঠ করে থাকেন।

৫৩ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা, আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করা।



আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, হে আল্লাহ, আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি,
সাড়া দিয়েছি এমন সন্তার ডাকে, যার কোনো শরিক নেই। তবে একজন
শরিক আছে, যে আপনার জন্য, আপনি তার মালিক এবং আপনি, সে
যার মালিক, তারও মালিক।

মেটিকথা, আরব জাতির ইতিহাসে ইবরাহিম আ.-এর (খর্ম) ‘আদ-দীনুল হানিফ’-
এর বিশাল উপস্থিতি রয়েছে। ফলে ঈমান ও তাওহিদের আলোয় তাদের জীবন
ছিল আলোকোজ্জ্বল; কিন্তু কালের আবর্তনে সময়ের পরিবর্তনে ধীরে ধীরে তাদের
এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তারা কুফর-শিরকে লিপ্ত হয়, অজ্ঞতা-ভ্রান্তির অতল
গহবরে নিমজ্জিত হয়। তবে এসব কিছু পরও তাদের মাঝে ধীনে ইবরাহিমের
ছিটেকোঁটা বাকি ছিল—যা দিনদিন দুর্বল হতে চলছিল।

এরপর নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এলেন, তখন তাঁর
নবুয়তের মাধ্যমে নতুন করে আবার ধীনে হানিফের আলো জ্বলে উঠল। নবি
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ওপর ছেয়ে যাওয়া সেই অশ্বকারকে
ঈমান, তাওহিদ, সত্য ও আদালতের (সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতা) আলোয় আলোকিত
করলেন।

কালের আবর্তনে ইবরাহিমি আদর্শের ছিটেকোঁটা যা বাকি ছিল, তা তিনি আরও
আলোকোজ্জ্বল করে তুললেন। তাকে তিনি আরও পরিপুষ্ট করলেন। নতুন করে এর
দাওয়াত দিলেন।

* * *

ইতিহাসের পাঠকের কাছে এ বিষয়গুলো যে স্পষ্ট, সে কথা কলাই বাহুল্য। বিনি
ইসলামকে সামান্যও পাঠ করেছেন, তার কাছেও বিষয়টা দিবালোকের মতো স্পষ্ট
হয়ে আছে। এরপরও এ রকম স্পষ্ট একটা বিষয়ের স্পষ্টকরণে অযথা সময় নষ্ট
করার কারণ হলো—আমি দেখলাম, কিছু মানুষ শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায় অকাতরে
তাদের আকিদা বা বিশ্বাসকে দুর্বল করে দিচ্ছেন!

হ্যাঁ, এ ধরনের অনেক মানুষ পৃথিবীতে জীবিত আছেন। তারা এটুকু বোঝার সুযোগ
পাননি যে, তাদের চিন্তাগত দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে রাখা হচ্ছে। আপনার বিশ্বাসের



পেছনে আপনার প্রবৃত্তি আর আপনার প্রবৃত্তির পেছনে আপনার বিশ্বাস—এ দুটোর মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে । একটা হলো উন্নত, আরেকটা নিম্ন। একটাতে সম্মান, আরেকটাতে অধঃপতন!...

এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কাউকে কাউকে বলতে শুনবেন—নবিজি প্রেরিত হওয়ার কিছু পূর্বে সত্যের পরিবেশ ও আবহ গড়ে উঠেছিল। শিরক-মূর্তিপূজাসহ যেসব কুসংস্কার সমাজে অনুপ্রবেশ করেছিল, এসবের বিরুদ্ধে সে সময়ের আরব চিন্তা রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। আর নবিজিকে প্রেরণের মাধ্যমে এবং তাঁর দাওয়াতের কল্যাণে এ জাগরুক চিন্তা অনন্য রূপ ধারণ করে।

এর মানে হলো—আরবরা কালের বিবর্তনে তাওহিদ ও সত্যের আলোয় আলোকিত হতে চলছিল। অর্থাৎ ইবরাহিম আ.-এর যুগ থেকে সময় বত গড়াচ্ছিল, আরবরা নবিজির আদর্শ ও দাওয়াতের তত নিকটবর্তী হচ্ছিল। অবশেষে নবিজিকে প্রেরণের মধ্য দিয়ে এটা সম্পূর্ণতার রূপ পায়।...

বিশুদ্ধ ইতিহাস কি এমনটাই বলে? নাকি বাস্তব ইতিহাস সম্পূর্ণ এর বিপরীত?

প্রত্যেক স্বাধীন চিন্তকই এ কথা জেনে থাকবেন—নবিজিকে জাহিলি যুগের যে সময়টাতে প্রেরণ করা হয়েছিল, এটা ছিল জাহিলিয়াতের সর্বোচ্চ যুগ। ইবরাহিমি আদর্শের ছিটোফোঁটা যা বাকি ছিল, যেমন : মূর্তিপূজাকে অপছন্দ, মূর্তিপূজা পরিহার এবং তাদের মাঝে থাকা ইতিবাচক কিছু বৈশিষ্ট্য (যেগুলোকে ইসলাম সমর্থন করেছে)—এগুলো কয়েক শতাব্দী পূর্বে যতটা ছিল, সে যুগটাতে এর দশ ভাগও ছিল না। যদি তাদের কথা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে নবিজি যে সময় প্রেরিত হয়েছিলেন, এর আরও কয়েক শতাব্দী পূর্বে প্রেরিত হওয়া উচিত ছিল।

আবার কেউ কেউ মনে করেন—নবিজি যখন আরবে প্রচলিত বিভিন্ন বিশ্বাস, প্রথা, কুসংস্কার ইত্যাদির মোকাবিলা করতে অক্ষম হলেন, তখন তিনি এগুলোকে দিয়ানাভের (ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইবাদত) পোশাকে সাজালেন। এবং এগুলোকে আত-তাকলিকাভুল ইলাহিয়াহ (বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আবশ্যিক করে দেওয়া বিষয়)—এর রূপ দিলেন। অন্য কথায়, মুহাম্মাদ সাদ্লাম্মাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হয়ে আরবের গায়েবি বিশ্বাসগুলো নিঃশেষ করে দেওয়ার পরিবর্তে এগুলোতে এমন এক সস্তার স্বীকৃতি দেন, যিনি সব ক্ষমতার অধিকারী, যিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন।



তাই দেখা যায়—ইসলাম গ্রহণের পরও তারা জাদুটোনা জিন-ভূত এ জাতীয় আরও অনেক বিশ্বাসে তারা বিশ্বাস রাখত। যেভাবে তারা ইসলাম আসার আদে কবর ত্যাগ করত, কাবাকে পবিত্রজ্ঞান করত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মানসিক (হুজ্জ পালনীয় কাজ) আদায় করত।

তাদের এসব বক্তব্য থেকে দুটি ফুল মেসেজ পাওয়া যায়। ফেগুলোকে তারা ফুল হিসেবে কখনো স্বীকার করবে না। প্রথম মেসেজটা হলো—

☞ মুহাম্মাদ নবিই নন।

দ্বিতীয় মেসেজটা হলো—

☞ আরবদের মাঝে ইবরাহিমি আদর্শের যে ছিটেকোটা বাকি থাকার কথা বলেছি, এগুলো মূলত ইবরাহিমি আদর্শ না; এগুলো কালের বিবর্তনে আরবদের উদ্ভাবন করা। সুতরাং কাবার তাজিম এবং একে পবিত্রজ্ঞান করা এটা ইবরাহিমি আদর্শের কোনো অংশ নয়; বরং এটা আরব সংস্কৃতির উদ্ভাবন করা একটা বিষয়।

তাদের এই লালিত বিশ্বাস থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তারা বিশুদ্ধ সব দলিল-প্রমাণ ঐতিহাসিক সব প্রামাণ্যতা—যা তাদের এই লালিত বিশ্বাসের স্বরূপ উন্মোচন করে ছাড়বে—সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেছেন।

এটা স্পষ্ট বিষয়, কেউ যখন পূর্ব থেকে কোনো একটা চিন্তা নির্দিষ্ট করে রেখে তাহকিক করতে বসে, তখন তার পক্ষে সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব। আর এ ধরনের তাহকিক হাস্যকর তো বটেই।

ঐতিহাসিক দলিল, যুক্তিনির্ভর দলিল—এর কিছুকেই আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমরা যদি বাস্তবতায় পৌঁছাতে চাই, তাহলে আমরা দলিল-প্রমাণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারি না। আমরা শুধু মন্তুচিন্তার নামে, তাআসসুবের ভিত্তিতে মিথ্যাচার করতে পারি না, অন্যদের আমার নির্দিষ্ট কোনো একটা চিন্তার—যার বাস্তবতা থাকুক বা না-ই থাকুক—ওপর বাধ্য করার প্রবণতা রাখতে পারি না।

৫৫ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৫৬ কোনো বিষয়ে ভালোবাসা অনুসন্ধান ও যাচাই করা।

৫৭ দলদ্বিত্ব, স্বজনদ্বিত্ব ও পৌত্রদ্বিত্ব।



আমাদের পক্ষে এটা কোনোভাবেই সম্ভব না যে, আমরা ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবি নন’—শুধু এই দাবি পূরণ করতে গিয়ে আমরা দালাইলুন নুবুওয়াহ্-, ওহি নাজিল হওয়া, কুরআনের মুজিভা, পূর্ববর্তী নবিদের সাথে তাঁর দাওয়াতের মিল হওয়া, তাঁর মাঝে নবি হওয়ার সমস্ত আলামত বিদ্যমান থাকা, তাঁর উন্নত চরিত্রমাধুরী—এগুলোকে পাশ কেটে যাব। তেমনি ‘আরবদের মাঝে বিদ্যমান থাকা ইবরাহিমি আদর্শের যে ছিটেফোঁটা বাকি ছিল, সেগুলো আরবদের উদ্ধাবন করা’—এ দাবি প্রমাণ করতে গিয়ে আমাদের জন্য ঐতিহাসিক বাস্তবতা অস্বীকার করাও সম্ভব না। এ দাবি প্রমাণ করতে গিয়ে আল্লাহর হুকুমে ইবরাহিম আ.-এর কাবা নির্মাণ করার কথা অস্বীকার করতে পারি না। শুধু এ দাবি প্রমাণ করতে গিয়ে সকল নবির একত্ববাদ, আল্লাহর প্রতি, নিরঙ্কুশ বিশ্বাস, আখিরাত, হাশর, জাহ্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাসে মানুষকে ডাকা—যেগুলোর বর্ণনা পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহে রয়েছে, যেগুলো ঐতিহাসিকভাবেও স্বীকৃত—এসব আমরা পাশ কাটিয়ে যেতে পারব না।

কিন্তু মনে রাখবেন, তারা যেসব দাবি করেন, এসব তাদের উড়োকাথা; এর কোনো প্রামাণ্যতা নেই। সবই কথাই ফুলঝুরি! এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ নিতে আপনি ইংরেজ প্রাচ্যবিদ H.A.R. Gibb-এর লেখা *بنية الفكر الديني* বইটি পড়ুন। আপনি বুঝতে পারবেন, কী পরিমাণ অন্ধ আসাবিয়াতে ভ্রমলোক প্রভাবিত। যে আসাবিয়াত ব্যক্তির ব্যক্তিতে কালিমা লেপন করে। বইটি পড়লে আপনার কাছে বিষয়টা প্রকাশ পাবে, তিনি শুধু নিজের দাবি পূরণ করতে গিয়ে সত্যের সব দলিল পাশ কাটিয়ে গেছেন।

ইংরেজ এ প্রাচ্যবিদ- তিনি মনে করেন—

ইসলামের চিন্তা ও বিশ্বাসের মূলভিত্তি হলো, আরবদের মাঝে প্রচলিত গায়েবি বিশ্বাস চিন্তাচেতনা। আর এসব বিশ্বাস ও চিন্তায় নবিজি চিন্তা করে যতটুকু পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন, ততটুকু পরিবর্তন করেছেন। আর যেটুকুতে তিনি সক্ষম হননি, সেটুকুকে ইসলাম ও ধ্বিনের

৫৮ নবি হওয়ার দলিল-প্রমাণ।

৫৯ যেগুলোকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে অনুমান দিয়েছেন।

৬০ এইচ.এ.আর. গিব নামে পরিচিত এই ভ্রমলোক হলেন স্যার হ্যামিণ্টন আলেকজান্ডার রসকিন গিব। একবিএ, প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কিত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ছিলেন। জন্ম : ২ জানুয়ারি, ১৮৯৫; আলেকজান্দ্রা, মিশরে। আর ২২ অক্টোবর, ১৯৭১ সালে কুস্তরাছো মারা যান।

পোশাক পরিয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে তিনি অন্যান্য কিছু চিন্তা ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রবেশ ঘটান। সংকটটা আরও গভীর হয়েছে, যখন তিনি সেটাকে আরবের বাইরের অন্য সব জাতির জন্যও চিন্তা করেছেন এবং তিনি এটাকে কুরআনের রঙে প্রকাশ করেছেন।’

তিনি সারা বইয়ে যে চিন্তা তুলে ধরেছেন, এ হচ্ছে তার সেই চিন্তার মূলকথা। আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লেও তার চিন্তার কোথাও কোনো দলিল খুঁজে পাবেন না। একটু গভীরভাবে লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন, তিনি তার চিন্তার চৌহদ্দিতে সত্য ও বাস্তবতা থেকে কতটা দূরে রেখেছেন। তিনি তার চিন্তাকে সঠিক পথে প্রবাহিত করেননি। এখানে তিনি স্রেফ অনুমাননির্ভর কথা বলেছেন এবং এর আলোকে তিনি তার চিন্তার বিন্যাস করেছেন।

তিনি যখন তার বইয়ের আরবি অনুবাদের মুকাদ্দিমা লিখতে বসেন, তখন বুঝতে পারছিলেন, মুসলিমরা তার এই অসুস্থ চিন্তাকে কীভাবে প্রত্যাখ্যান করছে। তখন তিনি ওজর পেশ করা শুরু করলেন—

ان الأفكار التي أسست عليها هذه الفصول ليست بنات دماغ هذا المؤلف بل سبقني عليها ودلني إليها جماعة من المفكرين ومن أقطاب المسلمين و قد يطول إحصاءهم فسأكتفي علي ذكر أحدهم بسبيل المثال هو الشيخ الكبير شاه ولي الله الدهلوي ۞

এসব আলোচনায় যেসব চিন্তা ফুটে উঠেছে, সেসব লেখকের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়; বরং মুসলিমদের বড়ো বড়ো স্কলার ও চিন্তাবিদদের একটি দলের চিন্তা আমাকে এসব চিন্তা শিখিয়েছে। তাদের ফিরিস্তি বিশাল। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজনের কথাই এখানে আনব। তিনি হচ্ছেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ আদ-দিহলাবি।

এরপর তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহর কিতাব *ইজ্জাতুল্লাহিল বালিগার* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২২ থেকে একটা নস (টেব্রাট বা মূল পাঠ) নকল করেন। তিনি ভাবলেন—তার এই নকল করা নস কে ঘাঁটতে যাবে? কে শুধু শুধু কষ্ট স্বীকার করবে? তিনি নিশ্চিন্তে নিজেই মতো করে নিজের চিন্তার সাথে সংগতিপূর্ণ করে উপস্থাপন করেন এবং ওয়ালিউল্লাহর ওপর এমন কিছু চাপিয়ে দেন, যা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ যেভাবে নকল করেছেন—



إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثة تتضمن بعثة أخرى فالأولي
إنما كانت الى بني إسماعيل...

وهذه البعثة تستوجب أن يكون مادة شريعته ما عندهم من الشعائر
وسنن العبادات و وجوه الارتفاقات، إذ الشرع إنما هو إصلاح ما
عندهم لا تكليفهم بما لا يعرفونه أصلاً

নবজির যে ‘প্রেরণ’, এটি অন্য আরেকটি ‘প্রেরণ’-কে शामिल রাখে
(অর্থাৎ দুটি প্রেরণ)। প্রথমটি ছিল বনু ইসমাইলে...

এ প্রেরণের কামনা হলো—তার শরিয়তের মূল উপাদান হবে, তাদের
নিকট থাকা শাআইর, ইবাদতের রীতি-পন্থতি ও আচার-পন্থতি। যেহেতু
শরিয়তের মূলকথা হলো, তাদের নিকট যা রয়েছে—(ইবাদত ও এর রীতি
পন্থতি, আচার)—তা সংশোধন করা। তারা মূলতই বা জানে না অর্থাৎ,
একদম অপরিচিত বিষয়ে তাদের বাধ্য করা নয়।

অথচ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ সম্পূর্ণ ইব্রাত এ রকম—

واعلم أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنفيه الإسماعيلية لإقامة
عوجها وإزالة تحريفها وإشاعة نورها وذلك قوله تعالى مله ابيكم
ابراهيم ولما كان الأمر علي ذلك وجب أن أصول تلك الملة مسلمة
وسنتها مقررّة

إذ النبي إذا بعث إلي قوم فيهم بقية السنة الراشدة فلا معني بتغييرها
و تبديلها بل الواجب تقريرها لأنه أطوع لنفوسهم و أثبت عند
الاحتجاج عليهم وكان بنو إسماعيل ثوارثوا منهاج أبيهم إسماعيل
فكانوا علي تلك الشريعة إلي أن وجد عمرو بن لحي فأدخل فيها أشياء

برأيه الكاسد فضل و أضل و شرع عبادة الأوثان و سيب السوائب و
بحر البحائر فهناك بطل الدين واختلط الصحيح بالفساد

و غلب عليهم الجهل والشرك والكفر فبعث الله محمدا صلى الله
عليه وسلم مقيما لعوجهم و مصلحا لفسادهم فنظر في شريعتهم فما
كان منها موافقا لمنهاج إسماعيل عليه السلام أو من شعائر الله أبقاه
و ما كان منها تحريفا أو فسادا أو من شعائر الشرك أو الكفر أبطله
و سجل علي إبطاله ۞

জেনে রাখার বিষয়—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল
হানাফিয়াভুল ইসমাইলিয়াহ (ইবরাহিম ইসমাইল আ.-এর ধর্মীয় ধারা)
দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যেন তিনি এতে সৃষ্ট বক্রতার সংশোধন ও
বিকৃতি দূর করে তাঁর আলো ছড়াতে পারেন। এ বিষয়টাই আল্লাহ তায়ালা
কুরআনে বলেছেন—إبراهيم ملة أبيضك বিষয়টা যেহেতু এমনই, তাই
ওই মিল্লাতের উসূল ও নিয়মরীতিকে স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যিক।

কারণ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন এক জাতির কাছে
পাঠানো হয়েছে, যাদের মাঝে সুন্নতে রাশেদার ছিটেফোঁটা হলেও বাকি
রয়েছে। তাই সেটাকে পরিবর্তনের কোনো মানে নেই; বরং আবশ্যিক
হলো, একে স্বীকারোক্তি দেওয়া। কারণ, তা তাদের মনের সাথে বেশি
সংগতিপূর্ণ। দলিল হিসেবে অধিক দৃঢ়।

বনু ইসমাইল; তারা তাদের পিতা ইসমাইল আ.-এর মানহাজের
উত্তরাধিকারী হয়েছিল। আমার ইবনে লুহাই পর্যন্ত তারা তারা এ শরিয়তের
ওপর অটল ছিল; কিন্তু সে তার ব্রাহ্ম চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটল। নিজেও
গোমরাহ হলো, অন্যদেরও গোমরাহ করল। মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটল।
'সায়িবা-বাহিরার'র প্রচলন ঘটল। এভাবে সে ধর্মকে ব্রাহ্ম করল। সত্য-
মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটল। তাদের ওপর জাহালত-শিরক, কুফরি চেপে
বসল। তাই আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে
তাদের বক্রতা ঠিক করতে, তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়া ফ্যাসাদ-বিপর্যয়ের
সংশোধন করতে পাঠালেন।



এরপর তিনি তাদের শরিয়তে দৃষ্টি দিয়ে যা মিনহাজু ইসমাইল (ইসমাইলি ধর্মীয় ধারা ও রীতি) অথবা আল্লাহর শাহাইরের মুওয়াক্কিফ (সংগতিপূর্ণ) ছিল, তা বাকি রাখলেন। যাতে বিকৃতি ঘটেছিল, যাতে ফ্যাসাদ ঢুকেছিল, অথবা যা ছিল শিরকের শাহাইল, অথবা যা ছিল কুফর—এসবকে তিনি বাতিল করেন এবং তা বাতিল হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন।

আমরা এসব গবেষকদের গবেষণা ও বিকৃতির নিয়ে বিশদ আলোচনা করতে আমরা বসিনি। আমরা এটুকু বুঝাতে চাচ্ছি—কী পরিমাণ আসাবিয়াত তার ওপর জেক্কে বসেছে!

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা এটাও আমাদের উদ্দেশ্য—যারা পশ্চিমা চিন্তাবিদদের জ্ঞানতাত্ত্বিক গবেষণার প্রশংসায় বৃন্দ হয়ে থাকেন, তারা এর বাস্তবতা একটু জানবেন। এবং এটাও স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য—পশ্চিমাদের এই অস্থানুসরণ মুসলিমদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে!

* * *

আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম—ইসলাম ও ইসলাম পূর্ববর্তী জাহিলি চিন্তার পারস্পরিক সম্পর্ক। একইভাবে আমরা জাহিলি যুগ ও ইবরাহিম আ.-এর মিল্লাতে হানাফিয়াহ (ইবরাহিম আ.-এর ধর্মীয় ধারা)—এ দুটোর পারস্পরিক যোগসূত্রও আমরা বুঝতে পারলাম।

এখান থেকে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়েছে, নবিজি কেন আরবে প্রচলিত সব (ব্রাহ্ম) প্রথা ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও কিছু আচার-অভ্যাস ও আদর্শকে সায় দিয়েছেন?

এতকণের আলোচনার মাধ্যমে আমরা নবিজির সিরাত এবং তা থেকে আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ-নির্দেশনা বোঝার জন্য যে ভূমিকা টানার প্রয়োজন ছিল, এর পাঠ চুকিয়ে ফেলেছি।

আমাদের সামনের আলোচনায় এখানে করা আলোচনার অনেক দলিল পাবেন। সেসব আলোচনা এখানে আমরা যা স্পষ্ট করেছি, এর দৃঢ় সমর্থন করবে এবং এর বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলবে।

* * *





দ্বিতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে প্রধানত নবিজির জন্ম থেকে নিয়ে নবুয়ত পর্যন্ত ঘটনাবলি ও তার শিক্ষা নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলো এমন—

- নবিজির বংশধারা, জন্মসাল, দুধ পান, বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব, এতিম হওয়ার ইলাহি হিকমত, নবিজির ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ও নবুয়তের নিদর্শন।
- শামের সফর, জীবিকার জন্য পরিশ্রম, পূর্ববর্তী কিতাবে নবিজির সংবাদ, তাওরাত-ইনজিলের বিকৃতি বিষয়ে আলোচনা।
- শামের বাজারে ব্যবসা, বিয়ে, খাদিজা রা.-এর বৈশিষ্ট্য; মুদারাবা চুক্তি ও এসবের পেছনে আল্লাহর তায়ালার কী হিকমত, তার আলোচনা। এরপরই প্রাচ্যবিদদের অপপ্রচার ও তাদের মুখে চপেটাঘাত; নবিজি কি লোলুপ ছিলেন? নবিজির বিয়ে কি নারীসন্তোষ ছিল? এইসব প্রশ্নের উত্তর এসেছে।
- কাবা নির্মাণে নবিজির অংশগ্রহণ, কাবা নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য, কাবার ইতিবৃত্ত বিষয়ে আলোচনা এসেছে।
- হেরা গুহার নবিজির নির্জনবাস, মুহাসাবা, ওহির সূচনা, ওহি নিয়ে বড়ঘরের মূল লক্ষ্য উন্মোচন এবং কিছু গুরুতর প্রশ্ন ও তার প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করে এই অধ্যায় শেষ করা হয়েছে।



নবিজির বংশ, জন্ম ও দুধ পান

নবিজির বংশধারা

নবিজির বংশধারা এ রকম—

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে ক্বিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কাব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব ইবনে ক্বিহর ইবনে মালিক ইবনে নজর ইবনে কিনানা ইবনে খুজাইমা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলয়াস নজর ইবনে মুদার ইবনে মাআদ ইবনে আদনান।

এতটুকু পর্যন্ত সবাই একমত। এর ওপরে গিয়ে মতানৈক্য হয়েছে। যাতে নিশ্চিত ভরসা রাখা যায় না। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত—আদনান; তিনি ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম আ.-এর বংশের। আদ্রাহ তায়ালা খ্রিয় নবিজিকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বংশে, সবচেয়ে পবিত্র-নির্মল ঔরসে জন্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর বংশে জাহিলিয়াতের কোনো পঙ্কিলতার অনুপ্রবেশ ঘটেনি।

ইমাম মুসলিম তার সনদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

আদ্রাহ তায়ালা কিনানাকে ইসমাইলের বংশধর বানিয়েছেন। কুরাইশকে কিনানার বংশধর বানিয়েছেন। হাশিমকে কুরাইশের বংশধর বানিয়েছেন। আর, আমাকে বানিয়েছেন হাশিমের বংশধর।



নবিজির জন্মসাল

নবিজির জন্ম হয়েছে আমুল ফিল (হস্তীবর্ষ)-এ। অর্থাৎ যে বছর বাদশাহ আবরাহা আল আশরাফ মক্কায় অভিযান চালানোর ইচ্ছা করেছিল, সে বছর। সে পবিত্র কাবা ভেঙে ফেলার মতো দুঃসাহস করে বসেছিল; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের চরমভাবে ধ্বংস করে দেন। কুরআনে এর বিবরণ রয়েছে। প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত অনুযায়ী সে দিনটা ছিল রবিউল আউয়ালের বারো তারিখ, সোমবার।

নবিজির দুধ পান

তিনি এতিম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। তার মা যখন দু-মাসের গর্ভবতী, তখন তার বাবা আবদুল্লাহ মারা যান। জন্মের পর তিনি দাদার তত্ত্বাবধানে থাকেন। আরর সংস্কৃতি অনুযায়ী তাঁকে দুধ পান করানোর জন্য বনু সাদ ইবনে বাকারের এক নারীকে নির্বাচন করেন। নাম হালিমা বিনতে আবু জুআইব।

সিরাতবিশারদগণ সবাই এ ব্যাপারে একমত, যে বছর হালিমা নবিজিকে নিতে এসেছিলেন, সে বছর বনু সাদ গোত্রের তীষণ দুর্দিন যাচ্ছিল। এ বছর ফসলের ছিল বড়োই অকাল। দুধেরও বড়ো অকাল ছিল; কিন্তু হালিমার ঘরে নবিজির আগমনের পর, নবিজি হালিমার কোলে ওঠার পর এ ঘরে সবকিছুতে সচ্ছলতার হিড়িক পড়ে। সমৃদ্ধি আসে। তার ঘরের আশপাশ সজীব হয়ে ওঠে। দেখা যেত, এ পরিবারের ছাগলগুলো ওলান ভরে দুধ নিয়ে আসছে।

নবিজি যখন হালিমার ঘরে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন বেড়ে উঠছিলেন, তখন (প্রথমবারের মতো) তাঁর বন্ধবিদারণের ঘটনা ঘটে।”

এরপর নবিজির পাঁচ বছর পূর্ণ হলে তাঁকে তাঁর মায়ের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হয়। নবিজি যখন ছয় বছরে পা রেখেছেন, তখন তাঁর মা মারা যান। এরপর তিনি তাঁর দাদার দায়িত্বে যান। আট বছরের সময় তাঁর দাদা মারা যান। তখন তাঁর দায়িত্ব নেন চাচা আবু তালিব।

* * *

৬২ বিস্তারিত জানতে বনু সাদে হালিমার ঘরে নবিজির দুধ পান ও সে সময়ে নবিজির বন্ধবিদারণের ঘটনাটি দেখতে পারেন। *সিরাতে ইবনে কিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৪; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০১-১০২



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

নবিজির কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ ও দুধ পানের এ অংশে আমাদের জন্য বেশ কিছু জ্ঞানার ও বোঝার মতো শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে—

এক. বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব

আমরা নবিজির যেই বংশধারা বর্ণনা করেছি, এ থেকে বোঝা যায়—আল্লাহ তায়ালা আরবদের অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আর কুরাইশ বংশকে আরবের অন্য সকল বংশের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। *সহিহ মুসলিম*-এর বর্ণনা থেকে এটা সুস্পষ্ট বোঝা যায়। *সহিহ মুসলিম*-এর বর্ণনা ছাড়াও এ জাতীয় প্রচুর বর্ণনা রয়েছে। ইমাম তিরমিজির বর্ণনাটি এখানে উল্লেখ করছি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিস্বরে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন—

: আমি কে?

তারা (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন—

: আপনি আল্লাহর রাসূল; আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

এরপর তিনি বললেন—

: আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টজীবকে সৃষ্টি করার পর তাদের দু-ভাগে বিভক্ত করেছেন। এ দু-দলের উত্তম দলে আমাকে রেখেছেন। এরপর তিনি (আল্লাহ সুবহানাছু ওয়া তায়ালা) তাদের বিভিন্ন গোত্রে ভাগ করে দিয়েছেন। আমাকে সব গোত্রের শ্রেষ্ঠ গোত্রে দিয়েছেন। এরপর তিনি তাদের (বিভিন্ন) পরিবারে ভাগ করেছেন। আমাকে সবচেয়ে সেরা

পরিবারের বানিয়েছেন। ব্যক্তি হিসেবেও আমাকে সবার সেরা বানিয়েছেন।”

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ রাখার মতো বিষয় হলো, নবিজির গোত্র ও জাতির প্রতি, যেখানে নবিজি বেড়ে উঠছেন, কোনো টান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ—এটা শ্রেফ (নীতিহীন) গোত্রপ্রেমের অন্তর্গত না; বরং এটা বাস্তবতার নিরিখে। কারণ, আরব জাতি ও কুরাইশদের বাড়তি শ্রেষ্ঠত্ব, এটা নবিজির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণেই এসেছে। (তাই নবিজি এখানে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেছেন।)

নবিজির বংশের যারা সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, মানবতার উৎকৃষ্ট পথ ও মতাদর্শ থেকে যারা ঝরে পড়ছিল, তাদের কারণে নবিজির বংশের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবে ভটা পড়বে না। শ্রেষ্ঠত্বে ফাটল ধরানোর মতো বিষয়ের কোনো প্রভাব এখানে নেই।

দুই. এতিম হওয়ার ইলাহি হিকমত

নবি-জীবনে যে করুণ উপাখ্যান রয়েছে—পৃথিবীর আলো-বাতাস পাওয়ার আগেই দুনিয়া থেকে বাবার বিদায়, জন্মের পর শৈশবেই মায়ের ছায়া উঠে যাওয়া, কিছুদিন পর দাদাকে হারানো—এসব নবি-জীবন গঠনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা প্রদান নয়। এই যে তিনি পিতা-দাদার তরবিয়ত (পরিচর্যা ও দীক্ষা) ছাড়া, ভালো রকম মায়ের স্নেহ পাওয়ার সুযোগ না পেয়েই বেড়ে উঠেছেন, এগুলো তাঁর জীবন গঠনে প্রতিবন্ধক নয়। তাকে এ রকম নিঃসঙ্গ আবহে বাড়িয়ে তোলার মাঝে আল্লাহ তায়ালার বিশাল হিকমত রয়েছে। সম্ভবত এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে হিকমত, তা হলো—অবিশ্বাসী-ভ্রান্তরা যেন কোনো খুঁত বের করার সুযোগ না পায়। মানুষের মাঝে সন্দেহ-সংশয় ছড়ানোর ফুরসত না পায়। তারা যেন এ কথা বলতে না পারে—‘মুহাম্মাদ যেই দাওয়াত দিচ্ছে, এটা শৈশবে সে তার বাপ-দাদার যেই নির্দেশনা ও যেই আবহে বেড়ে উঠেছিল, এরই বহিঃপ্রকাশ।’

কারণ বাবা তার সন্তানকে, দাদা তার নাতিকে সে যে বিশ্বাস ও আদর্শ লাগান করে, এরই পাঠ দিতে চায়। তারা তখন ভাবত, তিনি তাঁর বাপ-দাদার দেওয়া পাঠ ও



আদর্শই ছড়াচ্ছেন। আর এটা কলা বা ভাবা ছিল খুবই স্বাভাবিক। তাঁর দাদা ছিলেন কুরাইশদের সবার প্রধান। তার নিকট রিকাদাত ও সিয়াকাতের দায়িত্ব ছিল।

আব্বাহ তায়ালার হিকমতের দাবি ছিল—তিনি নবিজির ব্যাপারে এ রকম সন্দেহ ও সংশয়ের কোনো অবকাশ রাখবেন না। তাই নবিজিকে সেই ছোট্ট শৈশবেই বাবা-মা-দাদা সকলের ছায়া থেকে দূরে রাখেন। পরিবার-পরিজন সবার থেকে অনেক দূরে গ্রাম্য পরিবেশে বনু সাআদে তাকে বড়ো করে তোলেন। নবিজির ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ বাকি না থাকে, এজন্য আবু তালিবকে আব্বাহ তায়ালার ইসলাম গ্রহণ করার তাওফিক দেননি। দাদার মৃত্যুর পর নবিজির প্রতিপালনের দায়িত্ব যায় চাচা আবু তালিবের কাছে। হিজরতের তিন বছর পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নবিজি শত চেষ্টা-কামনার পরও চাচা ইসলাম গ্রহণ করেননি। তার এই ইসলাম না গ্রহণ করাটা আব্বাহ তায়ালার এ হিকমতের পরিপূরক। যাতে কেউ এ ধারণা করতে না পারে যে, নবিজির এই দাওয়াতে চাচার কোনো হাত রয়েছে। নবিজির দাওয়াতি মিশন ও কার্যক্রম—এটা তার পারিবারিক ঐতিহ্য, নেতৃত্ব ও পদের ফসল।

আব্বাহর হিকমতের দাবি ছিল এটাই, নবিজি এতিম হয়ে বেড়ে উঠবেন এবং আব্বাহ তায়ালার নিজেই তাঁর প্রতিপালন করবেন। তাঁকে ধনসম্পদ বিভবৈভ থেকে দূরে রাখবেন। যাতে নবিজির মন ধনসম্পদ ও সম্মানের পেছনে না ছোটে। তিনি যেন পারিপার্শ্বিকতা, নেতৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি প্রভাবিত না হন। যাতে তাঁর নবুয়তের পবিত্রতা দুনিয়ার সম্মান কামনার কলুষে কলুষিত না হয়। মানুষ যেন এ কথা মনে না করে যে, তিনি দুনিয়ার মর্যাদা- প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য নবুয়তকে ব্যবহার করছেন।

তিন. নবিজির ব্যক্তিত্বের মর্যাদা

নবিজি হালিমাতুস সাদিয়ার ঘরে যাওয়ার পর সচ্ছলতার যে ধারা বয়েছিল, ফসলের মাঠ সজীব হয়ে উঠেছিল, যে উটনীতে এক ফোঁটাও দুধ আসছিল না, সে উটনীর ওলান ভরে দুধ আসিছিল—যে ব্যাপারে সিরাতবিশারদগণ একমত—এসব বিষয়

৬৪ আছিল যুগে কুরাইশদের সমাজসেবাকে রিকাদাত কলা হয়। তারা এতটুকু বার বার সামর্থ অনুযায়ী মাল-অর্থ জমা করে তা দিয়ে আত্মর, কিশমিশ নাবিজ (আব্বাহে প্রচলিত মাদকজাতীয় একপ্রকার দ্রব্য) বিভিন্ন খাবার কিনত। এরপর তা মানুষদের মাঝে বিলাত। মানুষকে পান করাত। হজরত মৌসুমের শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত তারা এ রকম করত।



থেকে সেই ছোটোকোলাই নবিজির কবিত্ব ও আল্লাহর নিকট তাঁর মর্যাদার ব্যাপারটা বুঝে আসে।

নবিজির ওসিলায় হালিমার ঘরে বরকতের ফোয়ারা বয়ে যাওয়া—এটা নবিজির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল উপহার। তবে এখানে খুব আশ্চর্যবিত্ত হওয়ার বিশেষ কিছু নেই। কারণ, ইসলাম থেকে আমরা শিখেছি—বৃষ্টি (বা অন্য কোনো) প্রয়োজনে আমরা দুআ কবুলের বিশেষ আশায় সালিহিন (আল্লাহর সং বান্দাগণ) ও আহলে বাইতের (নবিরিবার) মানুষজনের বরকতের ওসিলা নিয়ে দুআ করতে পারব।

তো, নবিজির মতো মহান ব্যক্তিত্বের ছোট্ট শৈশবে তাঁর কারণে হালিমার ঘরে বরকতের ফোয়ারা বয়ে যাওয়া এতে আশ্চর্যের কী আছে? বৃষ্টি ও ঝরনা এসব শুষ্ক ভূমি সজীব হয়ে ওঠার বিশেষ উপকরণ ও কার্যকারণ। আর এসব কার্যকারণ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর হাতেই সব কার্যকারণের পরিচালনা। সুতরাং নবিজি আল্লাহর বিশেষ উপহার ও বরকতের কার্যকারণের প্রধান ভূমিকায় থাকবেন, এতে ভীষণ আশ্চর্যবিত্ত হওয়ার কিছু নেই। আর যেখানে তিনি কুরআনের এ ভাষ্য অনুযায়ী—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।”

যেখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রহমাতুল্লিল আলামিন ঘোষণা করেছেন, সেখানে এ রকম হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক বিষয়।

চর. নবুয়তের নিদর্শন

বনু সাআদে থাকাকালে নবিজির বন্ধবিদারণ, এটা তাঁর নবুয়তের অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা ভবিষ্যতে তাঁকে মহৎ কোনো কাজের জন্য নির্বাচিত করতে যাচ্ছেন—এটা তার অন্যতম সাক্ষী।

৬৫ আব্দুল সালাহ ওরাত তাকওয়া, আব্দুল বাইত—তাদের ওসিলা দিয়ে (যে) যেকোনো বিষয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া সূক্ষ্ম। জুয়রুল আরাবিয়া ওরুল মুকাযা (ইসলামি আইন শাস্ত্রবিদের বিশাল জ্ঞান) এ ব্যাপারে একমত। দেখুন—ফাতহুল বারি, খণ্ড : ২, খণ্ড : ৩৩৯; নাইসুল আততারা, খণ্ড : ২ পৃষ্ঠা : ৭; সুবুস সালাম, খণ্ড : ২ পৃষ্ঠা : ১৩৪; জাল সুন্নি, ইবনে কুদামা, খণ্ড : ২ খণ্ড : ২৫৬।

৬৬ সূরা আমবিয়া, আরাত : ১০৭

নবিজির বন্ধবিদারণের এই ঘটনাটি বিপুলসংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম বর্ণনা করেছেন। অনেকভাবে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোই বিশুদ্ধ। এখানে ইমাম মুসলিমের বর্ণনটুকু তুলে ধরাছি। আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত—

(বনু সাআদে অবস্থানকালে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদের সাথে খেলছিলেন। এমন সময় তাঁর নিকট জিবরাইল এলেন। তাঁকে ধরে মাটিতে ফেলে (শুইয়ে দিয়ে) তাঁর বন্ধবিদারণ করলেন। এরপর তাঁর বুক ফেঁড়ে কলব বের করে এনে তা থেকে ‘রক্তপিণ্ডে’র মতো বের করে আনলেন। এরপর জিবরাইল বললেন—এটা আপনার মাঝে থাকা শয়তানের অংশ। এরপর তা জমজমের পানিতে স্বর্ণের পেয়ালায় ধৌত করলেন। এরপর সেটাকে আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন। তার সাথে বালকেরা তার দুখমা (হালিমা)—এর নিকট ছুটে এসে বলতে লাগল—‘মুহাম্মাদকে হত্যা করা হয়েছে।’ তারা সবাই তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে দেখল, তিনি বিবর্ণ।

কিন্তু এই বন্ধবিদারণের মানে এই নয় যে, নবিজির ভেতরে ‘মন্দের উপকরণ’ ছিল আর জিবরাইল এটার মূলোৎপাটন করেছেন। কারণ, মানুষ থেকে যে মন্দ কাজ প্রকাশ পায়, এটা যদি তার শরীরে থাকা কোনো মন্দত্বের কারণে হতো, তাহলে অস্ত্রপাচার করে তা দূর করার মাধ্যমে মন্দ লোক ভালো হয়ে যেত; কিন্তু বন্ধবিদারণের উদ্দেশ্য হলো—বক্তৃগত নিয়মে শৈশব থেকেই তাকে নবুয়ত প্রদানের উপযুক্ত করে তোলা। এটা যেন মানুষের কাছে তাঁর নবুয়তের স্বীকৃতিতে অন্যতম ভূমিকা রাখে। নবুয়তের জন্য পবিত্র করা—এটা তো মানবীয় (অভ্যন্তরীণ) বিষয়। এখানে এ ধরনের বক্তৃগত কার্যক্রমের কোনো প্রভাব নেই। তবুও এই বক্তৃগত নিয়ম ব্যবহারের উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে তাঁর নবুয়তের বিষয়টা জানিয়ে দেওয়া।

যাক, ঘটনা যেহেতু বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত, তাই হিকমত যা-ই হোক, এক্ষেত্রে অযথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ডুবতে বসা, এর জাহির (দৃশ্যমানবোধ) হাক্কিকত (বাস্তবতা) বাদ দিয়ে দূরবর্তী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় গ্রহণ আমাদের জন্য উচিত নয়। বর্ণনা বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এর দূরবর্তী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অযথা চেষ্টা করা দুর্বল ঈমানেরই পরিচায়ক।

মনে রাখবেন, আমাদের কাছে কোনো বর্ণনা গ্রহণ করার মানদণ্ড শুধু সেই বর্ণনার সত্যতা ও বিশ্বস্ততাই। তাই কোনো বর্ণনা যখন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে, তখন তা নির্বিধায় মেনে নিতে কোনো সমস্যা নেই। আর এক্ষেত্রে আমাদের বোঝার মানদণ্ড হলো—আরবি ভাষার প্রায়োগিক নিয়মনীতি। বাস্তবতাই হচ্ছে মূল। এখন প্রত্যেক পাঠক বা গবেষকই যদি বাস্তবতা বাদ দিয়ে তার পছন্দসই রূপকার্ণের দিকে ছোটে, তাহলে আরবি ভাষা তার মূল্য হারাবে। মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। সর্বোপরি সে তার আবেদন হারিয়ে ফেলবে।

এত তাবিলের পেছনে ছোট্ট এক বাস্তবতাকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করার অর্থ কী?

এটা কেবল আল্লাহর প্রতি দুর্বল ঈমান, রাসুলের নবুয়তের বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে হয়ে থাকে। অন্যথায় যা বিশ্বস্তভাবে বর্ণিত, তার হিকমত ও ইল্লত, অর্থাৎ তাৎপর্য ও কারণ জানা থাকুক বা না থাকুক, তা সহজেই মেনে নিত।

* * *





শামের প্রথম সফর : জীবিকার প্রয়োজনে কাজ

নবিজির বয়স যখন বারো, তখন তাঁর চাচা আবু তালিব ব্যবসার উদ্দেশ্যে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার সাথে সিরিয়ার রওনা হন। সঙ্গে ভাতিজা মুহাম্মাদকেও নিলেন। কুসরায় (সিরিয়ার একটি শহর) তখন বুহাইরা নামের এক খ্রিস্টান পাদরি বসবাস করতেন। বুহাইরা ছিলেন ইনজিলের আলিম। খ্রিষ্টধর্মের বিষয়ে তিনি ভালো জ্ঞান রাখতেন। কাফেলা সেখানে নেমে যখন বুহাইরার পাশ অতিক্রম করে যাচ্ছিল, তখন তিনি নবিজিকে দেখতে পেলেন। নবিজিকে দেখার পর কিছুক্ষণ তিনি চিন্তা করলেন এবং এরপর এসে নবিজির সাথে কথা বললেন। তারপর তিনি আবু তালিবকে লক্ষ করে জিজ্ঞেস করলেন, এ ছেলে আপনার কী হয়? আবু তালিব জবাব দিলেন—আমার ছেলে।”

বুহাইরা তখন বললেন—না, সে আপনার ছেলে হতে পারে না। (তাঁর পিতা অন্য কেউ; কিন্তু) তিনি জীবিত থাকার কথা না।

: সে আমার ভাতিজা।

: তাঁর বাবা এখন কী করছেন?

: ভাতিজা গর্ভে থাকাক্ষায়ই তিনি মারা গেছেন।

: আপনি সত্য বলেছেন।

আপনি তাঁকে দ্রুত আপনাদের দেশে নিয়ে ফিরে যান। ইহুদিদের পক্ষ থেকে তাঁর ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহর শপথ, ইহুদিরা তাঁকে দেখলে নিশ্চিত তাঁর ক্ষতি



করে বসবে। কারণ, আপনার ভাতিজা ভবিষ্যতে বড়ো কিছু হবে। এ কথা শুনে আবু তালিব ভাতিজা মুহাম্মাদকে নিয়ে দ্রুত মক্কার নিয়ে ফিরলেন।”

শাম থেকে যখন নবিজি ফিরে এলেন, তখন তাঁর যৌবনের শুরু। এ সময় জীবিকার প্রয়োজনে তাঁকে কর্মজীবনে পা রাখতে হয়। তিনি মানুষের ছাগল চরানোর কাজ শুরু করেন। (পরবর্তী সময়ে) নবিজি সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাদ্লাম সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করে বলতেন—“আমি মক্কার মানুষের ছাগল চরানোর কাজ করতাম।”

যুবক বয়সে সাধারণত যেসব রংচটা খেলতামাশা ও বিনোদনে মেতে ওঠে মানুষ, আদ্রাহ সেসব বিষয় থেকে নবিজিকে বিশেষ পন্থতিতে রক্ষা করেন। নবিজি সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাদ্লাম নিজের সম্পর্কে নিজেই বলেন—

আহিলি যুগে যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হতো, এগুলোতে দুইবার ছাড়া আর কখনো অংশ নিইনি; কিন্তু এ দুইবারেও আদ্রাহ তায়াল্লা আমাকে বেঁচে

৬৯ *নিরতে ইবনে হিশাম থেকে সাক্ষিত বর্ণনা। দেখুন—নিরতে ইবনে হিশাম, ১/১৮০; তারিখুত তাখরি, ২/২৮৭; আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকি; আল ফিহর, আবু নুয়াইম।* তবে বিশদ বিবরণে বর্ণনাগুলোর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ইমাম তিরমিযি বিস্তারিতভাবে অন্যদের চেয়ে ডিগ্রি আঙ্গিকে বর্ণনা এনেছেন। ইমাম তিরমিযি এ ব্যাপারে যে বর্ণনাটি এনেছেন, এখানে সম্ভবত কিছুটা সিন (দুর্বলতা) রয়েছে। তিনি নিজেই এ হাদিস বর্ণনা করার পর বলেছেন—

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

এটি একটি হাসান ও গারিব উত্তরের সনদযুক্ত হাদিস। কারণ, এই বর্ণনাটি ছাড়া এর আর কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

এ হাদিসের সনদে আবদুর রহমান ইবনে গাজওয়ান নামে একজন রাবি রয়েছে। *আল বিহানে* তার সম্পর্কে বলা হয়েছে—

তার কিছু রেওয়াজত মুনকার। তার চেয়ে বড়ো কথা হলো, তার বর্ণনার উত্তর সবচেয়ে বেশি মুনকার বা, তা হলো—তিনি ইবনে ইসহাক থেকে (চাচা আবু তালিবের সাথে নবিজির শাম সন্ধানের বিষয়ে) যা বর্ণনা করেছেন, সেটুকু।

ইবনে সাযিদিন নাম তার সম্পর্কে বলেন—

তার মতনে নাকারত রয়েছে (দেখুন—*উনুল আসার* ১/৪০;)। আশ্চর্যের বিষয় হলো, মালিকুজিন আলবানি এ সত্ত্বেও তিনি যে গাজালির ‘ফিকহুস সিরাহ’ কিতাবের তাখরিজ করেছেন, সেখানে বলেছেন—তার সনদ সহিহ। আর ইমাম তিরমিযির তালিকের (হাদিস সম্পর্কে সম্ভব) মধু: هذا

حديث حسن (এটি হাসান সনদের হাদিস) এ অংশটুকু উল্লেখ করেছেন। অথচ তার অভ্যাস হলো, এই মানের হাদিসের চেয়েও বিশ্বাস হাদিসকে জরিক সাব্যস্ত করা। বাহ্যিক, মূল ঘটনাটি শব্দাঙ্গী বিভিন্ন তুল্যক প্রমাণিত।

৭০ এই বর্ণনাটি এসেছে ইমাম বুখারির বর্ণনার *আত-তারিখুল কাবির*-এ। হাদিস নং: ১৩১; এ ছাড়াও এটি *আখবাবু মাঝা সিল কাফিহি*: ১৬৬০; *আল কিতান সি-নুজাইম ইবনি হাযান*: ৫৩৭; *তারিখুত তাবারি*: ৩৯৩; *আল মাতানিসুল আদিয়া সিবনি হাযার*: ৪৩৫৬; *আল মুসতাদরাক আল্লাল সাহিহাইন*: ৭৬৮০; *আল-সুনানুল কুবরা সিল বাইহাকি*: ১৫৯৮০ সহ অসংখ্য কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে।



ফিকহুস সিরাহ

ধাকতে সাহায্য করেছেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা আমাকে নবুয়ত দেওয়া পর্যন্ত আর কখনো এগুলোতে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা করিনি। (নবুয়তের পরে তো অংশ নেওয়ার প্রস্নই আসে না)।

মক্কার উঁচু ভূমিতে আমার সাথে যে ছেলেটা ছাগল চরাত, আমি তাকে একরাতে বললাম, মক্কায় যুবকরা যেভাবে গল্পগুজ্ব করে রাত কাটায়, আমারও সেভাবে গল্পগুজ্ব করে রাত কাটানোর ইচ্ছা ছিল। তুমি যদি আমার ছাগলগুলো একটু দেখতে!

সে বলল—ঠিক আছে, দেখব। আমি গল্পের উদ্দেশ্যে বেরোলাম। যখন মক্কা নগরীর প্রথম ঘরটার কাছে পৌঁছলাম, তখন বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম—এ আওয়াজটা কেন হচ্ছে?

তারা বলল—বিয়ের অনুষ্ঠান তো, তাই। আমিও সেখানে বসে পড়লাম। আল্লাহ তায়ালা তখন আমার কানে মোহর এঁটে দিলেন। (অর্থাৎ আমি এর কিছুই শুনতে পেলাম না।)

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। (পরের দিন) সূর্যের আলোতে আমার ঘুম ভাঙল। এরপর আমি আমার সঙ্গীর নিকট ফিরে এলাম। আমাকে জিজ্ঞেস করলে ব্যাপারটা আমি তাকে খুলে বললাম। পরবর্তী সময়ে আরেক রাতে আমি এ রকম তাকে দেখার দায়িত্ব দিয়ে গেলাম; কিন্তু মক্কায় পৌঁছার পর প্রথম দিনের মতোই অবস্থা হলো। এরপরে আর কখনো আমি এ রকম মন্দ কাজের ইচ্ছা করিনি।

* * *

৭১ ইবনুল আসির বর্ণনাটি এনেছেন। ইমাম হাকিম আলি রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। এ বর্ণনা সম্পর্কে তিনি বলেন—

صحيح علي شرط مسلم

মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটি সহিহ।

তাবারানি আত্মার ইমানে ইয়াসিরের সূত্রে বর্ণনা করেন।



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

পূর্ববর্তী কিতাবে নবির সন্ধান

বর্ণনায়" বুহাইয়ার যে কথা এসেছে, এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—আহলে কিতাবরা (ইহুদি-খ্রিষ্টান) নবিকিকে প্রেরণের কথা জানত। সেই প্রেরিত নবির কী কী আলামত হবে, তাও তারা জানত। তারা এসব জেনেছিল তাদের ধর্মীয় কিতাব তাওরাত ও ইনজিল থেকে। এতে নবিকির প্রেরণ, তাঁর আলামত ইত্যাদির বিবরণ রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রচুর দলিল বিদ্যমান।

এর একটি হলো, সিরাত বিশারদগণের বর্ণনা অনুযায়ী ইহুদিরা নবিকির প্রেরিত হওয়ার পূর্বে আওস ও খাজরাজের বিরুদ্ধে তারা তাঁর ওসিলা দিয়ে সাহায্য চাইত। এবং তারা আওস ও খাজরাজকে বলত—

অচিরেই একজন নবি প্রেরিত হবেন। আমরা তাঁর অনুসরণ করে তাঁর সাথে মিলে আদ-ইরমের মতো তোমাদের হত্যা করব।

কিন্তু নবিকির আগমন হলে তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভাঙা করল। আল্লাহ তারাদা এ ব্যাপারে আয়াত নাজিল করেন—

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ
فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছল, যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন

৭২ এটা ব্যাপকভাবে সিরাত বিশারদগণ সবাই বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযি আবু মুসা আশআরিহ সূরে দীর্ঘ বর্ণনা এনেছেন।



তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের ওপর
আল্লাহর অভিসম্পাত।”

ইমাম কুরতুবিসহ অনেকেই বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা যখন এ আয়াত...

الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّ فَرِيقًا
مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

আমি যাদের কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে
নিজদের পুত্রদের। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনেশুনে
সত্যকে গোপন করে।”

নাজিল করলেন, তখন উমর রা. আবদুল্লাহ ইবনে সালামকে (যিনি কিতাবি ছিলেন।
পরবর্তী সময়ে মুসলিম হয়েছেন।) জিজ্ঞেস করেন—তুমি নিজ সম্ভানকে যতটা
চেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কি ততটা চেন?

তিনি বললেন—হ্যাঁ, বরং আরও বেশি।

আকাশে আল্লাহ তায়ালায় কাছে যিনি বিশ্বস্ত, জমিনে তিনি বিশ্বস্ততার গুণসহ তাঁকে
পাঠিয়েছেন। তাই আমি তাঁকে চিনেছি। তাঁকে আমি এতটাই নিশ্চয়তার সাথে চিনি,
যতটা আমি আমার ছেলের ব্যাপারে (নিজের ছেলে বলে) নিশ্চিত হতে পারি না।
কারণ, আমি নিশ্চিত জানি না, আমার স্ত্রীর অন্য কারও সাথে সম্পর্ক ছিল কি না,
সে তা সাথে কিছু করেছে কি না। একইভাবে সালমান ফারসি রা.-এর ইসলাম
গ্রহণের কারণও ছিল আহলে কিতাবের আলিম-পাদরিদের ইনজিল থেকে নবিজি ও
তাঁর সফাতের ব্যাপারে একের পর এক সংবাদ আসতে থাকা।

তাওরাত ও ইনজিলে নবজির ব্যাপারে এসব বর্ণনা থাকলেও অধিকাংশ আহলে
কিতাবই তা অস্বীকার করেছে। নবজির ব্যাপারে ইহুদিদের জানা এটা তাকে তাদের
অস্বীকারের ক্ষেত্রে বাধা না।



তাওলাত ও ইনজিলের বিকৃতি

আজকালের প্রচলিত ইনজিলগুলোতে নবিজির দিকে ইশারাকারী কোনো বর্ণনা নেই। এখান থেকে পষ্ট বোঝা যায়—এসব কিতাবে কী পরিমাণ রমবদল হয়েছে! আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারিমে তাদের এ ব্যাপারটা তুলে ধরেছেন—

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٍّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা মিথ্যা আকাঙক্ষা ছাড়া আল্লাহর গ্রন্থের কিছুই জানে না। তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই।

قَوْلٍ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ قَوْلٍ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

অতএব, তাদের জন্য আকসোস, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে—এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব, তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্য।

তো, জীবিকার প্রয়োজনে নবিজি যে ছাগল চরিয়েছেন, এখান থেকে বিশেষভাবে আমরা তিনটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি—

এক.

সুউচ্চ রুচি ও তীক্ষ্ণ ইহসাস-অনুভূতি—যে দুটি গুণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে সাজিয়েছিলেন। তাঁর চাচা তাঁর খুব বড় নিতেন। নবিজি চাচার কাছে একজন শিতার ছায়া ও স্নেহ পেয়েছিলেন; কিন্তু নবিজি সাম্রাজ্যহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপার্জনের সক্ষমতা অনুভব করতেই তিনি জীবিকার কাজে নামেন। উপার্জনের চেষ্টা চালিয়ে যান, যেন চাচার ভার কিছুটা কমে যায়।

নবিজির জন্য আল্লাহ তায়ালা জীবিকার যেই কাজ বেছে দিয়েছিলেন, এটা হয়তো তাঁকে যে কাজের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল, এর বিবেচনায় অনেক ক্ষুদ্র, গুরুত্বের



দাবি রাখে না; কিন্তু সবকিছুর পরে এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হলো চরিত্র গঠন। কৃতজ্ঞ বানানো। পরিশ্রমী, বিচক্ষণ, নেতৃত্বশীল আচার ব্যবহারে সং বানানোর পাঠ দেওয়া।

দুই.

এটি এমন জীবনযাপন—যার প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বেশি সন্তুষ্ট। তিনি চান, তার সং বান্দারা এ রকমই জীবনযাপন করুক। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করলেই নবিজির জীবনের শুরুতে তুচ্ছ জীবিকার জন্য ছাগল চরানোর মতো কাজ না করিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন দিতে পারতেন; কিন্তু হিকমতে ইলাহি (আল্লাহ তায়ালায় প্রজ্ঞা) থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই, তা হলো—যে ধনসম্পদ মানুষ নিজ হাতে কামাই করে, সমাজসেবার মধ্য দিয়ে মানুষ যে সম্পদ অর্জন করে, তা উত্তম সম্পদ। আর অনুত্তম সম্পদ হলো, যা কোনো কষ্ট ব্যতিরেকে অর্জন হয়। যেখানে সমাজসেবার কোনো ছাপ থাকে না।

তিন.

যেকোনো একজন দায়ি যখন তার দাওয়াতকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম বানাবে, এর বিনিয়ের হদ হাদিয়া-তোহফা ইত্যাদি গ্রহণ করবে, তখন তার দাওয়াতের কোনো মূল্য থাকবে না। এ কারণে যিনি দায়ি হবেন, তার জীবন ও জীবিকায় হতে হবে স্বনির্ভর। তার ওপর কারও ইহসান বা করুণা থাকবে না। এজন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে কাজ করতে পারেন। জীবনের এ সময়টাতে যদিও নবিজির মনে এসব বিষয়ের উদয় হয়নি।

আর উদয় হবেই বা কীভাবে? তিনি তো জানতেন না, ভবিষ্যতে তার কাঁধে বিশাল নবুয়তের দায়িত্ব আসবে। তাঁকে এ ছাগল চরানোর কাজে জড়ানোতে আল্লাহর হিকমত এটাই। এখান থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন, নবিজির নবুয়তপূর্ব জীবনে এমন কোনো বিষয় না থাকুক, যা তাঁর নবুয়তপরবর্তী জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। নবিজির শৈশব, যৌবনের প্রারম্ভ থেকে নিয়ে সারাজীবন আল্লাহর তাঁকে বিশেষভাবে হিফাজত করা থেকে আমাদের নিকট দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়। দুটোই বেশ গুরুত্বপূর্ণ—

❦ এক. নবিজির মাঝে অন্য দশজন মানুষের মতো মানবিক সব বৈশিষ্ট্যাবলি ছিল। স্বভাবজাত হিসেবে একজন যুবকের মন যেসব বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, নবিজির মনও সেসব বিষয়ে আকৃষ্ট হতো। তিনি গল্পগুজব বা আড্ডা এসব বুঝতেন; এসবে যে উপভোগ রয়েছে, তাও তার বুঝে ছিল।



অন্যরা যেভাবে উপভোগ করে, তাঁরও মন চাইত, তিনি সে রকম উপভোগ করেন।

☞ দুই. স্বভাবজাত এসব বিষয় থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁকে যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে নির্মল রেখেছেন। নবুয়তের শান উপযোগী নয়—এমন সব বিষয় থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এটা তিনি যখন থেকে নবুয়ত ও শরিয়ত পাননি, তখন থেকেই। তার এই সুরক্ষা শরিয়ত লাভের পূর্ব থেকেই ছিল। তিনি তাঁর মনের কামনার সামনে বা তাঁর নবুয়তের শান উপযোগী নয়—এমন ক্ষেত্রে তিনি অদৃশ্য কোনো এক প্রতিবন্ধকতা পেতেন। এটাই ছিল তাঁর জন্য আবশ্যিক। তাঁকে তো তাঁর শরিয়তের কাজ করতে হবে, মাকারিমুল আখলাকের দায়িত্ব পূর্ণ করতে হবে।

এ দুই বাস্তবতা থেকে বোঝা যায়—নবিজিকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে প্রতিপালন করেছেন। তরবিয়ত ও নির্দেশনা ইত্যাদি ওসাইল ছাড়াই তাঁকে হাত ধরে চালিয়েছেন। আর আল্লাহ ছাড়া কে তাঁর চালনা করবে? নির্দেশনা দেবে? কে তাকে সুরক্ষার পথে চালাবে? তার আশপাশের পাড়া-প্রতিবেশী নিজেরাই তো পথহারা!

নবিজিকে আল্লাহর বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণের যে আলোকচ্ছটা তৈরি হয়েছিল, এটা নবিজির জাহিলিয়াতের আঁধার ভাঙার মোক্ষম অস্ত্র। এটা তার নবুয়তের (যে নবুয়তের দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তার সৃষ্টি, সে নবুয়তেরই এটা) অন্যতম নিদর্শন। আর তিনি যেহেতু নবুয়তের মহান দায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন, তাই এসব বিষয়ের মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিত্ব, চিন্তা, জীবন ও ব্যবহার—সবকিছু গঠন করা হয়েছে।

আল্লাহ চাইলে পারতেন নবিজিকে প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত করে জন্ম দিতে। তখন আর তার মন চাইত না, তিনি তার সজ্ঞার ছেলেকে বলে গল্প করতে যাবেন; কিন্তু তখন নবিজি যে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে অন্য সবার চেয়ে ভিন্ন, সেটা প্রকাশ পেত না।

নবিজিকে আল্লাহ তায়ালা এই বিশেষ প্রতিপালনের অন্যতম হিকমত হলো, তাঁর রিসালাতের ব্যাপারে মানুষের ঈমান আনার পথ সহজ ও সুগম করে দেওয়া। তাঁর রিসালাতে যেন কোনো ধরনের সন্দেহ না থাকে।

* * *





খাদিজা রা.-এর মূলধন, নবিজির ব্যবসা ও বিয়ে

খাদিজার সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক

খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ ছিলেন একজন ধনাঢ্য, ব্যবসায়ী, সম্ভ্রান্ত নারী। তিনি তার সম্পদ ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য লোক নিতেন। এবং তাদের সাথে নির্ধারিত বিনিময়ে ‘মুদারাবা’র চুক্তি করতেন।

খাদিজা যখন নবিজির সততা, আমানতদারি ও মহৎ চরিত্রের কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি নবিজির কাছে ব্যবসার প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠালেন। তিনি যেন খাদিজার মূলধন নিয়ে শামে গিয়ে ব্যবসায় শ্রম দেন। বিনিময়ে তিনি তাঁকে

৭৬ ইবনুল আসির ও ইবনে হিশাম বেরনটা বর্ণনা করেছেন।

৭৭ মুদারাবা : (مضاربة) শব্দটি আরবি (ضرب) শব্দমূল হতে উদ্ভূত। আরবি ভাষার শব্দটি প্রহর করা, আঘাত করা, অশেষ করা, দৃষ্টান্ত দেওয়া, পরিব্রমণ করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে শব্দটি পরিব্রমণ করা অর্থে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَأَخْرَجُوا يَظْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَئُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

অন্যরা আল্লাহর অনুগ্রহ সম্বন্ধে পৃথিবীতে ব্রমণ করে। সূরা মুজাম্মিল, আয়াত : ২০

মুদারাবা মূলত ইসলামে বৈধ ব্যবসার একটা প্রকার। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, মুদারাবা এমন একটি অংশীদারি কারবার যেখানে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন এবং অপর পক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করেন। ব্যবসায় লাভ হলে পূর্বচুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষের মাঝে বন্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে তা বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে সবটুকু লোকসান পুঁজিদাতা বহন করলেও মুদারিব তার শ্রম ও তৎপরতার কোনো পারিশ্রমিক না পাওয়াটাই তার লোকসান হিসেবে গণ্য হয়। তবে যদি মুদারিব কর্তৃক নিয়ম লঙ্ঘন, অবহেলা বা চুক্তিভঙ্গের কারণে লোকসান হয়, তাহলে মুদারিবকে লোকসানের দায় বহন করতে হবে।

উল্লেখ্য, মুদারাবা ব্যবসার স্বাভাবিক লোকসান হয়ে পুঁজি কতিপয় হলে প্রথমত পূর্বতন লভ্যাংশ দ্বারা পুঁজির সমন্বয় করা হবে। লভ্যাংশ দ্বারা পুঁজির সমন্বয় না হলে অবশিষ্ট কতি পুঁজিদাতাই বহন করবে। এক্ষেত্রে মুদারিব বা উদ্যোক্তার ওপর এর কোনো দায় আরোপিত হবে না। শারহুল শাখারাহ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৬৩



লভ্যাংশের বড়ো একটা অংশ দেবেন। যে পরিমাণ অংশ তিনি অন্য কাউকে দেননি। তাঁর কাজের সহায়তায় গোলামও সাথে দেবেন।

নবিজি খাদিজার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। খাদিজার মালামাল নিয়ে শামের বাজারে রওনা হলেন। সঙ্গে ছিল খাদিজার গোলাম মাইসারা। শামে গিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। সেবারের ব্যবসা বেশ ভালো হলো। খাদিজার নিকট নবিজি কয়েকগুণ বেশি লাভ তুলে দেন। নবিজি তাঁর নিকট থাকা খাদিজার সব আমানত ফিরিয়ে দেন। মাইসারা নবিজির সফরসঙ্গী হওয়াতে নবিজির উন্নত চরিত্রমাহুরী ও বৈশিষ্ট্য দেখতে পেল ভালোভাবে। এতে সে নবিজির প্রতি ভীষণ রকম মুগ্ধ হলো। আশ্চর্যবিতও হলো। খাদিজার নিকট ফিরে আসার পর নবিজির এসব উন্নত চরিত্রের কথা তার কাছে তুলে ধরল।

খাদিজাও তাঁর আমানতদারির কথা শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। তিনি তাঁর এই বিশাল মুনাফা দেখে কেমন যেন বিস্ময়াভিভূতও হলেন। এরপর তিনি তার বাম্ববী (নাকিসা বিনতু মানিয়াহ)-এর মাধ্যমে নবিজিকে বিয়ের প্রস্তাব দেন।

এ প্রস্তাব শুনে নবিজি চাচাদের সাথে বিষয়টা নিয়ে কথা বললেন। এরপর তারা খাদিজার চাচা আমার ইবনে উসাইদের নিকট নবিজির সাথে খাদিজার বিয়ের প্রস্তাব দেন। নবিজির বয়স তখন পঁচিশ আর খাদিজার বয়স চল্লিশ।

খাদিজার সাথে নবিজির বিবাহ

নবিজির সাথে খাদিজা রা.-এর বিবাহের আগে অন্য দুই স্বামীর সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। তাদের প্রথমজন আতিক ইবনে আরিজ আত-তামিমি। দ্বিতীয়জন আবু হালাহ আত-তামিমি (যার মূল নাম হিন্দ ইবনে জুরারা)।

* * *

৭৮ ইবনে সায়্যিদিনাস তার রচিত *উনুদুল আসার* এক ইবনে হাজার *জাল ইসনা*-তে এটি বর্ণনা করেছেন। অন্যরাও বর্ণনাটি এনেছেন। প্রথম স্বামীর ব্যাপারে মতটুকু রয়েছে। তবে ইবনে সায়্যিদিনাস ‘আতিক ইবনে আরিজ’ (যা কাভালা ও ইবনে ইসহাকের বর্ণনা)-কে প্রাধান্য দিয়েছেন।



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

মুদারাবা চুক্তির কারণ

নবিজি সাদ্দাম্‌হু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজার মূলধন নিয়ে যে মুদারাবা চুক্তি করেছিলেন, তা ছিল জীবন ও জীবিকার তানিদে; যা শুরু হয়েছিল অন্যের ছাগল চরানোর মাধ্যমে। পূর্বে আমরা সাদ্দাম্‌হু তায়লা নবিজিকে এই কাজে লাগানোর যে বিশাল হিকমত রয়েছে, তার কিছুটা উল্লেখ করেছি।

খাদিজা রা.-এর বৈশিষ্ট্য

খাদিজা রা. ছিলেন সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী। নবি-জীবনে খাদিজার বেশ মূল্যায়ন ও কদর ছিল। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সাধারণভাবে তিনি তার যুগের নারীদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

আলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাদ্দাম্‌হু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেন—

মারইয়াম বিনতে ইমরান, তিনি তার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী ছিলেন। আর নবীযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী হলেন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ।

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত—

আমি খাদিজা ছাড়া অন্য কোনো নারীর ওপর ঈর্ষা করিনি। আমি তাকে পাইনি। রাসূল সাদ্দাম্‌হু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বকরি জবাই করতেন, তখন বলতেন—এর গোশত থেকে খাদিজার বাসবীদের নিকট কিছু পাঠাও। আমি একদিন তাঁর (নবিজি সাদ্দাম্‌হু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম)



ওপর রাগ করে ফেললাম। এবং বললাম—শুধু খাদিজা খাদিজা! তখন রাসুল সাদ্লাম্‌হু আলাইহি ওয়া সাদ্লাম বললেন—আমি তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতাম।

ইমাম আহমাদ ও ইমাম তাবারানি দুজনই মাসরুক (বর্ণনাপদ্ধতিতে) বর্ণনা করেছেন, আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত—

নবিজি খাদিজার কথা স্মরণ না করে, তার প্রশংসা না করে ঘর থেকে বের হতেন না। একদিন তার কথা আলোচনা করলে আমি অভিমানে কাঁদতে লাগলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম—তিনি তো ছিলেন একজন বুড়ি! আল্লাহ তায়ালা কি আপনাকে তার চেয়ে উত্তম নারী মিলিয়ে দেননি? (এরপরও আপনি শুধু তারই কথা বলতে থাকেন সব সময়।)

নবিজি তখন রাগ করে ফেললেন। এবং বললেন—না, আল্লাহ তায়ালা আমার জীবনে তার চেয়ে উত্তম নারী দেননি। মানুষ যখন কুফরি করেছে, তখন সে ইমান এনেছে। মানুষ যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তখন সে আমার সত্যায়ন করেছে। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চিত করেছে, তখন সে আমার সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে। তার উদর থেকেই আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেছেন; অন্য কোনো নারী (স্ত্রী) থেকে নয়।

নবিজি কি সোলুশ ছিলেন

নবিজি খাদিজাকে বিয়ে করা থেকে যেই ব্যাপারটি প্রথমে আমাদের বুঝে আসে, তা হলো—নবিজির শারীরিক চাহিদা ও স্ত্রী-সন্তোগের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব ছিল না। তা না হলে অন্য আর দশজন যুবক যা করে তিনিও তাই করতেন। নিজের চেয়ে কমবয়সি, অন্তত সমবয়সি অবশ্যই বিয়ে করতেন।

এখান থেকে আমরা আরও বুঝতে পারি—খাদিজার আভিজাত্য, নিজ বংশমর্যাদা, প্রতিপত্তি, নিষ্কলুষতা—জাহিলি যুগে পর্বন্ত যিনি ‘আকিফাহ’ (সচ্চরিত্রা)—এর গুণে গুণাঙ্কিত ছিলেন, এর কারণে নবিজি তার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

নবিজির সাথে সংসার করাক্ষারই ৬৫ বছর বয়সে খাদিজা রা. যান। নবিজির বয়স তখন ৫০-এর কাছাকাছি। দীর্ঘ এই দাম্পত্যজীবনে নবিজি অন্য কোনো নারী



বা যুবতিকে বিয়ে করার চিন্তা তিনি মাথায় আনেননি। অঞ্চ বিশ থেকে পঞ্চাশ— এই বয়সটাই মানুষের সবচেয়ে পুরুত্বপূর্ণ যৌবনকাল। মানবিক প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে মানুষ তখন একাধিক নারী, একাধিক স্ত্রীর সান্নিধ্য পেতে চায়।

কিন্তু মুহাম্মাদ সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যৌবনের এই দুরন্ত সময়টিতে খাদিজা ছাড়া অন্য কোনো নারীর (স্ত্রী হোক বা সে যুগে প্রচলিত দাসী) কথা চিন্তা করেননি। চাইলেই তিনি বহু স্ত্রী ও দাসীকে নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারতেন। সামাজিকভাবেও এর কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। বহুবিবাহকে জাহিলি সমাজ কিছু মনে করত না। একাধিক বিবাহ ছিল তাদের সমাজে প্রচলিত সাধারণ ব্যাপার।

প্রাচ্যবিদদের মুখে চলেছিলা

খাদিজা রা. কুমারী ছিলেন না। তার বয়সও ছিল নবজির প্রায় দ্বিগুণ। তবুও টগবগে একজন যুবক এই নারীকে বিয়ে করেছেন! এটা ইসলামবিদ্বেষী সম্প্রদায়, খ্রিষ্টান মিশনারি, মুসতামরিকিন (প্রাচ্যবিদ) ও তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ অনুসারীদের প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে শক্তিশালী দলিল।

প্রাচ্যবিদরা ইসলামকে আহত করার লক্ষ্যে, নবজির সুখ্যাতিতে কালিমা লেপন করার জন্য নবজির বিবাহের ব্যাপারটাকে মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। নবজির বিবাহকে বিকৃত প্রচারণার মাধ্যমে তাঁকে প্রবৃত্তির পুজোয় মত্ত, শারীরিক বালনা ও জীবন উপভোগে ডুবন্ত এক মানব হিসেবে উপস্থাপন করে; যা তাঁর নির্মলতার প্রতিবন্ধক, যা তাঁর রিসালাতে কলঙ্ক সৃষ্টি করে।

খ্রিষ্টান মিশনারি ও প্রাচ্যবিদদের বড়ো অংশটাই ইসলামবিদ্বেষী, ইসলামের বিরুদ্ধবাদী, ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনকারী। ইসলামকে কলুষিতকারী, ইসলামের বিরুদ্ধে কালিমালেপন—এটা তাদের অনন্য পেশা; যা তাদের জীবিকা উপার্জনের বিশেষ হাতিয়ার আর যেজন্য তারা প্রচুর শ্রম ব্যয় করে। এটাই বাস্তবতা। আর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের অধিকাংশরাই তাদের অস্থানুসরণে লিপ্ত হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করছে। এই অস্থানুসরণ তাদের প্রকৃতভাবে সত্য অনুসন্ধান এবং সত্যকে বোঝার সুযোগটুকু দিচ্ছে না। ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ এটা মানুষের মাঝে তাদের পরিচিতির প্রতীকী চিহ্ন, যার মাধ্যমে তারা স্পষ্ট বার্তা দেয়—সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার সাথে তাদের ব্যাপক ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। খ্রিষ্টান মিশনারি ও প্রাচ্যবিদরা যেই সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা লালন করে, তারা মানুষকে যার দিকে ডাকে, তারাও এর পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম প্রব্লে তাদের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারটা



(ইসলাম চিন্তা ও গবেষণা) প্রকৃত ও নিরপেক্ষ চিন্তা বা গবেষণার প্রয়োজন নয়; এটা কেবল স্বজ্ঞাতির কাছে নিজেকে তুলে ধরার জন্য।

নবিজির বিয়ে কি নারী সন্তোষ ছিল

নবিজির বিবাহের ব্যাপারটা নিতান্তই সাধারণ। তারা এ ব্যাপারে যেই প্রোপাগান্ডা—প্রবৃতিপূজারি ও নারী সন্তোষে ডুবন্ত মানব বলে প্রচারণা—চালায় আদৌ ব্যাপারটা এ রকম নয়। একজন মুসলিম, যীনকে যে ভালো বোঝে, যে নবিজির সিরাত সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত, তার কাছে বরং নবিজির বিবাহের ব্যাপারটা তাদের বিকৃত প্রচারণার বিরুদ্ধে দলিল। তারা নবিজিকে প্রবৃতিপূজারি ও শারীরিক কামনা-বাসনার প্রতিবিম্ব হিসেবে তুলে ধরে তাঁর চরিত্রে কালিমা লেপন করতে চায়!...

অথচ তারা যেই ব্যাপারে প্রোপাগান্ডা চালায়, স্বয়ং ওই ব্যাপারটাই তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী দলিল। একজন প্রবৃতিপূজারি পঁচিশ বছর পর্যন্ত জাহিলি সমাজে—যেখানে প্রবৃতিপূজার জয়জয়কার, মানবতা যেখানে কামনা-বাসনার গভীরভাবে আচ্ছন্ন, নিজেকে নির্মল রাখবে, ব্যাপারটা বেশ দুর্ভূহ।

একজন কামুক ব্যক্তি জীবনসারাহে প্রায় এসে বাওয়া এক নারীকে জীবনে প্রথমবারের মতো বিয়ে করবে এক বিয়ের পর স্নেহ তার সন্তোষই দিন যাপন করবে; সমাজে অব্যাহত কাম-প্রবৃত্তির উপকরণ ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও ওসব থেকে নিজেকে সংবরণ করে রাখবে—এভাবে নির্গুণভাবে যৌবন পাড়ি দিয়ে পৌড়, এরপর বার্ধক্য পা দেবে—এটা বেশ জটিল।

পরবর্তী সময়ে তিনি যে আরিশা রা.-সহ অন্যান্য নারীকে বিবাহ করেছিলেন, সেগুলো ভিন্ন আলাপ। প্রত্যেকটার ব্যাপারেই আলাদা কথা রয়েছে। ওই বিবাহগুলোর প্রত্যেকটাতাই ‘বিশেষ কারণ ও হিকমত’ রয়েছে; যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে একজন মুসলিমের ইমানকে সুদৃঢ় করে, তার কাছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা, গুরুত্ব ও উন্নত চরিত্র-মাদুরী বাড়িয়ে তোলে। কারণ, ও হিকমত যাচ্ছেক, কথা হলো, বিবাহের মাধ্যমে নবিজির স্নেহ শারীরিক কামনা-বাসনার পেছনে ছোটা—এটা কখনোই ছিল না। তা না হলে প্রবৃত্তির বাসনার মরিয়া হয়ে ওঠার প্রকৃতিগত ঝেঁই সমস্যা, সেই সমস্যেই তিনি তাঁর এই বাসনা পূরণে প্রবৃত্ত হতেন। এক তা মনের সাথ মিলিয়ে করতে পারতেন। কারণ, তিনি তখন সম্পূর্ণ কামেলামুত্ত ছিলেন; প্রবৃত্তির বাসনাপূরণে প্রতিবন্ধক কোনো কাজে (যেমন : দাওয়াত) কাজে তিনি তখন নিমগ্ন ছিলেন না।



বিক্রমস সিরাহ

আমি অন্য আর দশজন গবেষকের মতো ওদের বিকৃত প্রচারণার প্রতিরোধ করে আর আলোচনা দীর্ঘ করতে যাচ্ছি না। আমি নবিজির বিবাহের ব্যাপারটাকে এমন কোনো সংকট—বিরুদ্ধবাদীরা যেটাকে চরম সংকট হিসেবে ভাবে—মনে করছি না, যা আলোচনা পর্যালোচনা, গবেষণার দাবি রাখে। ইসলামের এমন অনেক বিষয় আছে, বিরুদ্ধবাদীরা নিজেরা যেনুলোকে সরাসরি ভ্রান্ত বলতে যায় না; কিন্তু এসব ব্যাপারে তারা মুসলিম উম্মাহকে পরস্পরে (অথবা) আলোচনা-পর্যালোচনা তর্কবিতর্কে ডুবিয়ে রাখে।

* * *





কাবা নির্মাণে নবিজির অংশগ্রহণ

প্রথম ইবাদতগৃহ

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আল্লাহর নাম নেওয়া, তাঁর ইবাদত করা, একত্ববাদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যে ঘর নির্মিত হয়, সেটি কাবা। আবুল আশিয়া (নবিদের পিতা) ইবরাহিম আ. এর নির্মাতা। মূর্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, মূর্তির বেদি, উপাসনালয় গুঁড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর আদেশে তিনি এ ঘর নির্মাণ করেন। কুরআন তাঁর কাজের এই চিত্র তুলে ধরেছে এভাবে—

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٧﴾

স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তাঁরা দু'আ করেছিল—পরওয়ারদিগার, আমাদের থেকে কবুল করেন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ ৷

এরপর কাবা বিভিন্ন সময় নানান দুর্যোগ-দুর্বিপাকের শিকার হয়েছে; যেগুলো তার ভিত্তিকে দুর্বল ও নড়বড়ে করে দিয়েছিল, যেসব দুর্যোগের কারণে দেওয়ালে ফাটল ধরেছিল। এসব দুর্যোগের মধ্য থেকে নবিজির নবুয়ত লাভের অল্প কিছুকাল পূর্বে মকায় যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল, সেটি অন্যতম। এটি কাবার নড়বড়ে ভিত্তিকে আরও নড়বড়ে করে, দেওয়ালের ফাটল আরও বাড়িয়ে দেয়। কুরাইশরা কাবার



তাজিম (জাহিলি আরবদের মাঝে ইবরাহিমি শরিয়তের ছিটেকোটী যা বাকি ছিল, এর মধ্যে কাবার তাজিমও একটি।) ও সম্মানের কারণে কাবাবরের পুনর্নির্মাণ ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা দেখছিল না।

নবিজির অংশগ্রহণ

নবুয়তের আগে নবিজি কুরাইশদের কাবার এই পুনর্নির্মাণকাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি খালি গায়ে (শুধু লুজি পরে) নিজের কাঁধে পাথর বহন করতেন। বিশুদ্ধতম বর্ণনামতে, তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত—

কাবা নির্মাণের সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আব্বাস রা. দুজন পাথর বহন করছিলেন। আব্বাস রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, তুমি তোমার লুজি ঘাড়ে উঠিয়ে রাখো।

(এ কথা বলে আব্বাস তাঁর লুজিতে টান দিলে লুজি কিছুটা খুলে গেলে লজ্জায়) সজ্ঞে সজ্ঞে নবিজি মাটিতে পড়ে গেলেন। এবং আকাশের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এরপর তিনি বললেন, আমার লুজিটা দেন, এরপর তিনি তা পরে নিলেন।

হাজ্জের আসওয়াদ রাখা নিয়ে কুরাইশদের মাঝে যেই ভয়ংকর ঝগড়া বেঁধেছিল, এর সমাধান ও নিরসনে নবিজির বড়ো অবদান ছিল। এ ব্যাপারে তিনি যেই সমাধান বের করেছিলেন, তার সামনে সবাই মাথা নত করেছিল। যেহেতু তিনি আল আমিন, সবার প্রিয়।

* * *

৮২ সহিহ বুখারি: ১৫৮২; সহিহ মুসলিম: ৩৪০। বর্ণনা মুসলিমের। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এই দুজন ছাড়াও ইমাম ইবনে হাজ্বমও এটি বর্ণনা করেছেন।



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

কাবা নির্মাণের সময় নব্বিজির যে ভূমিকার কথা আমরা সংক্ষেপে এখানে জানলাম, সিরাতে নব্বির টুকরো অংশ থেকে আমরা চারটি বিষয়ের পাঠ নেবো—

এক. কাবা নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য

কাবা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে' মর্যাদাপূর্ণ ঘর। এরচেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ ঘর পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। কাবার মর্যাদা বোঝার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহর ইবাদতের জন্য, মানুষের নিরাপত্তার ও আশ্রয়ের জন্য আল্লাহর আদেশে ইবরাহিম আ.-এর মতো মহান নবি তা নির্মাণ করেছেন। তবে এর দ্বারা কাবা স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্মানের অধিকারী—এটি উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তা কেবলই নির্জীব পাথর; যার উপকার বা ক্ষতি কোনো কিছু করায়ই ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাকে সম্মানিত করার কারণে তা সম্মানিত হয়েছে।

তো, যেহেতু আল্লাহ সুবহানাছু ওয়া তায়ালা ইবরাহিম আ.-কে মূর্তি-প্রতিমা, দেব-দেবীর নিখন এক এগুলোর উপাসনালয় নিঃশেষকরণ, স্মৃতিচিহ্নগুলো মুছে ফেলা, প্রতিমাপূজা থেকে বারণের মিশন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাই আল্লাহর হিকমতের দাবি ছিল—এই ভূপৃষ্ঠে ওইসব তাগুতি নিদর্শনের পরিবর্তে আল্লাহর একত্ববাদ ও কেবল তাঁরই ইবাদতের নিদর্শন-প্রতিবিম্ব দাঁড় করানো; যেটা যুগ যুগ ধরে একত্ববাদের নিদর্শন হয়ে থাকবে।

দীর্ঘকাল মানবতা ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির যেই অতল গহ্বরে রয়েছে, যেই প্রতিমা ও পাথরপূজা করেছে, প্রতিমাদের জন্য যেসব উপাসনালয় গড়েছে, কাবা নির্মাণ তার পরিবর্তন ঘটাবে। মূর্তি আর প্রতিমাপূজার অসারতা প্রকাশিত হবে। ওইসব দেব-দেবীর উপাসনালয়ের ওপর তাওহীদের নতুন এই নিদর্শন—কাবা প্রভাব বিস্তার



করতে সক্ষম হবে। কাবা হবে ইবাদতের বিশেষ একটি স্থান। মানুষ এখানে এসে আত্মিক শক্তি—আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সামনে মাথা না ঝোঁকানো—লাভ করবে।

আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী মুমিনদের ঐক্যের একটা প্রতীকী চিহ্ন থাকা নিতান্ত প্রয়োজন; যেটা হবে দেশ-কাল ভাষা বর্ণ যা-ই হোক—সবার মিলনমেলার স্থান; আন্তর্জাতিক মিলনস্থল। এটাই হবে সেই মিলনস্থল, যার ছায়াতলে সত্যের সঙ্গো তারা পরিচিত হবে। যেই ঘর হবে পৃথিবীর পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে, আল্লাহর একত্ববাদ ও ইবাদতের নিদর্শন। আর নিচের আয়াতটির বক্তব্যও তা-ই—

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وَعِزَّةً لَّنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَرَ بَيْنِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٧٧﴾

আর স্মরণ করেন, যখন আমি কাবাগৃহকে যেহেতু মানুষের জন্য সম্মিলন-স্থল ও শান্তির আলয় করলাম। আর তোমরা ইবরাহিমের দাঁড়ানোর জায়গাকে সালাতের জায়গা বানাও। আমি ইবরাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করলাম—তোমরা আমার গৃহকে তাওরাতকারী, অবস্থানকারী ও বুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো।-

বান্দা যখন তার ভেতরে উবুদিয়াহ (আল্লাহ দাসত্বের অনুভব) এবং তার বাস্তবায়ন করা, বাধ্যগত একজন বান্দা হিসেবে তার আদেশ নিষেধ মান্য করার তীব্র তাড়না নিয়ে কাবায় ছুটে যায়, বাইতুল্লাহকে তাওরাত করে, তখন সে গভীরভাবে তা অনুভব করে। বাইতুল্লাহ যখন এত কিছু সম্মিলনকেন্দ্র, তাই আমরা বাইতুল্লাহর তাজ্জিম করি, সম্মান করি, বাইতুল্লাহ হজ্ব করতে যাই, তার চারপাশে তাওরাত করি।

৮৩ সত্য দ্বারা উদ্দেশ্য তাওহিদ ও একত্ববাদ, যা প্রকাশ ও প্রচারের জন্য এই কবের নির্মাণ।

৮৪ সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৫



দুই. কবর নির্মাণ ও নিশ্চিহ্নের ইতিবৃত্ত

পৃথিবীর শুরুর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত চারবার কাবাঘর নির্মাণ করা হয়েছে। চারবারের ব্যাপারটাই নিশ্চিত; এর আগে-পরে নির্মাণের ব্যাপারে যেসব বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোতে মতানৈক্য আছে এক সেগুলো নিশ্চিতও না।

প্রথমবার : প্রথমবার আব্রাহাম পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে ইবরাহিম আ. নির্মাণ করেন। তাঁর ছেলে ইসমাইল আ. তাঁকে এই মহৎ কাজে সহযোগিতা করেন। এ ব্যাপারটি কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসসমূহে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। কুরআনে কারিমের ইরশাদ—

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٧﴾

স্মরণ করেন, যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন। তাঁরা দু'আ করেছিলেন—পরওয়ারদিগার, আমাদের থেকে কবুল করেন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।

এ ব্যাপারে প্রচুর হাদিস রয়েছে। এর মধ্যে ইমাম বুখারি নিজস্ব সনদে ইবনে আব্বাস রা. থেকে একটি বর্ণনা এনেছেন। হাদিসের বর্ণনা এ রকম—

‘...এরপর ইবরাহিম আ. বললেন—ইসমাইল, আব্রাহাম তায়ালা আমাকে একটি ব্যাপারে আদেশ করেছেন।

তিনি উত্তরে বলেন—আপনার রব আপনাকে যেই ব্যাপারে আদেশ করেছেন, তা পালন করেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

তিনি বললেন—হ্যাঁ, সাহায্য করব।

তিনি বললেন—আব্রাহাম তায়ালা আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে আদেশ করেছেন। এ বলে তিনি আশপাশে থাকা উঁচু উঁচু টিলার দিকে ইশারা করলেন। (অর্থাৎ সেখান থেকে পাথর ইত্যাদি সংগ্রহ করতে বলেন।) এরপর ইবনে আব্বাস বলেন—তখনই দু'জন মিলে কাবাঘরের



ভিত্তি নির্মাণ করেন। ইসমাইল আ. পাথর নিয়ে আসতেন, আর ইবরাহিম আ. তা নির্মাণের কাজে লাগাতেন..।’”

জান্নাকশি রহ. আঙ্করুকি রচিত *তারিখু মাঝাহ* গ্রন্থ থেকে বর্ণনা এনেছেন—

ইবরাহিম আ. কাবার নির্মাণের সময় তার গঠনটা (দেওয়াল) এভাবে রাখেন—দৈর্ঘ্যে, ওপরের (আসমান) দিকে সাত গজ এবং নিচের দিকে অর্ধাং জমিনের ওপর ত্রিশ গজ। আর প্রস্থে, নিচের দিকে (জমিনের ওপর) বাইশ গজ। তখন কাবা ছিল ছাদবিহীন।”

সুহাইলির বর্ণনামতে—

কাবার ওপরের (আসমান) দিকে দৈর্ঘ্য ছিল নয় গজ।”

এই বর্ণনাটি আঙ্করুকির রেওয়াজাতের খুব কাছাকাছি।

ঐতিহ্যবাহী : নবিকির নবুয়তের পূর্বে কুরাইশ কাকিররা নির্মাণ করেছে। স্বয়ং নবিকির সাদ্দাদ্দাহু আল্লাইহি ওয়া সাদ্দাম তাতে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। এই নির্মাণের সময় তারা ওপরের দিকে (আসমান) দৈর্ঘ্যে ১৮ হাত রাখে। আর নিচের দিকের (জমিনের ওপর) দৈর্ঘ্য হতে তারা আগের চেয়ে ছয় গজের কিছু বেশি কমিয়ে আনে।”

তাদের এই হ্রাসকরণের ব্যাপারে রাসূল সাদ্দাদ্দাহু আল্লাইহি ওয়া সাদ্দাম হাদিসেও বলেছেন। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত—

রাসূল সাদ্দাদ্দাহু আল্লাইহি ওয়া সাদ্দাম কাবার ছুটে যাওয়া অংশকে এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলতেন—আয়িশা, তোমার সম্প্রদায় মাত্র জাহিলি যুগ পাড়ি দিয়ে এসেছে; যদি এমন না হতো (অর্থাৎ তারা যদি নওম্মুসলিম না হতো), তাহলে আমি কাবাবর ভেঙে তা পুনর্নির্মাণের সময় তার ছুটে যাওয়া অংশ (যা কুরাইশদের নির্মাণের সময় ছুটে গিয়েছিল) কাবার অন্তর্ভুক্ত করে নিতাম। এবং তাকে জমিনের সঙ্গে যুক্ত করে দিতাম। এবং এতে পূর্ব দিকে একটি দরজা এবং

৮৬ সহিহ বুখারি : কিতাবু আযযিসিল আযযিরা

৮৭ ই’লামুস সাঙ্কি, জারকানি : ৪৬

৮৮ উম্মুল আসার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫২

৮৯ সহিহ বুখারি : কিতাবুল হাজ্জ; দেখুন, ই’লামুস সাঙ্কি, জারকানি : ৪৬



পশ্চিম দিকে একটি দরজা রাখতাম। ফলে ইবরাহিম আ. নির্মিত কাবার
আদলে ফিরে যেত ৮

তৃতীয়বার : ইয়াজ্জিদ ইবনে মুয়াবিয়ার শাসনকালে—যখন তার সৈন্যরা শাম থেকে
যুদ্ধ করতে এসেছিল—কাবাবর ছাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৩৬ হিজরির শেষের
দিকে ইয়াজ্জিদের আদেশে তার বাহিনী হুসাইন ইবনে নামির আস-সাকুনির নেতৃত্বে
মকায় ইবনে জুবাইরকে অবরোধ করে রাখে। তারা বাইতুল্লাহর সীমানায়
'মিনজানিক' (ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ) ব্যবহার করলে তার আঘাতে কাবাবরে আগুন
লেগে যায় এবং তার অনেকটা ক্ষতি হয়।

ইবনে জুবাইর হজ্জের মৌসুমে অপেক্ষা করছিলেন। হজ্জের মৌসুমে মানুষ এলে তিনি
তাদের সাথে পরামর্শে বসেন। তিনি বলেন—হে লোকসকল, তোমরা কাবার
ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও। আমি চাচ্ছি, এটা ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করব
অথবা আগেরটাই রেখে তার সংস্কার করব। ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আমি যেটা
ভালো মনে করি, তা হলো আপনি একেই সংস্কার করেন। মানুষ কাবার যেই গঠন,
ও পাথরের ওপর ইসলাম গ্রহণ করেছে, সেটাই বহাল থাকুক। ইবনে জুবাইর
বললেন—তোমাদের কারও ঘর পুড়ে গেলে ওইটাকে সে পোড়াবস্থায় দেখতে চায়
না; বরং সে তা সংস্কারের চেষ্টা করে, তাহলে তোমাদের রবের ঘরের ব্যাপারে
নির্লিপ্তভাবে বসে থাকছ? আমি আমার রবের নিকট তিনবার ইস্তেখারা করেছি।
এরপর আমি আমার সিঁচ্ছাতে (নতুন করে নির্মাণ) উপনীত হয়েছি।

এর তিন দিন পর সত্যি সত্যিই ভাঙার কাজ শুরু হলো। তারা পুরোটা ভেঙে মাটি
পর্যন্ত মিশ্রে শৌছিলেন। ইবনে জুবাইর তার চারপাশে কয়েকটি খুঁটি বসালেন। এবং
এর ওপর পর্দা টেনে দিলেন। এরপর দেওয়াল উঁচু করার কাজে নামলেন।
(কুরাইশদের নির্মাণের সময়) ছুটে যাওয়া সেই ছয় গজকেও এর অন্তর্ভুক্ত করলেন।
ওপরের দিকের দৈর্ঘ্য দশ গজ বানালেন। কাবার দুটি দরজা রাখলেন, একটি দিয়ে
চুকবে, আরেকটি দিয়ে বের হবে। তার এই সম্প্রসারণের পেছনে মূলত আরিশা রা.
থেকে বর্ণিত পূর্বের হাদিসের বর্ণনাটি উৎসাহ জুনিরেছিল ৮

১০ সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, শবচরন বুখারি।

১১ কোনো ব্যাপারে আল্লাহ তারালার পক্ষ থেকে ভালো-মন্দ নির্ণয়ের বিশেষ সাক্ষ্য।

১২ বিস্তারিত দেখুন—উম্মুল আসার, ইবনে সাযিদিনাস, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৩; ই'ল্লামুস সাহিহ, জারকানি : ৪৬;
সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৯; তারিমুত তাবারি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৯৮; তাবারি প্রমুখের বর্ণনার অর্থে—
কাবা শরিককে তার পাশে ছালাতো আগুনের অগ্নি-বুলিশ দিয়ে ছাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়।



চতুর্থবার : ইবনে জুবাইরের হত্যার পর। ইমাম মুসলিম নিজস্ব সনদে আতা থেকে বর্ণনা করেন—

ইবনে জুবাইরকে যখন হত্যা করা হলো, তখন হাজ্জাজ আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নিকট এ সংবাদ জানিয়ে চিঠি লিখল এবং ইবনে জুবাইর (কুরাইশদের প্রাচীন গঠন থেকে সরে গিয়ে) যেই কাঠামোতে—যেটা মক্কার গ্রন্থযোগ্য লোকদের কাছে স্বীকৃত—নির্মাণ করেছেন, সেটা জানাল। আবদুল মালিক তার উত্তরে লিখে পাঠাল—

আমরা ইবনে জুবাইরকে কোনো কিছুতে কলুষিত করতে চাই না, এতে তার ব্যক্তিগত কোনো অভিলাষ ছিল না। সুতরাং তিনি দৈর্ঘ্যে বা বাড়িয়েছেন, তা ভেঙে প্রাচীন কাঠামোতে ফিরিয়ে নেবেন। এবং তার খুলে দেওয়া অতিরিক্ত দরজা বন্ধ করে দেবেন। এ আদেশের পর হাজ্জাজ তা ভেঙে দেন এবং মূল কাঠামোতে ফিরিয়ে দেন ৮

ইতিহাসবিদরা বলেন—খলিফা হাবসুন্ন রশিদ তার শাসনকালে কাবাঘর ভেঙে ইবনে জুবাইরের আদলে ফিরিয়ে আনার দৃঢ় সংকল্প করেন। তখন মালিক ইবনে আনাস রা. তাকে বলেন, ‘আমিবুল মুমিনিন, আল্লাহর শপথ, আপনি এই ঘরটিকে আপনার পরবর্তী খলিফাদের জন্য খেলার বন্ধু বানাবেন না। একজন এসে আরেকজনেরটা শুধু পরিবর্তন করতে থাকবে। এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে কাবার যে তাজিম, ভয়ভীতি ও শ্রদ্ধা আছে, তা উঠে যাবে। এ কথা বলে ইমাম মালিক রহ. খলিফাকে তার মনোবাঞ্ছা থেকে ফিরিয়ে রাখেন ৮

মূলত কে নির্মাণ করেছিলেন কাবা

এ তো গেল কাবাঘর চারবার নির্মাণের ইতিবৃত্ত। এই চারবারের ইতিহাসটুকু নিশ্চিত বলা যায়। পঞ্চমবার নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে —

ইবরাহিম আ.-এর নির্মাণের পূর্বে কি কখনো কাবাকে নির্মাণ করা হয়েছে? কিছু রেওয়াজাত ও আসারে আছে—সর্বপ্রথম যিনি কাবাঘর নির্মাণ করেন, তিনি আদম আ.। কোনো বর্ণনামতে, সর্বপ্রথম শিস আ. কাবাঘর নির্মাণ করেন।

১৩ সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৯

১৪ কাবাঘর ভেঙে কে পুনর্নির্মাণের ইচ্ছা করেছিল, এ নিয়ে তিন তিন বর্ণনা আছে। শামসুন্না নাসাবি ও ফতহুল বারিহি আছে, খলিফা হাবসুন্ন রশিদ। এনিকে উম্মুল আসার ও ইসামুস সাফিহে আছে, আবু জাফর আল মানসুর। ইমাম মালিক দুজনেরই সামসময়িক। সুতরাং উভয়ের সম্ভাবনাই বিদ্যমান।



এ ব্যাপারে যতগুলো বর্ণনা আছে, এগুলোর মাঝে সবচেয়ে স্পষ্ট রেওয়ার্ডাত ইম্রম বাইহাকি যেটি *দালাইলুন নুবুওওয়াহ*-তে এনেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রাসূল সাদ্লামাহু আল্লাইহি ওয়া সাদ্লাম বলেছেন—

আল্লাহ তারালা জিবরাইল আ.-কে আদম আ. ও হাওয়া আ. দুজনের নিকট পাঠিয়ে বললেন—তোমরা দুজন আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে। জিবরাইল আ. তাদের ঘরের সীমানা ঐকে দিলেন। আদম আ. মাটি খুঁড়তেন, হাওয়া আ. তা কেলে আসতেন। এভাবে একসময় পানি এসে গেল। পানির নিচ থেকে আওয়ারু ভেসে এলো, আদম, যথেষ্ট হয়েছে। তাদের নির্মাণকাজ শেষ হয়ে এলে আল্লাহ তারালা ওহির মাধ্যমে তাঁকে তাওয়ারু করার আদেশ দিলেন।

তাঁকে বলা হলো—আপনি প্রথম মানুষ, আর এটা প্রথম ঘর। তার পর বহুকাল কেটে গেল। এরপর নূহ আ. হজ্জ করলেন। এরপর বহুকাল কেটে গেল, ইবরাহিম আ. এসে এর ভীতসমূহ উঁচু করলেন।

এরপর বাইহাকি বলেন—ইবনে লাহিআ একাই ‘মারকু’ বর্ণনা করেছেন। আর এটা জনা কথা যে, ইবনে লাহিআ দুর্বল রাবি। তার বর্ণনা দলিল হয় না। এ ছাড়াও আরও বিভিন্ন আসার ও বর্ণনা রয়েছে, যেগুলো বাইহাকির বর্ণনার প্রায় কাছাকাছি। তবে ওসব রেওয়ার্ডাতও ‘দুর্বলতা’ বা ‘নাকারাত’ থেকে মুক্ত নয়।

আমরা যদি এসব দুর্বল বর্ণনাগুলোকে মেনে নিই, তাহলে বলতে হবে—পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মোট পাঁচবার কাবার নির্মাণকাজ করা হয়েছে।

তবে প্রথম আমরা যা বলেছি, অর্থাৎ চারবার—এটাই সুনিশ্চিত। বাকি সব আমরা আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করব। এ ছাড়া আরও যেসব বর্ণনার কথা পাওয়া যায়, সেগুলো মূলত কাবার মেরামত ইত্যাদি প্রসঙ্গে।

তিন. নবিজির বিচ্ছিন্নতা ও পরিচালনার বোধ্যতা

এখানে আমরা নবিজির কার্যপরিচালনার দক্ষতা, সংকট সমাধানের ব্যাপারে চমৎকার মূলনীতি, বিবাদ নিরসনের অপূর্ব দক্ষতার ব্যাপারে জানতে পারি। তিনি এমন জাতির বিশাল সংকট নিরসন করেছেন, যাদের সংকটটা রক্তারক্তির পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। বনু আবদুদ দার রক্তভর্তি পাত্র নিয়ে এলো। এরপর তারা এক বনু আদি সবাই নিজেদের হাত সেই রক্তে চুবিয়ে মৃত্যুর শপথ নিল। এই অবস্থায় কুরাইশরা



চার বা পাঁচ রাত কাটায়। কারও কোনো কথা বা প্রচেষ্টা তাদের দমানোর মতো ছিল না। অবশেষে সেই ফিতনার ভয়ংকর আগুন এসে নিভে যায় নবিজি সাদ্লামাহু আল্লাইহি ওয়া সাদ্লামের হাতে; কিন্তু এটা তাঁকে মূল্যায়নের মূল মানদণ্ড নয়। আমাদের উচিত, নবিজিকে বিচক্ষণতার মানদণ্ডে মূল্যায়ন করার আগে, আদ্রাহ তাঁকে রিসালাতের যেই মহান দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই মানদণ্ডে বিচার করা।

নবিজিকে মূল্যায়নের প্রথম ভিত্তি হলো, তিনি একজন নবি ও রাসুল। আর অন্য বৈশিষ্ট্যগুলো—পরিচালনা দক্ষতা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি—এগুলো প্রাসঙ্গিক। এগুলো মূলভিত্তির সাথে এসে যুক্ত হবে।

চর. নবিজির অবস্থান

কুরাইশদের বিভিন্ন স্তর থাকা সত্ত্বেও তাদের সকলের মাঝে তাঁর উচ্চ অবস্থান। তাদের মাঝে তিনি ‘আল আমিন’ নামে সুবিখ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন সবার প্রিয়। তিনি কথা বললে তার সত্যতায় কেউ সন্দেহ করত না। কারও সাথে লেনদেন করলে এ ব্যাপারে তাঁর উন্নত চরিত্র নিয়ে কারও সন্দেহ হতো না।

যখন তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া হতো, তাঁর ওপর কোনো ব্যাপারে ভরসা করা হতো, তখন সে বিষয়ে তাঁর উচ্চমার্গের ইখলাসে এবং নিঃস্বার্থ কাজে তাদের কারও সন্দেহ হতো না। মনে রাখতে হবে, তার মর্যাদাপূর্ণ এই অবস্থানটা ছিল সেইসব লোকেদের কাছেই, নবুয়ত লাভের পর যাদের অন্তর বিদ্রোহ ও শত্রুতায় হয়ে গিয়েছিল ভরপুর।

* * *





হেরা গুহায় নির্জনবাস

নবিজির নির্জনবাস

নবিজি সাদ্লামুহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন চম্রিশে পা দিয়েছেন, বিভিন্ন সময় তখন তাঁর জনবিচ্ছিন্ন থাকা এবং নির্জন সময় কাটানোটা অভ্যাসে পরিণত হলো। হেরা গুহায় (মক্কার পূর্ব উত্তরে অবস্থিত) নির্জন সময় কাটাতে তিনি ভালোবাসতেন। টানা কয়েক রাত ও কয়েক দিন সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালায় ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন।

নির্জনবাসের সময়

নবিজির নির্জনবাসের সেই সময়টা কখনো দশ দিনের হতো, আবার কখনো দশ দিনের বেশি; যা এক মাস পর্যন্ত গড়াত। এরপর তিনি বাড়িতে ফিরে আসতেন। বাড়ি এসে খুব অল্প সময়ই অবস্থান করতেন। এরপর আগামী কয়েক দিনের পাথৈয় নিয়ে আবার হেরা গুহায় চলে যেতেন। হেরা গুহায় কাটানো তাঁর নির্জন মুহূর্তগুলোর কোনো এক মুহূর্তেই তাঁর নিকট ওহি (প্রত্যাদেশ) আসে।

* * *



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

জান-নির্জনতা : মুহাসাবার অন্যতম উপায়

নবিজির এই নির্জন প্রিয়তা অনেক ভাবনার ব্যাপার। সাধারণভাবে মুসলিম উম্মাহ, বিশেষত দায়িদের জীবনে এই নির্জনতার বিশেষ প্রয়োজন ও গুরুত্ব রয়েছে। নবিজির নির্জনপ্রিয়তা থেকে আমরা বুঝতে পারি—ব্যক্তির যতই মর্যাদা থাকুক, কৃষ্টির ইবাদতের পরিধি যতই বিশাল হোক, পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হওয়ার জন্য তার নির্জনতার প্রয়োজন রয়েছে। যাতে সে ‘মুহাসাবাতুন নাকস’ (নিজের হিসাব) করবে। আল্লাহর ধ্যানে বসবে, সৃষ্টিজগৎ নিয়ে ভাববে, আল্লাহর মহিমা নিয়ে ভাববে। পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হতে এটা যেকোনো মুসলিমেরই প্রয়োজন। সুতরাং যারা দায়ি ইল্লাহ, যারা আল্লাহর পথে মানুষকে পথপ্রদর্শন করবে, তাদের কতটা প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য।

মানুষের মানসিক এমন কিছু ব্যাধি আছে, যা থেকে নিরাময়ের একমাত্র উপায় নির্জনতা; বাস্তব দুনিয়া থেকে কিছুটা দূরে সরে ‘মুহাসাবাতুন নাকস’—এ প্রবৃত্তি থাকা। অহংকার, আত্মগরিমা, হিংসা, রিয়া, দুনিয়ার মহক্কত—সবগুলোই এমন ভয়ানক ব্যাধি, যা মানুষের হৃদয়মনের গহিনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অভ্যন্তরীণ এই ব্যাধিগুলো, বাহ্যিকভাবে ঈমানে-আমলে সুশোভিত হওয়া সত্ত্বেও, এমনকি দাওয়াতের মহৎ কাজে নিমগ্ন হওয়া সত্ত্বেও, মানুষের ভেতরকে ঝাঁঝরা করে ফেলে। এই কঠিন ব্যাধিগুলো থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো, ব্যক্তি সময়ে সময়ে নির্জনতার আশ্রয় নিয়ে নিজের হিসাব নিজেই করবে। তার হাকিকত (প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান), তার অস্তিত্বদানকারী সত্তা, যাপিত জীবনে আল্লাহর সাহায্য তাঁর কতটা প্রয়োজন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর তাওফিকের কতটা দরকার—এসব বিষয়ে সে ভাববে। এরপর মানুষকে নিয়ে সে ভাবতে বসবে—সৃষ্টিকর্তার সামনে মানুষ কতটা দুর্বল, মানুষের প্রশংসা বা নিন্দার স্বয়ংসম্পূর্ণ



কোনো ক্রমতা না থাকা—এইসব ব্যাপারে সে ভাববে। আল্লাহর বড়োত্ব ও মহত্ত্ব নিয়ে ভাববে, আশ্বিনাত, বিচার দিবস, আল্লাহর বিশাল রহমত ও কঠিন শাস্তির কথা ভাববে। এভাবে যখন সে ভাবনায় নিমগ্ন থাকবে, তখন ওইসব ব্যাধি থেকে তার হৃদয়-মন আপনিই সেরে উঠবে। অন্তর মারিকাতের আলো, ইমানের স্বচ্ছ নুরে আলোকিত হবে। অন্তর নতুন যবনিকা পাবে।

সাধারণভাবে মুসলিম উম্মাহর জীবনে বিশেষকভাবে দাস্তিদের জীবনে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হৃদয়ে; যে হৃদয় মুজাহাদা (অবিশ্রান্ত পরিশ্রম) ও উৎসর্গের উৎস আল্লাহপ্রেমের পরিচর্যা করা। স্রেফ যুক্তিসংগত ইমানের মাধ্যমে আল্লাহর প্রেমে হৃদয় সিক্তিত হয় না। স্রেফ যুক্তি বিবেচনার বিপরীতভাবে কোরআন মিনও অন্তরে রেখাপাত করে না। যদি এমনই হতো, তাহলে মুসতাহরিকরা (প্রাচ্যবিদ) সবচেয়ে বড়ো ইমানদার ও মুমিন হতো। তাদের অন্তর আল্লাহ রাসুলকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত।

অথবা আমরা কখনো এমন কিছু একটা শুনতাম, কোনো গণিতবিদ গণিতের কোনো সূত্রে বিশ্বাস রাখার কারণে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। কখনো এমন হয়েছে? আল্লাহর প্রতি ইমান আনার পর হৃদয়ে তাঁর প্রেম-পরিচর্যার সবচেয়ে বড়ো উপায় হলো—আল্লাহর সিয়ামত ও সৃষ্টিসজ্জা নিয়ে চিন্তা করা, তাঁর বড়োত্ব ও মহত্ত্ব নিয়ে ভাবা। মুখে ও অন্তরে আল্লাহর বেশি বেশি জিকির করা। অস্তর এই সবগুলো তখনই সম্ভব হবে, যখন সে নির্জনতার আশ্রয় নেবে। সময়ে সময়ে কর্মব্যস্ত দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরালস্য কাটাবে।

একজন মুসলিম নির্জনে বসে যখন আল্লাহপ্রেমের এই কাজগুলো করবে, এগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করবে, তখন তার অন্তরে প্রভুপ্রেমের স্রোত বয়ে চলবে। যার সামনে অন্য সব বড়োত্বকে নিতান্ত ছোটো মনে হবে। প্রত্যেক চিন্তাকর্ষক বস্তুকে তুচ্ছ মনে হবে। সেই প্রেমের জন্য নিদারুণ কষ্ট ও কঠিন শাস্তিকে তার কাছে নিতান্ত হালকা মনে হবে। সেই প্রেমের জন্য ঠাণ্ডা-তামাশা, লাঞ্ছনাকে সে পাত্তা দেবে না। আর এই প্রেম এই ভালোবাসা এমন এক সাজ, প্রত্যেক দাস্তিকেই যেই সাজে সজ্জিত হওয়া উচিত। এটাই সেই সাজ, যা যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৯৫ অখচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ তার বিপরীত। তাদের প্রচুর পড়াশোনা, ইমান সম্পর্কে তাদের বিশাল জ্ঞান সত্ত্বেও তাদের হৃদয়ে ইমান প্রতিষ্ঠা হয় না, আল্লাহ রাসুলের প্রতি ভালোবাসার স্টিমকেটাও তাদের ভেতরে থাকে না।



ওয়া সাল্লামকে সজ্জিত করা হয়েছিল। যার ফলে তিনি ইসলামের দাওয়াতের নিদারুণ কষ্ট সহজে সহ্যেতে পেরেছিলেন।

ভয়, আশা, ভালোবাসা—এ ধরনের মানবিক আবেগ-অনুভূতিগুলো খুবই শক্তিশালী। এগুলোর মাধ্যমে অনেকসময় এমন কাজ হয়, যা শ্রেফ চিন্তা ও বোধের মাধ্যমে হয় না। ইমাম শাতেবি সাধারণ মুসলিম ও বিশেষ মুসলিমদের আবেগ-অনুভূতির পার্থক্য করে চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন—

প্রথম প্রকারের অবস্থা হলো, যারা শ্রেফ ইসলাম ও ইমানের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমল করে। দ্বিতীয় প্রকারের অবস্থা হলো যারা ভয়, আশা, ভালোবাসা—এগুলোর তাড়নায় আমল করে। ভয় হলো চালনাকারী এক চাবুক। আশা কঠিন এক চালিকাশক্তি। ভালোবাসা বিশাল একটি শ্রোত। ভয়কারী ব্যক্তি কষ্ট সত্ত্বেও আমল করে।

ভয় (যা বেশি কষ্টকর) জিনিসটা ধৈর্য (যা কম কষ্টকর) ধারণে সহায়তা করে। আশাবাদীও কষ্ট সত্ত্বে আমল করে। আশা (যার পুরোটাই সুখের) ধৈর্য (যার পুরোটাই কষ্টের) ধারণে সাহায্য করে। আর প্রেমিক প্রিয় জিনিসের তরে তার সর্বোচ্চটুকু বিসর্জন দিতে কসুর করে না। তার প্রিয় বস্তুটির জন্য কঠিন বিষয়কেও সে সহজ মনে করে। দূরবর্তী বিষয়কেও সে নিকটবর্তী মনে করে। নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েও সে ভাবে— ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারছে না। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারছে না ৮

মানসিক এসব শক্তি অর্জনের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সবাই স্বীকার করেন। জুমহুর আলিম ও গবেষকদের নিকট এটা ‘তাসাওউফ’ (আত্মশুদ্ধি) নামে পরিচিত। কেউ কেউ এটাকে বলেন, ‘ইহসান’। আবার ইবনে তাইমিয়ার মতো অনেকে এটাকে ‘ইলমুস সুলুক’ বলে থাকেন ৮

৯৬ আল মুওয়াফফাত, ইমাম শাতেবি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪১; আরও দেখুন—যাওয়ারবিহুল মাসালাহা কিশ শারিরাতিল ইসলামিয়াহ, সাদিদ রামাদান বুতি : ১১১-১২২

৯৭ বিস্তারিত জানতে দেখুন—ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, খণ্ড ১০; ইবনে তাইমিয়ার নিকট তাসাউফের বাস্তবিক মর্যাদা কেমন ছিল, তা পাবেন এখানে। আপনি আরও জানতে পারবেন তাসাউফবিরোধীরা নিজেদের স্বার্থে তাসাউফের ক্ষেত্রে ইবনে তাইমিয়ার নামে কী পরিমাণ মিথ্যা রটিয়েছে!

নবরত লাভের কিছুকাল পূর্বে নবিজি বেই নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন, এটি সেসব মাধ্যমেরই একটি। তবে এই নির্জনতা ছাড়া সম্পূর্ণ দুনিয়াবিমুখ নির্জনতা—কেউ কেউ যেমনটা বুঝেছেন—উদ্দেশ্য নয়। লোকজন থেকে একদম কেটে পড়া, পাহাড়-পর্বত-গুহাকে নিজের আশ্রয়স্থল বানিয়ে নেওয়া উদ্দেশ্যে নয়; বরং এটা নবিজি সম্রাজ্যে অলাইছি ওয়া সাম্রাজ্য ও তাঁর আদর্শের বিপরীত। উদ্দেশ্য, নিজেকে শূন্য করার মানসে আমরা ইতঃপূর্বে যে পন্থা উল্লেখ করেছি, সে পন্থায় নির্জনতা অবলম্বন করা। নির্জনতা—এটা একধরনের ওষুধ। ওষুধ পরিমিত হওয়া চাই। ওষুধ হতে হবে প্রয়োজনমতো এবং পরিমাপমতো। বিপরীত হলোই বিপজ্জনক। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে—সালাফদের কারও কারও নির্জনতা অবলম্বন ছিল সম্পূর্ণ দুনিয়াবিমুখ; এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্যদের জন্য এটা দলিল হতে পারে না।

* * *





ওহির সূচনা

আম্মাজান আশিশার বর্ণনা

ইমাম বুখারি রহ. ওহির সূচনাকালীন অবস্থা সম্পর্কে আশিশা রা. থেকে একটি বর্ণনা এনেছেন। তিনি বলেন—

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহি আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন, তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি হেরা গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে কিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া— এইভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন।

তারপর খাদিজা রা.-এর কাছে কিরে এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এভাবে হেরা গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহি এলো। তাঁর কাছে কেরেশতা এসে বললেন—পড়ুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। তিনি বলেন—তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। আমি বললাম—আমি তো পড়তে পারি না। তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে



বললেন—পড়ুন। আমি জবাব দিলাম—আমি তো পড়তে পারি না। রাসুলুদ্দাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন—

‘পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়ুন আর আপনার রব মহামহিমাম্বিত।’”

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসুলুদ্দাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের কাছে এসে বললেন—‘আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।’

তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদিজা রা.—এর কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাকে বললেন—আমি নিজের ওপর আশঙ্কা বোধ করছি।

খাদিজা রা. বললেন—

আল্লাহর কসম! কখনো না। আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারি করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।

এরপর তাঁকে নিয়ে খাদিজা রা. তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আবদুল আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জার কাছে গেলেন; যিনি জাহিলি যুগে ইসাযি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানি ভাষা লিখতে জানতেন এবং আল্লাহর তাওফিক অনুযায়ী ইবরানি ভাষায় ইনজিল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ। বয়েসের ভারে তিনি অস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদিজা রা. তাকে বললেন—হে চাচাতো ভাই, আপনার ভাতিজার কথা শোনুন।

ওয়ারাকা তাকে জিজ্ঞেস করলেন—ভাতিজা, তুমি কী দেখে? রাসুলুদ্দাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন।



তখন ওয়্যারাকা তাঁকে বললেন—

ইনি সে দূত, যাকে আল্লাহ মুসা আলাইহিস সাল্লামের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কাওম তোমাকে বের করে দেবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন—তারা কি আমাকে বের করে দেবে?

তিনি বললেন—

হ্যাঁ, অতীতে যিনিই তোমার মতো কিছু নিয়ে এসেছেন, তার সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব।

এর কিছুদিন পর ওয়্যারাকা ইশ্তিকাল করেন। আর ওহি স্থগিত থাকে।

‘ফাতরাতুল ওহি’ বা ওহি বশের সময় নিয়ে ইশতেলাফ রয়েছে। কেউ বলেন, তিন বছর। আবার কেউ বলেন, এর চেয়েও কম। তবে এ ব্যাপারে বাইহাকি যা বর্ণনা করেছেন (ছয় মাস) সেটা গ্রন্থানুযায়ী।

ইমাম বুখারি রহ. বিখ্যাত সাহাবি জাবির রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন—
যেখানে তিনি ফাতরাতুল ওহি সম্পর্কে বলেছেন—

আমি চলছিলাম, আকাশ থেকে হঠাৎ একটি আগুয়াজ শুনতে পেলাম। আমি তাকালাম। হঠাৎ সেই ফেরেশতাকে দেখতে পেলাম, যিনি আমার নিকট হেরা পর্বতের গুহায় এসেছিলেন। তিনি আকাশ ও ভূমিনজুড়ে ব্যাপ্ত থাকা একটি চেয়ারে বসে আছেন। তাই আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এরপর আমি (বাড়ি) ফিরলাম। এবং (পরিবারের লোকজনকে) বললাম—
আমাকে কাপড়ে আবৃত করো, আমাকে কাপড়ে আবৃত করো।

এরপর আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন—



يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ.

হে চাদস্বাবৃত,

قُمْ فَأَنْذِرْ.

ওঠুন, সতর্ক করেন।

وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ.

আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন।

وَيُنِيبَكَ فَطَهِّرْ.

নিজের পোশাক পবিত্র করেন।

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ.

এক অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন ৷

এরপর থেকে ধারাবাহিক ওহির ধারা চলতে লাগল।

* * *



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

সকল বড়বড়ের মূল লক্ষ্যই বাক্য ওহি

বাদউল ওহি বা ওহির সূচনাকালীন অবস্থার হাদিসটি মূলনীতিভিত্তিক একটি হাদিস। এর ওপর আকায়িদসহ দ্বীনের অনেক বিষয়ের নির্ভর করছে। এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস নবজিরর আনীত যাবতীয় বিষয়—গায়েবি বিষয়, তাশরিয়ি বিষয়াবলি—এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের মূলভিত্তি।

ওহির বাস্তবতা হলো—যে ব্যক্তি নিজস্ব চিন্তা ও বিশ্বাসের আলোকে কর্মপন্থা নির্ধারণ করে,^{১০২} এবং যে ব্যক্তি স্রেফ তার রবের পন্থাকেই গ্রহণ করে—যেখানে কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্তন করা, বাড়ানো কমানো অর্থাৎ নিছক হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার থাকে না—ওহি এমন দুজন ব্যক্তির মাঝে পার্থক্যবিশদ করে।

এ কারণেই ইসলামের বিরুদ্ধবালীরা ওহির মূল গঠনকে নিয়েই প্রথমে তাদের সকল অপারেশান শুরু করে। এর ওপরই তাদের চিন্তাগত আক্রাম চালায়। সর্বতোভাবে তারা ওহির মৌলিকতায় সংশয় সৃষ্টি করে। ওহি, ইলহাম (অন্তরে প্রেরিত অনুপ্রেরণা), হাদিসুন নাফস (মনোগত ভাবনা) ইত্যাদিকে জগাশ্চুড়ি বানিয়ে ফেলে। কেননা, এভাবে করে ওহির মূল গঠনের বিশ্বাসে পরিবর্তন আনতে পারলে তাদের সব উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হতে শুরু করবে। কারণ, ওহি মুসলিমদের যাবতীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসের উৎস। এখন যদি এর মৌলিকতাকে সন্দেহের বীজ বপন করা যায়, তাহলে আকায়িদ ও আহকামের বাকি শাখাগুলোতে অস্বীকার করানোর ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে। মানুষের মাঝে এই চিন্তার অনুপ্রবেশ

১০২ অর্থাৎ, একজন সাধারণ মানুষ।

১০৩ অর্থাৎ, বিশেষভাবে নির্বাচিত নবি-রাসূল।

ঘটানো যাবে, যে, মুহাম্মাদের যেই শরিয়ত ও আদর্শ—এর সবই তার ব্যক্তিগত চিন্তা।

এই ভয়ংকর উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আশ্রাসী চিন্তাবিদরা ওহির যে ধারাবাহিক ইতিহাস ব্যক্তি-পরম্পরায় চলে এসেছে, এবং আসহাবুস সিদ্দাহ যেভাবে বর্ণনা করে এসেছেন, তা থেকে অনেক দূরে সরে এতদ্যেক যার যার মতো করে নিজ উদ্দেশ্যে ওহিকে ব্যাখ্যা করে থাকে। তাদের কেউ কেউ বলে—

মুহাম্মাদ” (কাশফের পশ্চতিতে) চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। একপর্যায়ে তাঁর হৃদয়ে কোনো একটা বিষয় বন্দ্বমূল হতো, আর ঐটিকে প্রতিমাবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাস হিসেবে দাঁড় করাতেন।

আবার কারও কারও কথা—

মুহাম্মাদ” কুরআনসহ ইসলামের মৌলিক আদর্শ-বিশ্বাস বৃহাইরা রাহিব থেকে শিখেছেন। কেউ কেউ আবার বলে উঠছেন—না, বিষয়টা এ রকম-ওরকম কোনোটাই নয়; কিন্তু মুহাম্মাদের জায়ুতে সমস্যা ছিল, তিনি ছিলেন স্খীরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি।’—

তাদের ভিত্তিহীন এসব আশ্রাসী কথা স্পষ্টতই তাদের নবুয়তের অস্বীকারের ব্যাপারটা তুলে ধরেছে। আমরা যখন ইমাম বুখারি রহ. বর্ণিত হাদিস থেকে ‘বাদনু নুজুলিল ওহি’ (ওহি নাজিলের সূচনা) ব্যাপারটা বুঝতে যাব, তখন ওহির প্রকৃত বাস্তবতা আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে। এবং ওহির পশ্চতিগত ব্যাপারে আল্লাহর হিকমতের ব্যাপারগুলোও স্পষ্ট হবে আমাদের সামনে।

কিছু গুরুতর প্রশ্ন

প্রথমবারই কেন নবিজি জিবরাইলকে চর্মচর্মে দেখলেন? প্রথমবার ওহি তো পর্দার পেছন থেকেও অর্ধাং জিবরাইলকে সরাসরি না দেখে নাজিল হতে পারত?

আল্লাহ তায়াল্লা তাঁর অন্তরে কেন ভয়ের সঞ্চার করলেন? তিনি কেন সেই ওহির হাকিকত (প্রকৃত বাস্তবতা) বুঝতে পেরেশান হলেন? অথচ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে বিশেষ মহত্ত্ব করেন এবং তাঁকে হিফাজত করেন, এর দাবি তো ছিল—তাঁর

১০৪ সাহায্য আল্লাহি ওয়া সাল্লাম

১০৫ সাহায্য আল্লাহি ওয়া সাল্লাম।

১০৬ বিতরিত জানতে দেখুন—হাক্কুল আল্লাহি ইসলামি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৮-৩৯



মনে স্থিরতা ও প্রশান্তির হাওয়া বইয়ে দেওয়া, তাই না? তাঁর কেন মনে হলো, হেরা গুহায় আসা ফেরেশতা জিন এবং যার কারণে তিনি নিজের ব্যাপারে শঙ্কিতও ছিলেন? তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশতা—এ কথা তাঁর কেন মনে হয়নি? ওহি আসার পর দীর্ঘকাল কেন তা বন্ধ রইল? আর এ কারণে তিনি ছিলেন অস্থির ও বিশাল চিন্তিত এবং যে কারণে তাঁর মাঝে মাঝে ইচ্ছে হতো—ইমাম বুখারি যেমনটা বর্ণনা করেছেন—পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফ দিতে?

ওহির সূচনার ব্যাপারে এগুলো স্বভাবজাত প্রশ্ন। এগুলোর উত্তর খুঁজতে গেলে আমরা দেখতে পাব—এগুলোর প্রত্যেকটাতেই প্রচুর হিকমত রয়েছে; যার মাধ্যমে একজন সত্য-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কাছে ওহির বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আত্মাসী চিন্তাবিদদের চিন্তার কবল থেকে সে মুক্তি পাবে।

প্রশ্নের উত্তর

নির্জন হেরা গুহায় নবিজি হঠাৎ তাঁর সামনে জিবরাইলকে দেখতে পেলেন এবং জিবরাইল তাঁকে বলছেন, ‘পড়ো’—এ আকস্মিক ঘটনায় তিনি ভড়কে গেলেন। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, ওহি ব্যাপারটা ব্যক্তিগত কোনো কিছু—যেটাকে হাদিসুন নাফস বলা যাবে, এমনটা নয়। এটা ভিন্ন বিষয়, ব্যক্তিগত বিষয়ের সাথে যার নূনতম সম্পর্কও নেই। (কারণ, ব্যক্তিগত বিষয়ে মানুষ ভয় পায় না।)

ফেরেশতা কর্তৃক তাঁকে তিনবার চাপ দেওয়া এবং প্রত্যেকবার পড়তে বলা—এটাও ব্যক্তিগত বিষয় না হওয়াকে আরও জোরদার করে। (কারণ, ব্যক্তিগত স্বার্থ উল্লেখের মতো বিষয়ের জন্য বলপ্রয়োগ করতে হয় না, ব্যক্তি নিজেই তা করে থাকে।)

তিনি ফেরেশতাকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে এতটাই ভয় পেয়েছেন যে, তিনি নির্জনতা বাদ দিয়ে দুর্বুদ্র বুকে দ্রুত ঘরে ফিরেছেন। এখান থেকে প্রত্যেক বিদগ্ধ চিন্তাবিদেবর কাছে এটা স্পষ্ট হবে যে—তাঁকে যেই রিসালাতের গুরুভার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং যেই জন্য তাঁর প্রেরণ, তিনি তাঁর প্রতি পূর্বাগ্রহী ছিলেন না, তাঁর সাজানো কোনো চিত্রপট অনুসারে সেই ওহি আসেনি। এটা একদমই হঠাৎ তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া একটা ব্যাপার। যেজন্য তাঁর কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। আর যে ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে কোনো চিন্তা ও বিশ্বাস লালন করে আসছে, সে হঠাৎ (কাশফের পম্বতিতে) নতুন কোনো বিশ্বাস ও চিন্তা লাভ করে তার দাওয়াত দিতে যাবে—এটা হতে পারে না!...



ইলহাম, হাদিসুন নাকস, আল ইসতিশরাকুন নাকসি, (আলোকিত বৃহ) উর্ধ্বজাগতিক চিন্তাভাবনা—এর কোনোটার জন্যই ভয়ভীতি-শঙ্কা ও চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যাওয়া আবশ্যিক নয়। কোনো একটা ছক আঁকা চিন্তায় ডুবে থাকা এবং হঠাৎ ভয় পাওয়া ও শঙ্কিত হয়ে ওঠার মাঝে কোনো মিল নেই। অন্যথায় যেসব চিন্তাবিদ কোনো বিষয়ে চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, নানান ভয় ও শঙ্কায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া প্রয়োজন ছিল।

আমরা জানি, ভয়ভীতি-শঙ্কা শরীর কেঁপে ওঠা, চেহারার রং পরিবর্তন হওয়া—এগুলো মানুষের আবেগীয় বিষয়; কেগুলোতে কৃত্রিমতার সুযোগ নেই। আমরা যদি মেনেও নিই, নব্বিজির ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা প্রকাশ পেয়েছে, তবুও এটা অসম্ভব যে, তার নবুয়তের পূর্বের সত্যের স্বভাব মুহূর্তে সম্পূর্ণ পালটে যাবে।

নব্বিজি এই ব্যাপারটাকে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, হেরা গুহায় যে এসে তাঁকে চাপ দিয়েছে, কথা বলেছে সে জিন। এটা তাঁর কথায়ই ফুটে উঠেছে। ভয় পাওয়ার পর তিনি খাদিজা রা.-এর কাছে সেই সংবাদ দিয়ে বলছিলেন—‘আমি আমার নিজের ওপর (জিনের) ভয় করছি।’ কিন্তু খাদিজা রা.-এর ভেতর এই শঙ্কা কান্ন করেনি। তার ভাবনা ছিল—যার মাঝে এত সিফাতে হামিদা (প্রশংসনীয় গুণাবলি) রয়েছে, যিনি ‘মাকারিমুল আখলাখ’ (উন্নত চরিত্রমাদুরী)-এর অধিকারী, এমন ব্যক্তিকে জিন ক্ষতি করতে পারে না।

আব্দাহ তায়াল্লা চাইলে তাঁর মন প্রশান্ত করে দিতে পারতেন। ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর কাছে এই জিনিসটাকে স্পষ্ট করতে পারতেন যে, তাঁর সাথে যে কথা বলেছে, সে একজন ফেরেশতা—জিবরাইল, তিনি তাঁর নিকট তাঁর রাসূল হওয়ার সংবাদ দিতে এসেছেন; কিন্তু হিকমতে ইলাহির দাবি ছিল, তিনি তাঁর নবুয়তের আগের ও পরের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ পৃথক করে তুলবেন। এটা যেন স্পষ্ট হয়, ইসলামের কোনো আকিদা-বিশ্বাস বা ইসলামি শরিয়তের কোনো বিষয় পূর্ব থেকে তাঁর কাছে ছিল না।

খাদিজা রা. যে গুরুত্ব সহকারে তাঁকে ওরাকা ইবনে নওফালের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার নিকট ব্যাপারটা তুলে ধরেছিলেন, তাও আরেকটা বিষয় স্পষ্ট হওয়ার জন্য। তা হলো, তিনি হঠাৎ পেয়ে বসা যে জিনিসের কারণে ভড়কে গেছেন—এটা ওহি; যা আব্দাহ তায়াল্লা পূর্ববর্তী আখিবাদের ওপর নাজিল করেছিলেন এবং ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি যেই ঘোরে ছিলেন, তা যেন কেটে যায়।



আর ওহি আসার পর তা আবার ছয় মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় স্থগিত থাকে; এটাও একটা বিশেষ মুজিব্বার মান রাখে। কারণ, এটা আত্মসী চিন্তাবিদরা নবিজির কাছে আসা ওহিকে ‘ইসতিশরাকুন নাকসি’; যা দীর্ঘ সাধনা ও চিন্তার মাধ্যমে অর্জন হয়েছে এবং যা তাঁর ব্যক্তিসত্তা থেকেই সৃষ্ট বলে আওড়ান, সেটার বিরুদ্ধে যায়।

হিকমতে ইলাহির দাবি ছিল—হেরা গুহায় তিনি প্রথমবারের মতো যেই ফেরেশতার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, সেই ফেরেশতা দীর্ঘকাল তাঁর অগোচরে থাকবেন। এ কারণে তাঁর অস্থিরতা বেড়ে যায়, এরপর সেই অস্থিরতাটা ভয়ে রূপান্তরিত হয় যে, তাঁর কোনো অসতর্কতার কারণে তাঁকে ওহি এবং রিসালাতের আলোয় আলোকিত করা সম্ভব ও তা থেকে আত্মাহ তায়লা দূরে রাখছেন। ফলে সুবিশাল প্রশস্ত দুনিয়াটাও তাঁর কাছে সংকীর্ণ মনে হয়। নিজেই শেষ করে দেওয়ারও ইচ্ছা জাগে। পাহাড় থেকে ফেলে নিজেই শেষ করে দেবেন এজন্য তিনি পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছেন!...

হঠাৎ একদিন দেখেন সেই ফেরেশতা, যাকে তিনি হেরা গুহায় দেখেছিলেন, তিনি বলছেন—

হে মুহম্মাদ, আপনি মানুষের নিকট প্রেরিত আত্মাহর রাসূল!

তিনি আবার ভয় পেয়ে শঙ্কিত হয়ে ঘরে ফিরে এলেন। আয়াত নাজিল হলো—

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ.

হে চাদরাবৃত্ত,

قُمْ فَأَنْذِرْ.

ওঠেন, সতর্ক করেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে এতগুলো কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, সেই অবস্থা বিবেচনা করেও তাঁর কাছে প্রেরিত ওহিকে ব্যক্তিগত বিষয় বলা—একধরনের পাগলামি। যেহেতু এটা স্পষ্ট, ইলহামের অধিকারী ব্যক্তি, নিজের চিন্তায় ডুবে থাকা ব্যক্তিকে এ রকম কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় না।

সহিহ বুখারিতে কিশুখভাবে বর্ণিত ও প্রমাণিত বাদউল ওহি (ওহির সূচনাকালীন অবস্থা) সম্পর্কে যেই হাদিস রয়েছে, এটা ওহি ও নবুয়তকে কলুষিত করার ঘণ্য



চেটায় লিঙ্গ বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা যেই অকথা ও যেই আবহে এবং যেভাবে ওহির সূচনা করেছেন, সেটা হিকমতে ইলাহির (আল্লাহর প্রজ্ঞা) শামিল।

আবার প্রশ্ন

এবার সন্দেহবাদীরা প্রশ্ন তুলবে—যখন তাঁর নিকট ওহির খারা চালু হলো, তখন তাঁর পাশে তো আরও অনেক সাথি থাকতেন। তারা কেউ দেখতেন না; ফেরেশতাকে শুধু তিনিই দেখতেন?

এরও আছে উত্তর

একটা জিনিসের অস্তিত্ব থাকার জন্য তা চোখে দেখা শর্ত না। কারণ, আমাদের চোখের কাজ সীমিত। অন্যথায় কলতে হবে, যেসব জিনিস চোখে দেখা যায় না, সেগুলোর অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ তায়ালা, যিনি স্বয়ং এসব চোখ সৃষ্টি করেছেন, তিনি যেমন চান, যতটুকু চান এসব চোখে শক্তি বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং তিনি যার চোখে শক্তি বাড়িয়ে দেবেন, সে তা দেখবে—যা অন্যরা দেখতে পায় না। (নবিজির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এমনই ছিল; আল্লাহ তার চোখকে বিশেষায়িত করেছিলেন।)

এরপর যে ওহির অব্যাহত খারা শুরু হয়, এতেই ওহির বাস্তবতা পরিস্ফুট হয়। এবং এটা স্পষ্ট হয় যে, সন্দেহবাদীরা ওহিকে যেভাবে বিকৃত করে থাকে, বিষয়টা মূলত সে রকম না। নিচের কয়েকটি পয়েন্টে আমরা এ সম্পর্কীয় অতিরিক্ত আরও সামান্য কিছু আলোচনা করব—

০১.

কুরআন ও হাদিসের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য হলো, প্রথমটাকে দ্রুত সংরক্ষণের নির্দেশ দিতেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টাকে সাহাবায়ে কিরামের স্মৃতিশক্তির ওপরই ছেড়ে দিতেন। এটা এই জন্য নয় যে, হাদিস তাঁর নিজের পক্ষ থেকে; নবুয়তের সাথে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এর মূল কারণ হলো—কুরআন তার নিকট জিবরাইল আ.-এর মাধ্যমে হুবহু লফজ ও হরফসহ (শব্দ ও অর্থসহ) নাযিল হয়েছে। পক্ষান্তরে হাদিসের ভাবার্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি, কিন্তু শব্দ ও শব্দের শৈলী তাঁর নিজের পক্ষ থেকে। তাই তিনি ভয় করতেন—দুটো একসাথে মিশে যাবে। এই দুটির জন্য ভিন্ন দুই রকমের বিধান।



❖ ০২.

নব্বিজকে কখনো কিছু বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতো, কিন্তু তিনি তার উত্তর দিতেন না। কখনো কখনো নিরুত্তর অবস্থায় দীর্ঘ সময় কেটে যেত। একসময় এ ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাজিল হতো। প্রশ্নকারীর উত্তরে তিনি নাজিলকৃত আয়াত শুনিয়ে দিতেন। আবার কখনো কখনো নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে নব্বিজির ‘ত্রুটি’ হয়ে গেলে সে ব্যাপারে আয়াত নাজিল হতো; যেগুলো অনেক সময় তিরস্কারসংবলিত হতো।

❖ ০৩.

নব্বিজ ছিলেন উম্মি। আর একজন উম্মির পক্ষে সম্ভব নয় সে ‘মুকাশাফাতুন নাফসিয়াহ (মনোগত উন্মোচন বা আধ্যাত্মিক একধরনের অনুপ্রেরণা)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ইতিহাস, ঐতিহাসিক বাস্তবতা যেমন : ইউসুফ আ.-এর কাহিনি, মুসা আ.-এর মা যে তাঁকে সাগরে ফেলে দিয়েছিলেন সে কাহিনি, ফেরাউনের কাহিনি ইত্যাদি জেনে যাবে; বরং এই সবগুলো তিনি উম্মি অবস্থায়ই জেনেছিলেন—

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذَا
لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

আপনি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বীয় দক্ষিণহস্ত দ্বারা কোনো কিতাব লেখেননি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত।

❖ ০৪.

চল্লিশটি বছর স্বজাতির মাঝে নব্বিজির সততার যে খ্যাতি ছিল, এটা দাবি করে—ইতঃপূর্বে নিজের ব্যাপারে তিনি সত্যবাদী ছিলেন। ইতঃপূর্বে সত্যবাদী হয়ে থাকলে পরে তো আরও উত্তমরূপে সত্যবাদী হবেন। কারণ, প্রথম ব্যাপারটা ছিল একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত। আর দ্বিতীয়টা অর্থাৎ নবুয়তের পরের ব্যাপারটা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এক্ষেত্রে সত্যের ব্যাপারটা আরও প্রবল। তাই তিনি ওহির ব্যাপারে ভিন্ন কিছু করবেন না। কাউকে সন্দেহে

নিপতিত করবেন না। এখান থেকে বোঝা যায়, নিচের আয়াতটি, প্রথমবার নিছের ওহির ব্যাপারে নবিজির যেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার রদে (প্রত্যাখ্যান) নাজিল হয়েছে—

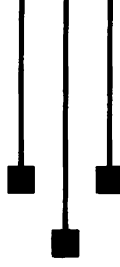
فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكَ ۖ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

সূতরাং আপনি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোনো সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাকেন—যা আপনার প্রতি আমি নাজিল করেছি, তবে তাদের জিজ্ঞেস করেন, যারা আপনার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট থেকে আপনার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই আপনি কন্ঠিনকালেও সন্দেহকারী হবেন না।

(পরবর্তী অভিজ্ঞতার রদে নয়। কারণ, পরবর্তী অভিজ্ঞতা ছিল প্রথম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।) তাই এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর নবিজি বলেন—(ওহির ব্যাপারে) আমি সন্দেহও করি না, প্রশ্নও তুলি না।

* * *





তৃতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে নবুয়তপ্রাপ্তির আলোচনা থেকে শুরু করে মদিনায় নবিজির হিজরত পর্যন্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। মোটাদাগে এগুলো জানতে চাইলে এভাবে বলতে হবে, এই অধ্যায়ে নবি-জীবনের এই অংশগুলো স্থান পেয়েছে—

- নবি-জীবনে ইসলামি দাওয়াতের নানা স্তর, গোপন দাওয়াত, গোপনীয়তার কারণ, ইসলাম নিয়ে কাফিরদের মাথাব্যথার কারণ কেন, সেই প্রব্লেম উদ্ভব; প্রকাশ্য দাওয়াত, তায়েফ যাত্রা, সাফা পাহাড়ে নবিজির দাওয়াত নিয়ে গমন।
- প্রকাশ্যে দাওয়াতের কারণে কুরাইশদের অত্যাচার-নির্ধাতন বৃদ্ধি পাওয়া, এখান থেকে আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ, কুরাইশদের আপসের সব ব্যর্থ চেষ্টা, এগুলোর পেছনে আল্লাহ তায়ালার হিকমতসমূহ, নবিজির পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে বয়কটকরণসহ প্রাসঙ্গিক আলোচনা।
- ইসলামে প্রথম হিজরত, হাবশায় কি প্রথম হিজরত হয়েছিল নকি অন্য কোথাও—সেই আলোচনা। ইসলামের সাথে ঈসায়ি ধর্মের নৈকট্য, মক্কায় প্রথম প্রতিনিধিদলের আগমন এবং তাদের ইসলাম গ্রহণ।
- শোকের বছর, তায়েফ যাত্রা, তায়েফে দাওয়াত প্রদান ও আন্দাসের ইসলাম গ্রহণ, ইসরা ও মিরাজ্জ, প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ ও ইসলাম গ্রহণের সূচনা, বাইয়াতে আকাবায়ে উলা, বাইয়াতে আকাবায়ে সানিয়ার সংক্ষিপ্ত শিক্ষা ও ইতিহাসসংক্রান্ত আলোচনা।
- সবশেষে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবিজিকে মদিনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান ও মদিনার পথপানে নবিজি...



নবি-জীবনে ইসলামি দাওয়াতের নানা স্তর

দাওয়াতের চার স্তর

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত লাভ করার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার দাওয়াতের চারটি স্তর গিয়েছে—

- ✓ এক. গোপন দাওয়াত; এটা চলছিল তিন বছর পর্যন্ত।
- ✓ দুই. প্রকাশ্যে মৌখিক দাওয়াত; এর সময়সীমা হিজরত পর্যন্ত।
- ✓ তিন. প্রকাশ্য দাওয়াত; তবে এটা শুধু মৌখিকে সীমাবদ্ধ নয়, কাজেও। তখন বিধান ছিল, নিজ থেকে যারা যুদ্ধ শুরু করবে বা অন্য কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, তাদের সাথে যুদ্ধ। এটা চলে হুদাইবিয়া পর্যন্ত।
- ✓ চার. দুর্দান্ত গতিতে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত; মুশরিক, ধর্মান্তরিত নাস্তিক অবিভাসী, মূর্তিপূজারি যেই আব্রাহর রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে, যে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেবে, তার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা হবে।

শেষের স্তরটা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরেই ইসলামি শরিয়তের বিবয়গুলো স্থিতিশীল হয়, ইসলামের চূড়ান্ত জিহাদের হুকুম আসে।





প্রথম প্রকার : গোপন দাওয়াত

সীমিত পরিসরে দাওয়াত

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালায় নির্দেশিত মিশন শুরু করেন। মানুষকে প্রতিমাপূজা ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহর ইবাদত করার দাওয়াত দেন; কিন্তু তাঁর এই দাওয়াত ছিল চুপিচুপি। শিরক ও প্রতিমাপূজায় ডুবন্ত কুরাইশদের নিকট যেন হঠাৎ এসে পড়া কোনো ব্যাপার হয়ে না দাঁড়ায়—এজন্য তাঁর এই গোপন দাওয়াতের পদ্ধতি। নবিজি তাই কুরাইশদের সাধারণ মাজলিসে ও প্রকাশ্যে কাউকে দাওয়াত দিতেন না। দাওয়াতের পরিধি ছিল খুবই সীমিত; পূর্বপরিচিতজন বা আত্মীয়—এই পর্যন্ত। তাদের মাঝে যারা প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন, তারা হলেন—

খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, আলি ইবনে আবু তালিব, জায়েদ ইবনে হারিসা, আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা, উসমান ইবনে আফফান, জুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস
রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ আরও অনেকে।

তারা সবাই গোপনে নবিজির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের কেউ যখন কোনো ইবাদত করতে চাইতেন, সেজন্য তাকে লোকচক্ষুর আড়ালে মকার বিভিন্ন গিরিপথে গিয়ে লুকিয় লুকিয়ে ইবাদত করতে হতো।

এরপর ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা পুরুষ-নারী মিলে বৃদ্ধি পেয়ে যখন ত্রিশে পৌঁছে, তখন নবিজি তাদের শিক্ষাদানের জন্য তাদেরই একজনের একটি ঘর



নির্বাচন করেন; নবিজির নির্বাচিত ঘরের মালিক ছিলেন সেই গুটিকয়েক মুসলিমেরই আরেক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি—আরকাম ইবনে আবুল আরকাম। আরকামের ঘরে এসে নবিজি তাদের ইসলামের বিভিন্ন বিধান শেখাতেন, তাদের নসিহত করতেন। দাওয়াতের এই স্তরের শেষ ফলাফল ছিল চল্লিশজনের মতো পুরুষ-নারীর ইসলাম গ্রহণ। যাদের অধিকাংশই গরিব, গোলাম এবং এমন কিছু লোক, কুরাইশদের মাঝে যাদের কোনো মূল্য নেই।^{১১০}

* * *



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

নবিজির প্রথম স্তরের গোপন দাওয়াত থেকে আমরা প্রধানত দুটি বিষয় জানব, যা এর প্রয়োজনীয়তা ও যথার্থতা বুঝতে আমাদের সহায়তা করবে। এবং আমাদের ভেতরে কোনো প্রশ্ন থাকলে তারও নিরসন করবে।

এক. নবিজির দাওয়াতি মিশনের শুরুতেই কেন গোপনীয়তা

ইসলামের প্রথম দিকের বছরগুলোতে নবিজির গোপনে দাওয়াত দেওয়াটা তাঁর নিজের প্রাণের ভয় ছিল, ব্যাপারটা এমন নয়। বরং এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, তিনি যখন দাওয়াতে কাজে আদিষ্ট হলেন এবং তাঁর ওপর আয়াত নাযিল হলো—
يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ... (হে চাদরাবৃত...), তিনি তখনই বুঝতে পারলেন যে, তিনি মানুষের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—যেই আল্লাহ তাঁকে এই মহৎ কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতেও সক্ষম। আল্লাহ তায়ালা যদি প্রথম দিন থেকেই একদম প্রকাশ্যে দাওয়াতের আদেশ দিতেন, তাহলে নিজের প্রাণ বাজি রেখে হলেও সেই আদেশ পালনে কসুর করতেন না।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিকট ইলহাম^{১১১} করলেন—তিনি দাওয়াতের প্রথমদিকে গোপন দাওয়াত চালিয়ে যাবেন। এই দাওয়াত শুধু তার কাছেই নিয়ে যাবেন, যে একে গ্রহণ করে নেওয়ার মতো মানসিকতা লালন করে।

এই অংশ থেকে দায়ীদের (প্রচারকগণ) গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে —

☞ ০১. দাওয়াতের কাজে সফল হওয়ার জন্য সুস্থ বিবেক ও বিশুদ্ধ চিন্তা থেকে উৎসারিত বাহ্যিক কলাকৌশল অবলম্বন করতে হবে।

১১১ যা রাসূলের নিকট প্রেরিত ওহির একটি প্রকার।



তবে কলাকৌশলের ওপর পরিপূর্ণ ভরসা চলবে না। ভরসা হবে একমাত্র আল্লাহর ওপর। এসব উপকরণ ও কলাকৌশলের পেছনে ছুটতে গিয়ে উপকরণই যেন মূলের মাঝে বিরাট প্রভাব ফেলে না বসে, সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। অন্যথায় সেই উপকরণ, সেই কলাকৌশল ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে।

৩০২. প্রত্যেক যুগের দায়ি (প্রচারক) সেই কাল ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী গোপন হলে গোপন, প্রকাশ্য হলে প্রকাশ্য, কোমলতা বা কঠিন্য—তার দাওয়াতের কৌশল সাজাতে পারে। তবে এই কৌশলগত পদ্ধতিও অব্যাহত নয়; এখানেও ইসলামি শরিয়ত সীমারেখা টেনে দিয়েছে। এক্ষেত্রে নবিজির দাওয়াতি জীবনের বাস্তব নমুনাকে সামনে রাখতে হবে; আমাদের আলোচিত চারটি স্তর থেকে যখন যেটি প্রয়োজন ও উপযোগী, তখন সেটি গ্রহণ করতে হবে। তবে সব ক্ষেত্রেই লক্ষ্য রাখতে হবে উম্মাহর ব্যাপক কল্যাণের প্রতি।

এ কারণেই মুসলিমরা যখন শক্তিতে, বলে, সংখ্যায় দুর্বল হবে এবং তাদের বস্তুমূল ধারণা হবে—শত্রুদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে নামলে তারা খুব সহজেই হত্যার শিকার হবে, তখন (জুমহুর ফুকাহার প্রাধান্যমতে,) নিজেকে বাঁচানোর দিকটাই প্রাধান্য পাবে। কারণ, এখানে এসে ধ্বিনের বাঁচানোর দিকটাকে প্রাধান্য দিতে গেলে তার ফলাফল (জয়-পরাজয়) অনিশ্চিত, অথবা মন্দ ফলাফল (পরাজয়) নিশ্চিত।

ইজ ইবনে আবদুস সালামও এই ধরনের জিহাদে প্রবৃত্ত না হওয়ার বিষয়টাকে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন—

শত্রুদের মধ্যে যখন কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে না, তখন পরাজয় অবশ্যম্ভাব্য। কারণ, লড়াইতে থাকার মধ্যে প্রাণনাশের ব্যাপার আছে; আর মুসলিমদের প্রাণনাশে কাফিরদের অন্তরের উপশমও রয়েছে বটে; যেহেতু তারা মুসলিমদের লাঞ্ছিত করটাই চায়। তাই অনিশ্চিত ও দুর্বল বিশ্বাস নিয়ে এভাবে লড়াইে থাকাটা শুধুই বিপর্যয় ছড়ায়, যাতে কোনো কল্যাণ নেই।^{১১২}

১১২ কাওরাইনুল আহকাম কি মাসলিখিল আনাম : ১/৯৫; বাওরাবিদুল মাসলাহ কি শারিরাতিল ইসলামিয়াহ :



আমার মতে—এখানে নিজের দিকটাকে প্রাধান্য দেওয়ার যে কথা এসেছে, সেটা শ্রেফ বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এতেও ধীনের একপ্রকার কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়। এসব ক্ষেত্রে ধীনি কল্যাণ হলো—নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যমে মুসলিমদের প্রাণগুলো নিরাপদ থাকবে। প্রাণে বেঁচে থেকে তারা অন্যান্য ময়দানে জিহাদ করবে এবং একসময় বিজয় ছিনিয়ে আনবে। অন্যথায় যখন তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া নিশ্চিত হবে, তা অবশ্যই ইসলামের ক্ষতির কারণ। কেননা, নিজেকে ধ্বংসের মাধ্যমে কাফিরদের যাবতীয় প্রতিবন্ধক দূর করে দেওয়াটাই ইসলামের ক্ষতি করার শামিল হবে।

সারকথা

যখন প্রকাশ্য দাওয়াত বা মোকাবিলা ক্ষতির কারণ হয়, তখন গোপন দাওয়াত, ও নিজেকে নিরাপদে রেখে কাজ করে যাওয়াটাই আবশ্যিক; কিন্তু প্রকাশ্য দাওয়াতের মাধ্যমে যদি উপকার হয়, তখন গোপন দাওয়াতের সুযোগ নেই। আবার যখন প্রতিরোধ মোকাবিলার উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য হয়, তখন নির্লিপ্তভাবে, নিরাপদে বসে থাকার সুযোগটুকুও নেই।

দুই. প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের দূত ইসলাম গ্রহণের নেপথ্য

একটু আগেও আমরা জেনেছি, প্রথম দিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের বড়ো অংশটাই ছিল দরিদ্র, গোলাম ও দুর্বল শ্রেণির লোক। এর হিকমত কী? তাদের ওপরই ভিত্তি করে একটি ইসলামি রাষ্ট্র নির্মাণের মূল রহস্যটা কী?

প্রকৃতিগতভাবে নবিদের দাওয়াতের প্রাথমিক দিনগুলোর বাস্তবতা এটাই। নুহ আ.-এর জাতির দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, তাঁর অনুসারীরা সমাজের দুর্বল ও সমাজের নিম্নশ্রেণির লোক। তাদের সম্ভ্রান্তরা নবির অনুসারীদের ইতর বিবেচনা করে বলছে—

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرْنَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرْنَكَ
اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادْيِ الرَّأْيِ وَمَا تَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ
بَلْ نَنْظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ

তখন তার কণ্ঠের কাফির প্রধানরা বলল—আমরা তো আপনাকে আমাদের মতো একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না; আর



আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্ফলবুধিসম্পন্ন, তারা ব্যতীত কাউকে তো
আপনার আনুগত্য করতে দেখি না এবং আমাদের ওপর আপনাদের
কোনো প্রাধান্য দেখি না, বরং আপনারা সবাই মিথ্যাবাদী বলে আমরা
মনে করি ১৯

মুসা আ.-এর অনুসারীরাও ছিল সমাজের দুর্বল শ্রেণির লোক। ফেরাউন ও দলের
লোকেরা মুসা আ.-এর অনুসারীদের সবিশেষ দুর্বল ভাবত। আল্লাহ তায়ালা ফেরাউন
ও তার দলের লোকদের ধ্বংসের কাহিনি শোনানোর সময় এ কথাটাও তুলে
ধরেছেন—

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي
بُرَكْنَا فِيهَا ۝

আর যাদের দুর্বল মনে করা হতো, তাদেরও আমি উত্তরাধিকার দান
করেছি এ ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের; যাতে আমি বরকত সন্নিহিত
রেখেছি ২০

সামুদ জাতির নিকট আল্লাহ তায়ালা সালিহ আ.-কে পাঠিয়েছিলেন। সেই জাতিরও
দুর্বল লোকেরাই ঈমান এনেছে, আর নেতারা চরম বিমুখতা প্রদর্শন করেছে—

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ
أَتَعْلَمُونَ أَنَّ ضَلِيحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

তার সম্প্রদায়ের দান্তিক সর্দাররা ঈমানদার দারিদ্রদের জিজ্ঞেস করল—
তোমরা কি বিশ্বাস করো যে, সালেহকে তাঁর পালনকর্তা প্রেরণ করেছেন?
তারা বলল, আমরা তো তাঁর আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী।

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كُفْرُونَ ۝

দান্তিকরা বলল, তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তাতে
অস্বীকৃত ২১

১১৩ সূরা হুদ, আয়াত : ২৭

১১৪ সূরা আরাফ, আয়াত : ১৩৭

১১৫ সূরা আরাফ, আয়াত : ৭৫-৭৬



ইসলাম নিয়ে কাকিরদের মাথাব্যথার প্রধান কারণ

এর মূল রহস্য হলো, এই ধীন; যার প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে সমস্ত নবি-রাসুলকে পাঠানো হয়েছিল; এই ধীনের হাকিকত হচ্ছে—মানুষকে বান্দার দাসত্ব ও শাসন থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্ব ও শাসনে নিয়ে আসা। আর এটাই সেই বাস্তবতা, যা প্রভুদের প্রভুত্ব ও শাসকদের শাসনকে, যা তারা দুর্বলদের ওপর চালাত, খামচে ধরে।

তাই ইসলামের দাওয়াতের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে ওইসব (কাফির) প্রভু ও শাসকেরা অহংকার ও বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়; যেখানে দুর্বলদের অনুগত থাকতে হয়, যার কারণে দুর্বলদের তাদের ডাকে সাড়া দিতে হয়।

রুস্তমের সাথে রিবহ ইবনে আমরের কথোপকথন

দেখুন, এই বাস্তবতটুকুই কাদেসিয়ার যুদ্ধে পারসিক বাহিনীর সেনাপতি রুস্তম ও সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের বাহিনীর সেনাপতি রিবহ ইবনে আমরের মাঝে যেই কথোপকথন হয়েছিল, তাতে তা স্পষ্ট হয়—

রুস্তম তাকে জিজ্ঞেস করেছিল—

কোন জিনিস তোমাদের আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং আমাদের দেশের দিকে আকৃষ্ট করেছে?

তিনি বলেছিলেন—

আল্লাহ যাকে চান, আমরা তাকে বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসতে এসেছি। এরপর তিনি রুস্তমের ডানে-বামে বুকুরত ব্যক্তিদের কাতারের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে বললেন, তোমাদের থেকে আমরা অনেক সহনশীলতা পেয়েছি; কিন্তু তোমাদের চেয়ে বেশি নির্বোধ কোনো জাতির ব্যাপারে আমাদের জানা নেই। আমরা মুসলিম জাতি। আমাদের কেউ কারও ইবাদত করে না। আমি ভেবেছিলাম, তোমরা পরস্পর সহমর্মিতা প্রকাশ করো, যেমন আমরা করি। তোমাদের করা সবচেয়ে যে জিনিসটা বিস্ময়কর লেগেছে তা হলো, তোমরা আমাকে এই সংবাদ দিয়েছ যে, তোমাদের কতক কতকের প্রভু...



সেনাপতি রিবয়ি ইবনে আমরের এই বক্তব্য শুনে কুন্তমের পাশে থাকা সৈন্যবহরের নিষ্পেষিত লোকেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে ফিসফিস করে বলতে লাগল—

আল্লাহর শপথ! এই আরব ব্যক্তি সত্য বলেছে।

আর সেনাপ্রধান ও নেতাদের মাঝে রিবয়ির কথা বজ্জের মতো আঘাত হানল। তারা পরস্পর বলতে লাগল—

সে এমন কথা বলেছে যে, আমাদের দাসশ্রেণির তার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারছে না।

কিন্তু আগে যারা ঈমান এনেছিলেন, তার মানে এই নয় যে, তাদের ভেতরে মূলত ঈমান ছিল না। তারা শুধু প্রতিপক্ষিগণীদের দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য ঈমান এনেছে। কারণ, নবিজির যারা এসে যারা ঈমান এনেছিল, তারা শুধু দুর্বল শ্রেণির লোক তা নয়; বরং তাদের মাঝে কুরাইশ নেতারাও ছিল। প্রত্যেকেই নবিজির সত্যতা সম্পর্কে জানত; কিন্তু নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বের লোভ শক্তিশালীদের ধুব সেই সত্যের স্বীকারোক্তি দেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল। এর উত্তম দৃষ্টান্ত আবু তালিব; কিন্তু দুর্বলদের সামনে ঈমান আনার জন্য এ রকম প্রতিবন্ধক কিছু ছিল না।

এবার প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির ঈমানের কথা ভাবেন। সে আল্লাহর উলুহিয়াতকে কতটা বিশ্বাস করে, তার কর্তৃত্বকে কতটা মানে এবং গায়রুদ্দাহর কর্তৃত্বকে কতটা অমান্য করে!

ঈমানদার ব্যক্তির এই অনুভব ও অনুভূতিটাই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ফল; যা ব্যক্তির শক্তি বাড়িয়ে দেয়। এবং তার সৌভাগ্য ও সফলতার দরোজা খুলে দেয়।

এখান থেকে আমরা এ কালের বিকৃত চিন্তার অধিকারী কিছু চিন্তাবিদেদের চিন্তার মিথ্যা ও অসারতার প্রমাণ পাই। তারা বলে, মুহাম্মাদ সাদ্দাম্‌আল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই দাওয়াত দিয়েছিলেন, সেটা আরব আবহ থেকেই উৎসারিত। তাঁর দাওয়াতি মিশন সেই আবহকে নাড়া দিয়ে প্রাণবন্ত করেছিল! তাঁর দাওয়াত ছিল আরব চিন্তার নতুন জাগরণ!



যদি এমনই হতো, তাহলে দাওয়াতের তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পর নারী-পুরুষ মিলিয়ে মাত্র চল্লিশ হতো না; যাদের অধিকাংশরাই ছিল গোলাম শ্রেণির, দুর্বল ও গরিব। যদি ব্যাপারটা এমনই হতো, তাহলে আরবরাই এক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকত। অথচ বাস্তবতা বিপরীত। তাদের অগ্রগামী ছিলেন সুহাইব রুমি ও বিলাল হাবশির মতো বিভিন্ন আঙ্গমি (অনারব)।

সামনের আলোচনায় আপনি পাবেন, স্বয়ং আরব সংস্কৃতিই—যা নবিজির দাওয়াতকে ঘৃণার চোখে দেখত—তাদের হিজ্রতে বাধ্য করেছিল। এবং তার অনুসারীদের এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়া ও হাবশায় হিজ্রত করতে বাধ্য করেছিল। এখন প্রশ্ন হলো, নবিজির দাওয়াত যদি আরব আবহ থেকেই উৎসারিত হয়ে থাকে, তাহলে অনুকূল উৎস থেকে তারা পলায়ন করতে যাবে কেন?

* * *





দ্বিতীয় প্রকার : প্রকাশ্য দাওয়াত

সাক্ষ্য পাওয়াতে নবিজি

ইবনে হিশাম লেখেন—এরপর নারী-পুরুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। একপর্যায়ে গোটা মকায় ইসলামের দ্যুতি ছড়িয়ে যায় এবং এ নিয়ে সমাজের পথে পথে কথাবার্তা ও আলোচনা চলতে থাকে। ফলে উপযুক্ত সময় অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা নবিজিকেও নির্দেশ প্রদান করেন—যেই সত্যের বাণী ও বার্তা দিয়ে আপনাকে পাঠানো হয়েছে, এবার প্রকাশ্যে তা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেন। সবাইকে এই পয়গাম কবুলের নির্দেশ প্রদান করেন এবং এর দিকে ডাকতে থাকেন।

নবুয়তপ্রাপ্তির পর তিন বছর লাগাতার নবিজি গোপনে দাওয়াতের কাজ আশ্রয় দিয়ে আসছিলেন। এরপর প্রকাশ্য দাওয়াতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারিমের আয়াত অবতীর্ণ করেন—

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

অতএব, আপনি যেই বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করেন এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করেন।”

এরপর—

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. وَخُفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করে দেন। এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হোন।”



এরপর—

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝

এবং বলুন, আমি তো কেবল একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী ۝

এবার নবিজি আদ্রাহ তায়ালার আদেশ মোতাবেক প্রকাশ্য দাওয়াতের সূচনা করেন।
সূরা হিজরের উক্ত আয়াতটি নাজিল হলে নবিজি সাফা পাহাড়ে উঠে উচ্চৈঃস্বরে ডাক
দেন—

হে বনু ফিহর...

হে বনু আদি...

সাফা পাহাড় থেকে ভেসে আসা এই সংকেতধ্বনি শুনে সবাই এসে পাহাড়ের কাছে
জড়ো হয়। এমনকি যারা কোনো কারণে নিজে আসতে পারেনি, তারা খবর নিতে
লোক পাঠায়।

নবিজি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন—

আমার ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কী? বলো তো, আমি যদি বলি—
তোমাদের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে এক বিশাল বাহিনী এই পাহাড়ের
পেছনেই ওত পেতে আছে, তবে কি তোমরা আমার বিশ্বাস করবে?

সবাই সমস্বরে বলে ওঠে—

এর আগে আমরা আপনার মুখ থেকে কখনো মিথ্যা শুনিনি। (তো হঠাৎ
আজ এমন প্রস্তাব করছেন কেন? ব্যাপার কী, বলুন তো?)

এবার নবিজি তাদের বলেন—

আমি তোমাদের কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি, যা তোমাদের
সামনেই উপস্থিত।...

নবিজির এই সতর্কবার্তা আবু লাহাবের মনঃপূত হয়নি। সে রাগত স্বরে এক ঝটকায় বলে ওঠে—তোমার সারাটা দিনই বরবাদ হোক। (তার ভাষায়, সামান্য) এই কথা বলতেই কি তুমি আমাদের এখানে জড়ো করেছ?

কিন্তু আল্লাহ তায়াল্লাও তার পোড়া মুখের জবাবে নাজিল করেন—

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।^{১১০}

তারপর নবিজি পাহাড় থেকে নেমে আল্লাহ তায়াল্লার পরবর্তী নির্দেশের ওপর আমল শুরু করেন। আল্লাহ তায়াল্লা নির্দেশ দেন—

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।^{১১১}

নবিজি সকল আত্মীয়স্বজন ও কাছের লোকদের একত্র করে বলেন—

হে বনু কাব, নিজেদের জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। হে বনু মুররা, নিজেদের জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। হে বনু আবদে মানাফ, নিজেদের জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। হে বনু আবদুল মুত্তালিব, নিজেদের জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। হে ফাতিমা, তুমিও নিজেদের জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আমি আল্লাহর দরবারে তাঁর সন্তুষ্টির বিপক্ষে তোমাদের কিছু দিতে পারব না। অবশ্য এই আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা মনে রাখব।^{১১২}

তারা নবিজির প্রকাশ্য দাওয়াত সরাসরি অস্বীকার করে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় এবং দ্রাস্ত আকিদা ও ভিত্তিহীন কর্ম পরিত্যাগে বাপ-দাদার ধর্মকে অপারগতা হিসেবে পেশ করে। তারা বলে—এসব রীতিনীতি আমাদের বাপ-দাদাদের থেকে পাওয়া। এগুলো এখন আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এই পরিস্থিতিতে নবিজি তাদের মুক্তচিন্তা ও ভাবনা-কল্পনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে মূর্তির অশ্ব অনুসরণ ও পূজার অপবিত্রতা থেকে

১২০ সূরা লাহাব, আয়াত : ১

১২১ সূরা শূআরা, আয়াত : ২১৪

১২২ সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম

পবিত্র করতে সচেষ্ট হন। তাদের নিজ নিজ আকল ও বুদ্ধি কাজে লাগানোর উপদেশ দেন। তাদের সামনে পরিষ্কার করে বলেন—ইবাদতের উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের যেসব তথাকথিত ছোটো ছোটো খোদার সামনে মাথানত করো, সেগুলো তোমাদের ভালো-মন্দ কিছুই করতে পারে না। এবং মূর্তিপূজার এই কুপ্রথা বংশপরম্পরায় প্রাপ্তির যেই ওজর তোমরা পেশ করেছ, তাও সুস্পষ্ট ভুল। যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أُولَٰئِكَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

আর তাদের যখন বলা হয়, তোমরা এসো আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানের দিকে এবং রাসুলের দিকে, তখন তারা বলে—‘আমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত, যার ওপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি।’ যদিও তাদের বাপ-দাদারা কোনো জ্ঞান রাখত না এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না তবুও?—

নবিজি যখন তাদের মিথ্যা ও ভ্রান্ত উপাস্যদের দোষ-ত্রুটি ও অবাস্তবতা এক এক করে শোনান এবং তাদের দৃষ্টিতে বিখ্যাত ও জ্ঞানী লোকদের নির্বোধ ও জ্ঞানহীন আখ্যা দেন, আর বাপ-দাদাদের মূর্তিপূজার প্রকৃত কারণ অজ্ঞানতা ও বোধহীনতাকে ওজর হিসেবে পেশ করার প্রশাস্তিমূলক জবাব দেন, তখন ব্যাপারগুলো কুরাইশদের খুব গায়ে লাগে। তারা সরাসরি তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। উপরন্তু সবাই তাঁর বিপক্ষে অবস্থান নেয়। আল্লাহ তায়ালা যাদের মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন, যাদের আল্লাহ তায়ালা তাঁর রোবানল ও পাকড়াও থেকে বাঁচান, কেবল তারাই থেকে যায় নবিজির পক্ষে। নবিজির চাচা আবু তালিব নিজেকে তাদের থেকে পৃথক করে নেন। তিনি নবিজির সার্বিক তত্ত্বাবধান, সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং প্রাণপণ রক্ষার জন্য উঠে দাঁড়ান।

* * *

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

নবি-জীবনের এই অংশের পাঠশেষে এখান থেকে আমাদের সামনে তিনটি দিক বেরিয়ে আসে। সংক্ষেপে আমরা সেগুলো দেখে নেব—

প্রথম দিক

কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের প্রতি নবিজির উক্ত দাওয়াত তাদের মনের আশার বিপরীত এবং তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডবিরোধী ছিল। উপস্থিত সমাবেশেই আবু লাহাবের স্পষ্ট অস্বীকার এবং বেয়াদবিমূলক শব্দ উচ্চারণ এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। এমনকি পরবর্তী সময়ে সে সকল মুশরিক ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে তার দলে ভিড়িয়ে নেয়।

এই ঘটনার মাধ্যমে ‘আরব জাতীয়তাবাদই ইসলামের শিক্ষা ও আইনকানূনের ভিত্তি এবং নবি মুহাম্মাদ তাঁর নতুন ধর্মের যেই প্রচারণা করেছে, তা তৎকালীন আরবের জনগোষ্ঠীর মনের বাসনা ও মনের চাহিদারই প্রতিফলন’ বলে যারা চরম মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবি করে এবং কুরআনি অনুশাসন ও ইসলামি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সমাজে প্রোপাগান্ডা চালায়, সিরাতের এই আলোচনা দ্বারা তাদের দাবিও খণ্ডিত হয়ে যায়।

এ জাতীয় চরম হাস্যকর উক্তি ও নির্বুদ্ধিতা সুলভ বক্তব্যের খণ্ডনে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে কোমর বেঁধে নামার প্রয়োজন নেই। কারণ, নবিজির জীবনচরিত সম্পর্কে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে যারই ন্যূনতম সঠিক জ্ঞান ও অবগতি আছে সে ই জানে, সমাজে এই হাস্যকর দাবি প্রচারের ধান্দাকারীরাও এই দাবিকে অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত বলে জানে, তবুও তারা কেন এ দাবি করে?

কারণ, একে তো মনগড়া কিছু দাবি না করলে তারা অন্তরে স্বস্তি পায় না, রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারে না; পেটের ভাত হজম হয় না; দ্বিতীয়ত যেন ইসলামের



ফিকহুস সিরাহ

নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব অন্যান্য মৌলিক বিষয় থেকে সহজেই খসিয়ে ফেলতে পারে। কোনো কিছু দাবি করা এবং তা প্রচারের জন্য সেই দাবিটি সত্য ও নির্ভুল হওয়ার আন্তর্জাতিক খিওরি তাদের দৃষ্টিতে জরুরি বা আবশ্যিক নয়; বরং তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো—তাদের স্বার্থ ও লক্ষ্য পূরণে যা দরকার, সেগুলোরই প্রচারণা; চাই তা সত্য হোক বা মিথ্যা। পাঠকের হয়তো মনে আছে, বইয়ের ভূমিকায় এ নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় নিক

আল্লাহ তায়ালার প্রথম নির্দেশ ছিল—‘আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করুন।’ এই নির্দেশের ভেতর তিনি দাওয়াতের ‘ক্ষেত্র’ নির্দিষ্ট করে দেননি। সেহেতু আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের এই ক্ষেত্রটি ছিল ব্যাপক এবং এতে আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাই অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু তার পরও নিকটাত্মীয়দের বিশেষভাবে দাওয়াত দেওয়ার পৃথক নির্দেশ প্রদানের রহস্য কী?

এর রহস্য হলো—সাধারণভাবে প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আর বিশেষ করে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের ওপর দাওয়াতের দায়িত্বের যেই স্তরগুলো রয়েছে, আল্লাহ তায়ালার সেগুলো স্পষ্ট করে দিতে চেয়েছেন।

প্রথম স্তর : দাওয়াতের প্রথম স্তর ও সর্বপ্রথম দায়িত্ব নিজ সন্তাকে অর্থাৎ নিজেকে অনুগত করানো। সবার আগে এই দাওয়াতের সত্যতার ওপর নিজে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এর গুরুত্ব নিজে উপলব্ধি করা। এজন্য আল্লাহ তায়ালার ওহি নাজিলের প্রাথমিক পর্বে দীর্ঘ একটা সময় ওহি নাজিল বন্ধ রেখে নবজিকে সেই সুযোগ দিয়েছেন। যেন নবজি নিজে প্রতি প্রত্যাদিষ্ট ওহির সাথে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হতে পারেন এবং প্রশান্তির সাথে বুঝতে পারেন—তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং তাঁর ওপর যেসব বার্তা আসছে, সেগুলো সাধারণ ও জাগতিক কোনো আলাপচারিতা নয়; বরং নিখিল জাহানের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ পবিত্র ওহি। এ ছাড়াও তিনি যেন পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগত সকল বিধিবিধান ও মূলনীতি এবং শরিয়তের শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণে নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে পারেন।



দ্বিতীয় স্তর : নিজ পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের দাওয়াত দেওয়া। এই দায়িত্ব পালনে ব্রত হতে আত্মাহ তায়াল্লা নবিজিকে নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজনদের সামনে দাওয়াত পেশ করতে এবং তাদের আত্মাহর ভয় দেখাতে নির্দেশ দেন। দাওয়াতের এই স্তরে সকল পরিবার ও গোত্র বা গোষ্ঠী প্রধান সমান অংশীদার।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হলো—নবিজি যেই দাওয়াত স্বজাতি ও স্বদেশি লোকদের কাছে পৌঁছিয়েছেন, আর সাধারণ উন্মত তার আত্মীয়স্বজনের কাছে পৌঁছায়—এই দুয়ের মধ্যে ‘দাওয়াত’ হিসেবে কোনো তারতম্য বা মতভেদ নেই। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, নবিজি (তৎকালীন মানুষের ধ্যানধারণা ও সমাজের ভ্রান্ত রীতিনীতির বিপক্ষে) আত্মাহ তায়াল্লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এক নতুন শরিয়তের দাওয়াত দিয়েছেন, আর সাধারণ উন্মত দাওয়াত দেয় (বিশ্ববিশ্রুত) এই মুহাম্মাদি পয়গাম ও বার্তার। তবে একজন নবি ও রাসূল যেভাবে দাওয়াতের কাজ আত্মাহ দিতেন এবং আত্মাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত নির্দেশনাবলি পৌঁছাতেন এবং কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থাতেও এই মিশন থেকে থেমে যেতেন না, অনুরূপ একজন পরিবারপ্রধানও কোনো অবস্থাতেই এই দায়িত্ব থেকে থেমে যেতে পারবে না। প্রত্যেক পরিবারপ্রধানের গুরুদায়িত্ব ও কর্তব্য—আমৃত্যু পরিবারের প্রতিটি সদস্য ও আত্মীয়স্বজনের কাছে ইসলামের যাবতীয় বিধান পৌঁছাতে থাকা। এ কাজে তিনি প্রয়োজনমতো তার অন্তর্দৃষ্টি-প্রভাব ও কর্তৃত্ব এবং শক্তি ও জোর—সবই প্রয়োগ করতে পারবেন।

তৃতীয় স্তর : দাওয়াতের এই স্তরে একজন আলিমের নিজ পাড়া-মহল্লা বা শহর-নগরীর অধিবাসীদের এবং সমকালীন শাসকের গোটা দেশের জনগণকে দাওয়াত দেওয়ার বিষয়টি शामिल। সুতরাং কাজের বিবেচনায় ওই আলিম ও শাসক নবিজির উত্তরাধিকার ও প্রতিনিধি বলে বিবেচিত। যেমনটি নবিজি হাদিস শরীফে বিবৃত হয়েছে—

العلماء ورثة الأنبياء

আলিমসমাজ নবিগণের উত্তরাধিকার ১৩

শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানকে নবিজির স্থলাভিষিক্ত বলা হয় ১৪ তাই (ফরজ পরিমাণ) স্বীনি জ্ঞান অর্জন ইসলামি সমাজের শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য আবশ্যিক ও অপরিহার্য।



সূতরাং এই স্তরে নবিজির দাওয়াতের দায়িত্ব এবং উলামা ও শাসকদের দায়িত্ব এক রকম হয়ে যায়। পার্থক্য এতটুকু, নবিজি একজন নবি হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নতুন শরিয়তের দাওয়াত দিয়েছেন, আর উলামা ও শাসকগণ উন্মত্ত হিসেবে তাঁর দাওয়াত কবুল করে তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শ অনুযায়ী নিজেরা আমল করেন এবং পাশাপাশি এই দাওয়াত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে মাঠে-ময়দানে কাজ করেন।

এভাবে আমরা অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে পরখ করলে এবং ভালোভাবে চিন্তা করলে সুস্পষ্ট বুঝতে পারব, নবিজি দাওয়াতের তিনটি স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন—

- ✓ ০১. নিজের ব্যক্তিসম্ভার ওপর প্রাপ্ত দায়িত্ব। কারণ, তিনি এ ব্যাপারে মুকাদ্দাফ (مكلف) অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার বিধিনিষেধ প্রয়োগের উপযুক্ত) ছিলেন।
- ✓ ০২. নিজ পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনদের দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব। কারণ, তাঁর পরিবার ও আত্মীয়স্বজন ছিল।
- ✓ ০৩. সমগ্র মানবজাতির কাছে সত্যের পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব। কারণ, তিনি ছিলেন কিতাবপ্রাপ্ত নবি এবং প্রেরিত রাসুল।

অতএব এভাবে দাওয়াতি অজ্ঞানে নবিজির রীতি ও আদর্শ অনুযায়ী প্রথম স্তরের দায়িত্বে মুকাদ্দাফ প্রত্যেক ব্যক্তিরই অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় স্তরে সকল পরিবার ও গোত্রপ্রধান शामिल। আর তৃতীয় স্তরে রয়েছেন উলামা-মাশায়েখ এবং রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ।

তৃতীয় দিক

নবিজি স্বজাতির দোষণুলো স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলেন—তোমরা চিন্তা-ফিকির ছাড়াই এবং ভালো-মন্দের মাঝে তফাত না করেই নিজেদের বাপ-দাদার অভ্যাস ও প্রথায়ে আবদ্ধ ও বন্দি করে রেখেছ। তিনি তাদের গৌড়ামির ওপর প্রতিষ্ঠিত অশ্ব অনুসরণ থেকে মুক্ত হয়ে বিচার-বুদ্ধিভিত্তিক ইসলামি শরিয়তের শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানান।

১২৫ এ থেকে বোঝা যায়—মুসলিম দেশের শাসন পুরুষতান্ত্রিক হওয়া উচিত; কারণ, শাসক নবিজির স্থলাভিষিক্ত। আর নবিজি ছিলেন পুরুষ। সর্বোপরি বড়ো কথা হলো—নবিজি নিজেই পুরুষ শাসককে নির্বাচন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।



এতে (বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীর মুসলিমদের জন্য) নির্দেশনা রয়েছে যে, ইসলামি শরিয়ত মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস ও শাখাগত বিধান মিলিয়ে এমন এক ব্যবস্থাপনা—যা যৌক্তিক ও বুদ্ধিদীপ্ত। প্রাকৃতিক ও বাস্তবিক। স্বাভাবিক ও সম্পাদনযোগ্য। কারণ, এর প্রতিটি বিধান মানুষের স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মেজাজ উপযোগী। ঠিক এ কারণেই আল্লাহর প্রতি ইমানসহ অন্যান্য আকিদা-বিশ্বাস বিশ্বাস হওয়ার জন্য শর্ত হলো—আকিদাটি পূর্ণ নিশ্চয়তা ও স্বাধীন চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং তাতে সামাজিক আচার-প্রথা বা অশ্ব অনুসরণের ছোঁয়াও না থাকা।

আল্লামা বুরহানুদ্দিন ইবরাহিম লাকাকি মালিকি রহ. (মৃত্যু : ১০৪১ হি.) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *জাওহরাতে তাওহিদ*-এ একটি কবিতায় উল্লেখ করেন—

اذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد^১

তাওহিদের বিষয়ে যে অশ্ব অনুসরণ করবে, মুহূর্তেই তার ইমান ক্রটিগ্রস্ত হতে পারে।

এ থেকে জানা যায়, ইসলাম প্রাচীন কুফরি মতবাদ ও প্রথা-প্রচনের মাধ্যমে কুঠারাবাত করেছে এবং সেসবের গোলামির শৃঙ্খল ও দাসত্বের বন্ধন থেকে মানুষকে করেছে মুক্ত। কারণ, এর যাবতীয় মূলনীতি ও বিধান সুস্থ চিন্তা ও পরিচ্ছন্ন বিবেকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিপরীতে প্রাচীন প্রথা ও প্রচনের ভিত্তি কেবল অশ্ব অনুসরণ ও গোঁড়ামির ওপর। অর্থাৎ এতে চিন্তা-কিকির এবং পর্যালোচনা ও যাচাইয়ের কোনো উপাদানই নেই; বরং শুধুই একগুয়েমি।

আরবি তাকলিদ (تقليد) শব্দের অর্থ পুরনো রুসম-রেওয়াজ ও তথাকথিত উত্তি।

আরবি ভাষাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এর সংজ্ঞা কিছুটা এভাবে—

তাকলিদ হলো বাপ-দাদাদের রীতিনীতি ও অভ্যাসের সেসব সমষ্টি, কেসুলোর ওপর কোনো সমাজ বা অঞ্চলের রুসুম ও প্রথার ছাপ থাকে এবং শুধুই অশ্ব অনুসরণ ও গোঁড়ামির ভিত্তিতে সেসব অভ্যাস স্থায়ী ও অবশিষ্ট থাকে।^২

১২৬. সর্বমুখ, এই স্বাক্ষর অমুসলিমদের ধর্ম ও মতবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে বর্তমানে ভিন্ন ব্যাক্তার সাথে চার মাজহাবের মুসলিমদের ক্ষেত্রে শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। কাজেই আমাদের মুসলিম নেককার বাপ-দাদা বা হক্কানি



মানুষ সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ধাপে যেসব অভ্যাস ও আচারে অভ্যস্ত হয়, আনন্দ-উৎকর্ষ অবস্থায় যেসব খেলতামাশা করে, দুঃখ ও শোকে কাতর হয়ে যেই মাতম ও হা-হুতাশ করে আবার যেসব কর্মকাণ্ড স্বভাববশত করে থাকে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম এসব লালন করে চলে অথবা পারস্পরিক দ্রাঘত, সুসম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতার কারণে তারাই সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে—এ ধরনের সবকিছুই ভাষা ও সমাজবিজ্ঞানীদের পরিভাষায় রেওয়াজাত (কথিত উত্তি) ও অশ্ব অনুসরণ বলে সংজ্ঞায়িত।

এ থেকে স্পষ্ট, ইসলাম কথিত উত্তি বা প্রবচনের (রেওয়াজাত) স্থান নয়; চাই সেগুলো আকিদা-বিশ্বাসকেন্দ্রিক হোক বা অন্যান্য শাখাগত বিধানসংবলিত হোক। কারণ, যেকোনো বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তি হয় সুস্থ বিবেক ও নির্ভুল যুক্তির ওপর। আর শাখাগত বিধানের ভিত্তি হয় ধর্মীয় ও জাগতিক কল্যাণের ওপর। আর ধর্মীয় ও জাগতিক কল্যাণ বোঝা চিন্তা-ফিকির ও গবেষণার বিষয়। যদিও কারও কারও বিবেক প্রাসক্তিক বাধাবিপত্তির কারণে সঠিক ও যথাযথ অর্থ বুঝতে সমর্থ হয় না।

এ থেকে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হলো, সেসব লোক কী মারাত্মক অপবাদ ও চরম মিথ্যাচার করে, যারা কিনা ইসলামি অনুশাসন ও ইসলামের হুকুম-আহকামকে ‘ইসলামি রেওয়াজাত’ (ইসলামের তথাকথিত ও প্রচলিত বর্ণনা) বলে আখ্যায়িত করে।^১ তাদের এই জ্বালিম-সুলভ বক্তব্য ও মন্তব্যে এ কথাই ফুটে ওঠে, ইসলামি রীতিনীতির মূল্যায়ন-মর্যাদা এ কারণে নয় যে, এটিই মানবজাতির সৌভাগ্য লুকায়িত খোদায়ি সংবিধান; বরং তাদের কথায় মনে হবে, এর মূল্যায়ন ও কদরদানির কারণ হলো—ইসলামি আচার ও রীতিনীতি এর অনুসারীদের বাপ-দাদা থেকে চলে আসা প্রাচীন ও ওয়ারিশি প্রথা ও কুসংস্কারের সমষ্টি।

উলামাদের কিরামের দেখাদেখি কোনো নেক আমল করাকে বিধর্মী ভাইদের মতো ‘অশ্ব অনুসরণ’ করার সুযোগ বা অবকাশ নেই এবং অন্যায়ও বটে।

১২৭. ‘রেওয়াজাত’ ও ‘ইসলামি রেওয়াজাত’ ভিন্ন ভিন্ন দুটি পরিভাষা। পরিভাষা দুটির পরিচিতি এমন—

রেওয়াজাত : এই পরিভাষাটি হাদিসশাস্ত্রে পারদর্শী সকল হাদিসবিশারদ ব্যবহার করেছেন। অতএব, এক্ষেত্রে শুন্য এই ‘রেওয়াজাত বা বর্ণনা’ শব্দ নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই।

ইসলামি রেওয়াজাত : এই শব্দটির উৎপত্তি পশ্চিমা ইসলাম গবেষক ও ওরেন্টালিস্টদের থেকে। তারা সাধারণত পরিভাষাটিকে ‘ভিত্তিহীন কথিত উত্তি বা বর্ণনা’ অর্থে চালানোর উদ্দেশ্যে চরম করেছে। অশ্ব ইসলামের প্রতিটি শাখাগত ও শাস্ত্রীয় বিবরণ যুগের নির্ভরযোগ্য পরম্পরায় বর্ণিত। এমনকি প্রতিটি বর্ণনার নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও সমালোচনাও গ্রন্থবশ্য। কাজেই এগুলো ভিত্তিহীন হওয়ার কোনো অর্থই নেই। এবং তাদের এই চক্রান্ত নিতান্তই নিকৃষ্ট কর্ম।



স্বভাবতই এ জাতীয় মনগড়া কথাবার্তার উদ্দেশ্য অনিবার্হভাবে নির্দেশ করে, অনুন্নত যুগের যেসব প্রাচীন ও মিথ্যীয় বিষয়কে উন্নত ও পরিবর্তিত যুগে বাধ্যতামূলক করা হয়, সেগুলো গ্রহণে কারও আশ্রয় জাগে না এক কোনোটির প্রতি আকর্ষণ ও সৃষ্টি হয় না। ইসলামও যেন তা-ই।

বাস্তবতা হলো—ইসলামের ‘নির্দেশনা’র ওপর ‘ইসলামি রেওয়াজাতের নিদর্শন’ শব্দের প্রয়োগ কোনো ছোটো বা সাধারণ ভুল নয়; বরং এটা ওই শিকলেরই একটি কড়ি, যার উদ্দেশ্যই হলো—বাতিল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রমূলক পরিভাবার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই উসকে দেওয়া।

ইসলামের ব্যাপারে ‘ইসলামি বর্ণনা’ পরিভাষা প্রচলনের প্রথম উদ্দেশ্যই হলো ইসলামের সিংহভাগ হুকুম-আহকাম ও নিয়মনীতির ওপর ‘প্রচলিত বর্ণনা’-এর সাইনবোর্ড বুলিয়ে দেওয়া; যাতে করে দীর্ঘ একটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষের মনে বন্ধমূল হয়ে যায় যে, ইসলামের বিধিবিধান ও নিয়মনীতি মানেই ‘কথিত উক্তি ও কত্ব্য’। এগুলোর শক্তিশালী ও মজবুত কোনো উৎস বা ভিত্তি নেই। ফলত একটা সময় গিয়ে ইসলামের অনুসারীদের মনেই থাকবে না—এই ব্যবস্থাপনা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে জিবরাইল আ.-এর মারফতে নব্বি এবং নব্বি থেকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত পরম্পরায় আমাদের পর্বন্ত পৌঁছেছে। এবং এসব বিধিবিধান পুরোপুরি বিবেকসম্মত ও মুক্ত বিশ্লেষণযোগ্য। তারপর ইসলামের শত্রুদের জন্য এর যেকোনো দিক থেকে তীব্র আক্রমণ ও বড়ো হামলা অতি সহজ হয়ে যাবে।

ইসলাম যেই ব্যবস্থাপনা ও শরিয়তের নাম, সেটা ভিত্তিমূলক মৌলনীতি। মৌলনীতি কাকে বলে? যা বিবেক ও যুক্তির আলোকে বোঝা যায়, চিন্তা-ফিকিরের মাধ্যমে গবেষণায় উঠিয়ে আনা যায় এবং যার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়—এমন বিষয়ই তো মৌলনীতি। মানুষের বিবেকপ্রসূত নীতি ও সংবিধান নানাজনের চিন্তা-গবেষণার ফল হওয়ায় ভুলের শঙ্কা থাকে বেশি; কিন্তু ইসলামের মূল খিওরি কখনোই ভুল হওয়ার নয়। কারণ, যেই মহামহিম সত্তা একে প্রণয়ন করেছেন, তিনিই সব চিন্তক ও গবেষক মন-মস্তিষ্কের একক ও অধিভীয় স্রষ্টা। এই একটি যুক্তিই ইসলামের মৌলিক নীতিমালার ওপর ঈমান আনয়ন এবং সেগুলোর সৌন্দর্য, বিশ্বস্ততা ও নির্ভুলতার ওপর নিশ্চিত জ্ঞান লাভের জন্য যথেষ্ট।



এতে কোনো সন্দেহ নেই, যখন ইসলামের সিংহভাগ আকিদা-বিশ্বাস ও বিধিবিধান যেমন : বিয়ে-তালাক-নারীদের পর্দা এবং তাদের নিরাপত্তা, চলনরীতি ও চরিত্রকেদ্রিক সাধারণ মাসয়ালার ওপর ‘তথাকথিত বা প্রচলিত বর্ণনা’-এর টাঙ্গ লাগানো হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই এমন কিছু লোক পাওয়া যাবে, যারা এসব প্রচলিত বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করতে, এসবের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে এবং এসবের শিকল ভাঙতে মানুষকে দাওয়াত দেবে। বিশেষ করে এই যুগে; যে যুগের মানুষের মুখের লাগাম বলতে কিছু নেই; এবং তাদের চিন্তাচেতনা নিয়ন্ত্রণহীন।^{১২৮}

কিছু বাস্তবতা হলো—ইসলামে প্রচলিত বর্ণনা ও তথাকথিত উক্তি বলতে কিছু নেই। এটা তো এমন ধর্ম, যা বিবেককে প্রচলিত বর্ণনার ধূস্রজাল ও তথাকথিত উক্তির জাঁতাকল থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই এসেছে। যেমনটি আমরা দাওয়াতের প্রাথমিক ধাপগুলোয় নবিজিকে করতে দেখেছি।

রেওয়ায়াত বা প্রচলিত বর্ণনা : সমাজের রীতিনীতি ও পথ পন্থতির সেসব ধারা, যেগুলোর মধ্যে মানুষ আপনা-আপনিই শুধু অশ্ব অনুসরণের স্রোতেই ভেসে যায়।

মৌলানীতি : ওই লিপি, যার মাধ্যমে যুগের উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকাকে শুধু নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেটা উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্তকারী বিপরীত কিছু নয়।

প্রচলিত বর্ণনা ও অশ্ব অনুসরণের উদাহরণ সেসব আগাছা ও পরগাছা উদ্ভিদের মতো, যেগুলো সমাজের চিন্তা ও চেতনার ময়দানে আপনা-আপনিই গজিয়ে ওঠে। এগুলো হয় মারাত্মক ক্ষতিকর। তাইতো এগুলো উপড়ে ফেলা এবং সুস্থ চিন্তার মঙ্গল পথকে নিরাপদ ও আবর্জনামুক্ত রাখা অত্যাাবশ্যক ও অপরিহার্য।

* * *

১২৮. যেমনটি প্রান্তিক আচরণের তথাকথিত আহলে হাদিস ভাইয়েরা করে সৰ্বল হয়েছে। গোটা উন্নয়নের স্বীকৃত চার মাজহাবের মুকাদ্দিম মুসলিমদের মাঝে কটিল সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ তাদের হিদায়াত করুন, নতুবা উপযুক্ত প্রতিদান দান করুক।



কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন

প্রকাশ্য দাপোলের পরপরই নবিজি এবং সাহাবায়ে কিরামের প্রতি কুরাইশদের শত্রুতা চরম মাত্রায় পৌঁছে যায়। নবিজির ওপর নির্যাতন ও অত্যাচারের নতুন নতুন পদ্ধতি যোগ হয়। যেমন : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বর্ণনা করেন—

একবার নবিজি কাবা চত্বরে সালাতে নিমগ্ন ছিলেন। এমন সময় উকবা ইবনে আবু মুআইত এসে নবিজির গলা মুবারক কাপড় দিয়ে প্যাঁচিয়ে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন টান দেয় যে, নবিজির গলায় ফাঁস লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় আবু বকর রা. দৌড়ে এসে উকবাকে কাঁধে উঠিয়ে নবিজির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেন এবং বলেন—তুমি কি এমন ব্যক্তিকে খুন করতে চাও, যে বলে, আমার রব আল্লাহ!”

অনুরূপ আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন—

একবার নবিজি সিজদারত ছিলেন এবং আশপাশে কুরাইশরাও ছিল। উকবা ইবনে আবু মুআইত উটের নাড়িভুঁড়ি এনে নবিজির পিঠের ওপর ফেলে দেয়। নাড়িভুঁড়ির চাপে নবিজি মাথা ওঠাতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় ফাতিমা রা. দৌড়ে এসে নবিজির ওপর থেকে সব ময়লা-আবর্জনা সরান। এবং যেই নরাধম পশু নিষ্পাপ বাবার সাথে এমন নির্মম আচরণ করেছে, ছোট মুখে আল্লাহর কাছে তার ওপরও রহম না করার করিয়াদ জানান।”

১২৯ সহিহ বুখারি

১৩০ সহিহ বুখারি



খিকছস সিরাহ

কুরাইশ কাকিরদের লাগামহীন ছালা-যজ্ঞা ও সীমাতিরিত্ত বিরক্তির কারণে নবিজির মক্কায়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি যেখানেই যেতেন, দাঁড়াতেন, বসতেন, কথা বলতেন, সেখানেই কাকিররা গিয়ে তাঁর সাথে বেয়াদবি করত। ঠাট্টা-তামাশা করত। নোংরা আচরণ করত। বিভিন্ন রকমের কষ্ট দিত।

অনুরূপ তাবারি ও ইবনে ইসহাকের এক বর্ণনায় এসেছে—

নবিজি একদিন মক্কার গলিপথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথমধ্যে এক কাকির মুষ্টিভরা মাটি নিয়ে তাঁর মাথায় নিক্ষেপ করে। এই মাটিভরা অবস্থায়ই নবিজি ঘরে ফিরলে নবিজির মেয়ে মাথা ধুয়ে দেন আর কাঁদতে থাকেন। নবিজি তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—মা রে, কেঁদো না; নিশ্চিত জেনে রাখো, তোমার বাবার হিজাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ।”

সাহাবায়ে কিরামও নানা রকম জুলুম-নির্যাতন ও শাস্তি সহ্য করেছেন। এমনকি শাস্তির তীব্র যজ্ঞণায় কারও কারও প্রাণ বের হয়ে যায়। কেউ কেউ সারাজীবনের জন্য অশ্ব হয়ে যান। তবুও কোনো শাস্তি বা যজ্ঞণা তাদের ইসলাম থেকে দূরে সরাতে পারেনি। এইসব আলোচনার ঘটনাসংবলিত বিবরণে গেলে তা এত বেশি হবে যে, এই আলোচনার পৃষ্ঠা বাড়তে থাকবে গাণিতিক হারে। তাই অনুমানের জন্য এখানে শুধু খাক্বাব ইবনে আরাত রা.-এর সূত্রে ইমাম বুখারি রহ.-এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হচ্ছে—

খাক্বাব রা. বলেন—

একদিন আমি নবিজির সামনে উপস্থিত হই। নবিজি কাবা চত্বরে একটি চাদর বিছিয়ে বসে ছিলেন। তখন পর্যন্ত মুশরিকদের নানা ধরনের নির্যাতনের মুখে আমাদের পড়তে হয়েছে। আমি কাতর কণ্ঠে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবেন না? নবিজি সোজা হয়ে বসেন এবং তাঁর চেহারা মুবারক রক্তিম বর্ণের হয়ে যায়। তিনি বলে ওঠেন—নিঃসন্দেহে তোমাদের পূর্ববর্তী উন্মত্তদের দেহ লোহার চিবুনি দিয়ে আঁচড়ানো হতো। ফলে তাদের হাড় থেকে গোশত খসে খসে পড়ত। তার পরও এই অকণ্ঠ্য ও বর্ণনাভীত



হুজুলা তাদের সত্যধর্ম থেকে একচুলও নড়াতে পারেনি। নিশ্চিত জেনে
রাখে—আল্লাহ এই ঈনকে পূর্ণতার পৌঁছাবেন। এমনকি একসময়
আসবে, যখন কোনো উট আরোহী সানআ থেকে হাজ্জরামওত^১ পর্যন্ত
সফর করবে; কিন্তু এই দীর্ঘ যাত্রায় শুধু আল্লাহর তায় ছাড়া আর কোনো
কিছুর ভ্রাস বা শঙ্কা তার মনে থাকবে না।”

* * *

১৩২ সানআ : ইরামানের রাজধানী। পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরগুলোর একটি এবং অন্যতম সর্বোচ্চ রাজধানী শহর।
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ২৩০০ মিটার (৭,৫০০ ফুট)।

হাজ্জরামওত : ইরামানেরই আরেকটি বিখ্যাত শহর। দুই শহরের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচ দিনের। তবে বনি সানআ দ্বারা
এই দুটি নবিকির উদ্দেশ্য শামের সানআ হয়ে থাকে, তাহলে দুই শহরের দূরত্ব অনেক। সূত্র : *কাতকুল বারি শরহ
বুখারি*

১৩৩ কাকিরদের অত্যাচার নির্বাতনের বিস্তারিত ঘটনা জানতে পড়তে পারেন—*সিরাত ইবনে হিশাম, তাহজিবুস
সিরাত ও নুহুল ইরাকিন গ্রন্থগুলো ইত্যাদি।*



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

নবিজি সাদ্লামুহু আল্লাইহি ওয়া সাদ্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের নির্ধাতন এবং কষ্ট ভোগের ঘটনাগুলো পড়ে স্বভাবতই যেকোনো চিন্তাশীল ও সচেতন লোকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—তিনি ও তাঁর সাহাবিগণ যদি সত্যের পথেই থেকে থাকেন, তাহলে এত নির্ধাতন ও অত্যাচারের সম্মুখীন কেন তাদের হতে হয়েছে? আল্লাহই হুকুম করেছেন তাঁর দ্বীন ও বাণী প্রচার করতে, মানুষকে তাঁর ভয় দেখাতে, সবাইকে তাঁর পথের দিকে ডাকতে, তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম-সাধনা করতে, অথচ সেই তিনিই আবার কাকিরদের অত্যাচার-নির্ধাতনের সুযোগ দিলেন? কিন্তু কেন? কেন তিনি তাদের রক্ষা করলেন না?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব—এই পার্থিব জগতে মানুষের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, আমরা সবাই মুকাদ্দাফ। অর্থাৎ খোদায়ি বিশিবিধান পালনে যেসব কষ্ট-যন্ত্রণা ও দুঃখ-দুর্দশা আসবে, সেগুলো সহ্য ও হজম করতে আমরা বাধ্য ও অনুগত।

ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া এবং সত্যের পতাকা সমুন্নত ও উঁচু রাখতে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে আবশ্যিক। আর আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় বিশিবিধানের অনুসরণ তাঁর দাসত্ব ও গোলামির নিদর্শন। কারণ, তাঁর বন্দেগি ও গোলামির অর্থই হলো—তাঁর প্রতিটি হুকুমের সামনে মাথানত রাখা। যখন তাঁর হুকুম পালন শুরু হবে, তখন কষ্ট ও দুর্দশার সম্মুখীন হতে হবে। আমরা যদি তাঁর সামনে বন্দেগি ও গোলামি প্রদর্শন না করি, তাহলে তাঁর ওপর ঈমান আনার কোনো অর্থই থাকে না। সুতরাং বন্দেগি ও গোলামির দাবিই হলো—তাঁর হুকুম পালন ও অনুসরণকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেওয়া। তাঁর হুকুম পালনে কষ্ট ও যন্ত্রণাও সহ্য করে যাওয়া। এবং নিজের মনের কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তির



বিরোধিতায় অবিরাম সংগ্রাম-সাধনায় লেগে থাকা। এগুলো বন্দেগি ও দাসত্বের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়।

এজন্যই এই পার্শ্বিক জীবনে বান্দাদের ওপর দুটি বিষয় আবশ্যিক করে নেওয়া জরুরি—

- এক. ইসলামকে অন্তরঙ্গ ও আপন করে নেওয়া এবং পরিচ্ছন্ন ইসলামি সমাজব্যবস্থা কায়েম করা।
- দুই. যেই পথ আল্লাহর দিকে পৌঁছেছে, সেটা অবলম্বন করা। এই পথে চলতে গিয়ে সব বাধাবিপত্তি-শঙ্কার দেওয়াল গুঁড়িয়ে দেওয়া। সকল কষ্ট সহ্য করে নেওয়া। এবং অতীত লঙ্ঘন ও গন্তব্যে পৌঁছতে নিজের শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করা।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়াল্লা ঈমান আনয়নের পাশাপাশি তাঁর হুকুম পালনের মুকাম্লাফ ও বাধ্যও বানিয়েছেন। এই ঈমানি ও সত্যের পথে সর্বপ্রকার কঠিন অবস্থা এবং সব ধরনের কষ্ট সহ্য করতেও আমরা বাধ্য।

আল্লাহ যদি চাইতেন তবে আমাদের ঈমান আনার পর সহজেই এবং বিনা পরিশ্রমেই ইসলামি ও তাঁর অনুশাসিত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার নিয়ম করে দিতে পারতেন; কিন্তু এতে আল্লাহর পথের পথিকদের দাসত্ব ও বান্দাসুলভ আচরণ এবং একনিষ্ঠতার প্রকাশ ঘটত না। কারণ, প্রকৃত পথিক তো সে-ই, যে কিনা রাস্তায় থাকা সকল বাধাবিপত্তি ও ভয়-শঙ্কা উপেক্ষা করে সত্যের সেই পথ ধরেই অবিরত সামনে এগিয়ে যায়। কারণ, মুমিন যখন ঈমান আনয়নের ঘোষণা দেয়, তখন থেকেই সে নিজের জ্ঞানমাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয়। এবং স্বীকার করে নেয়—তার মনের সকল চাহিদা ও সকল কামনা-বাসনা নবিজির আনীত শরিয়তের পূর্ণ অনুসারী হয়ে থাকবে। এই অবস্থায় এরও সম্ভাবনা ছিল যে, মুমিন-মুনাফিক, সত্যবাদী-মিথ্যাবাদী—সবাই এই পথে চলতে থাকবে এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ও তারতম্য থাকবে না।

এভাবে দায়ি (ঈনের দাওয়াত প্রদানকারী) ও জিহাদকারীদের জন্য খোদায়ি যেই নিয়ম রয়েছে, তা শুরু থেকেই তিনটি নিগূঢ় রহস্যের দাবি করে—



প্রথম রহস্য : আল্লাহ তায়ালায় ইবাদত-বন্দেগির লক্ষ্যে নিজেকে বিলীন ও নিঃশেষ করে দেওয়ার গুণ হাসিল করা মানবজাতির প্রতিটি সদস্যের জন্য আবশ্যিক। আল্লাহ তায়ালা যথার্থই বলেছেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি মানব ও জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য।”

দ্বিতীয় রহস্য : বন্দেগি ও দাসত্বের মাঝেই মুকাম্মাফ থাকা এবং আল্লাহ তায়ালায় প্রতিটি হুকুম পালনকে নিজের জন্য আবশ্যিক করে নেওয়া। যেকোনো নারী-পুরুষ বিবেকসম্পন্ন, বয়ঃপ্রাপ্ত এবং সঠিক বিচার-বুন্দির বয়সে উপনীত হলেই সে আল্লাহ তায়ালায় সকল হুকুম ও বিধানপালনের মুকাম্মাফ হয়ে যায়। তাই শরিয়তের যাবতীয় হুকুম পালন নিজের ওপর আবশ্যিক করা, সমাজে সেগুলো প্রচার ও বিস্তারে যত কষ্ট ও নির্ধাতন আসে, সব সহ্য করা এবং সকল কঠিন ও জটিল অবস্থায় ধৈর্য ধারণকে নিজের ওপর আবশ্যিক করে নেওয়া।

তৃতীয় রহস্য : সত্যবাদীদের সত্য আর মিথ্যুকদের মিথ্যা প্রকাশ। সমাজের মুসলিম নামধারী প্রত্যেকেই চামড়ার মুখে খাঁটি মুসলমানিত্ব এবং মনে আল্লাহর ভালোবাসা পোষণের দাবি করে ঠিকই; কিন্তু কার দাবি সত্য আর কার দাবি মিথ্যা—তা অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে বিপদ ও পরীক্ষায় ফেলা এমন দুটি দাঁড়িপাল্লা ও মাপকাঠি, যোগুলো সঠিকভাবে ও বিশুদ্ধ তরিকায় সত্যবাদী-মিথ্যাবাদীর মাঝে সহজেই পার্থক্য করে দেয়। বিপদাপদে যে সফল হবে, সে-ই প্রকৃত সত্যবাদী। আর যে বিফল হবে, সে-ই মিথ্যুক। আল্লাহর কথাই সত্য। তিনি বলেন—

الم. أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

আলিফ লাম মিম। মানুষ কি মনে করে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, অথচ পরীক্ষা করা হবে না? অবশ্যই আমি

তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছে। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন
সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদের।”

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

তোমরা কি ভেবে রেখেছ, এমনি এমনি তোমরা জাহান্নামে চলে যাবে,
অথচ এখনও আল্লাহ দেখেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী
এবং কারা বিপদাপদে ধৈর্যধারণকারী?—

মোটকথা, বান্দাদের ব্যাপারে এটাই যখন আল্লাহ তায়ালার নিয়ম, তখন তা তো
আর পরিবর্তিত হতে পারে না। উপরন্তু এই নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের সাথে নির্দিষ্ট নয়;
বরং সবার সাথেই এবং সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এমনকি সৃষ্টির সেরাদের সেরা নবি-
রাসুলগণের সাথেও। যেমনটি উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

ঠিক এ কারণেই নবিজি সৃষ্টির সেরা এবং আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হওয়া
সত্ত্বেও তাঁকেও বিভিন্ন সময় দুঃখ-কষ্ট এবং জুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।
তাঁর পূর্ববর্তী নবি-রাসুলগণেরও একই ধারাবাহিকতায় কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করতে
হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামকেও কঠিন বিপদ ও জটিল অবস্থার মুখোমুখি হতে
হয়েছে। এমনকি কতক সাহাবি নির্যাতনের শিকার হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারান। কতক
সাহাবি অসহ্যকর অত্যাচারের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করেন।
অথচ তাদের মর্তবা ও স্তর, সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে বহু বহু উঁচু।
তবুও দুনিয়ার জীবনে তাদের নানা ধরনের এবং বহু রকমের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ
সহ্য করতে হয়েছে। কারণ, এটাই আল্লাহ তায়ালার নীতি ও সূন্যাহ।

ইসলামি সমাজব্যবস্থা কয়েকের লক্ষ্যে মুসলিমদের ভোগ করা কষ্ট ও বিপদের
হিসাব-নিকাশ যখন আমরা করি, তখন বুঝতে পারি—এসব কঠিন পরিস্থিতি ও
দুঃখ-কষ্ট কিছুই না যে, এগুলো একজন সাধক বা মুজাহিদকে তার চলার পথে
বাধাগ্রস্ত করতে পারে; যেমনটি কেউ কেউ মনে করেন; বরং যেই পথিক ও মুজাহিদ
অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে আগ্রহী ও ইচ্ছুক এবং এই সফরে বের হয়ে চলতে থাকে, সে

১৩৫ সূরা আনকাবুত, আয়াত : ১-৩

১৩৬ সূরা আল ইমরান, আয়াত : ১৪২



তার চলার পথে এ ধরনের বহু কঠিন পরিস্থিতি ও বিপদাপদের মোকাবিলা করেই চলতে থাকে।

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম যাকে আল্লাহ তায়াল্লা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার মুকাদ্দাফ ও বাধ্য বানিয়েছেন তাকে এই পথে অবশ্যই কিছু না কিছু বাধাবিপত্তির ঘাট পেরোতেই হয়। এটাই নিয়ম। হক ও সত্যের পথে দুঃখ-কষ্ট এবং বাধাবিপত্তি থাকবেই। এ পথ কসুমাস্তীর্ণ ও মসৃণ নয়। কিছু লোক এসব বাধা ভিত্তিয়ে যাবে আবার কিছু লোক জীবন উৎসর্গ করে দেবে। যে যতটুকু কষ্ট সহ্যে পারবে, সে গন্তব্যের ততটুকু কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।

এ কারণেই যত কষ্ট ও দুর্দশাই আসুক না কেন, কোনো পরিস্থিতিতেই একেবারে নিরাশ ও হতাশ হওয়া এবং ভেঙে পড়া কোনো মুসলিমের উচিত নয়; বরং ইসলামের রীতি, স্বভাব ও প্রকৃতিই হলো—একজন মুসলিম হক ও সত্যের পথে চলতে গিয়ে সকল দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ, বাধাবিপত্তি এবং সর্বপ্রকার কঠিন ও জটিল পরিস্থিতিতে এক আল্লাহর হুকুম পালনে সর্বাঙ্গক চেষ্টা এক প্রাণপণ সংগ্রাম ও সাধনা করে যাবে। আর সেসব দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদকে আল্লাহ তায়াল্লা পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ বলে মনে করবে। নিচের আয়াতে চিন্তা-ফিকির করলে এর স্বপক্ষে স্পষ্ট দলিল পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়াল্লা বলেন—

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
 ۖ مَسْتَهْمُ النَّبِئَاتِ وَالصَّارِعَاتِ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
 مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝

তোমরা কি ভেবে রেখেছ, এমনি এমনি তোমরা জাহান্নামে চলে যাবে অথচ
 এখনও তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার সম্মুখীন হওনি? তারা
 কঠিন পরিস্থিতি ও বিপদাপদ এবং ভয় ও শিহরনের মুখোমুখি হয়েছে।
 একপর্যায়ে তৎকালীন রাসূল ও তাঁর মুমিন সাথিরা বলতে বাধ্য হয়েছে,
 কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? শুনে নাও, নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাহায্য
 অতি নিকটে ১০০

যারা ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে মোটামুটি অকাত; কিন্তু মনে করে, হকের পথে যেসব দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ আসে সেগুলো গন্তব্য ও আল্লাহর সাহায্য থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার আলামত ও লক্ষণ, তাদের আল্লাহ তায়াল্লা ‘শুনে নাও, নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে’ বলে জবাব দিয়েছেন।

সেসব লোকের ধারণার খণ্ডন খাঁকাব ইবনে আরাত রা.-এর ঘটনায় গিয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের অপরাধে উদ্ভূত লোহা দিয়ে তার পিঠে ছেক দেওয়াসহ নানা রকম জুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হয়ে তিনি নবিজির কাছে এসব থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতির জন্য দুআর ফরিয়াদ জানালে নবিজির উত্তির ভাবার্থ ছিল—

বিপদাপদে ধৈর্য ধরো। জুলুম-নির্যাতন সহ্য করো। গায়েবি মদত ও সাহায্যের অপেক্ষা করো। এই পথে যদি তুমি দুঃখ-কষ্ট দেখে ভয় পেয়ে যাও, বিপদাপদ দেখে ভড়কে যাও এবং এসব সহ্য করতে না পার, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো—এই রাস্তা এমনই; এবং যারা এক আল্লাহর একত্ববাদের প্রকৃতা ও বিশ্বাসী হয়, তাদের সাথে এমনটাই ঘটে। ব্যতিক্রম ঘটে না। তোমাদের আগে যত উন্মত্ত অতিবাহিত হয়েছে, ধীনের রাস্তায়, ইসলামের পথে তাদেরও অসংখ্য-জগণিত কঠিন পরিস্থিতি ও মহাবিপদের ঘটি পার হতে হয়েছে। তাদের শরীরে লোহার চিবুনি দিয়ে আঁচড়ানো হতো। ফলে তাদের হাড় থেকে গোশত খসে খসে পড়ত। তবুও তারা ইসলামের পথ থেকে বিন্দু পরিমাণ সরে যায়নি।

এখন তোমরা যদি এসব বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট দেখেই একেবারে হতাশ হয়ে যাও বা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাও, তাহলে এটা কেবলই তোমাদের ধারণা। নতুবা সত্য ও বাস্তবতা তো হলো—ওইসব মহাবিপদ, মহাদুর্যোগ ও দুঃখ-কষ্টের চোখে চোখ রেখে সত্যকে আঁকড়ে থাকা এবং সত্যের পথে চলার দ্বারাই বিজয় ও সাহায্যের সাথে আলিঙ্গন করতে হয়। আল্লাহ অবশ্যই তাঁর এই ধীনকে বিজয় দান করবেন। এমনকি এই ধীনের বিজয়ের এমনই প্রভাব হবে যে, ইয়ামানের সানআ থেকে হাজরামাওত একা একা যাওয়ার পথে এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কিছুই ভয় থাকবে না। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, তার ভেড়া বা বকরির পালের ওপর চিতাবাঘের হামলার আশঙ্কা থাকলেও নিজের ব্যাপারে থাকবে একেবারে শঙ্কামুক্ত।



এই হাদিসটিতে নবিজি (ইজিতাকারে) সুবিশাল রোম-পারস্য জয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। অথচ এগুলো বিজয় হয়েছে তাঁর ইশ্বেকালের পর; কিন্তু তিনি এর খবর ও সুসংবাদ তখন দেন, যখন কয়েকজন মাত্র মুসলিম হয়েছেন। তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর নেতৃত্বেই এসব সাম্রাজ্য বিজিত হওয়া ছিল তাঁর সম্মান-মর্যাদা ও ইজ্জতের দাবি। অথচ ইতিহাস রচিত হয়েছে তাঁর অনুসারীর নেতৃত্বে বিজয় হওয়ার মধ্য দিয়ে। এর রহস্য বা ভেদ কী, তা কেবল আল্লাহ তায়ালাই জানেন; কিন্তু সফলতা অর্জনের সূত্র ভিন্ন।

সাহায্যে কিরাম নবিজির জীবদ্দশায় (জাজিরাতুল আরব জয়ের মূল্য পরিশোধ করতে পারলেও) ইরাক-শামে বিজয় লাভের পুরোপুরি মূল্য আদায়ে সক্ষম হননি। অথচ সফলতা অর্জনে পূর্ণমূল্য পরিশোধ জরুরি ছিল। অন্যথায় সফলতা ধরা দিচ্ছিল না; যদিও স্বয়ং নবিজি ছিলেন তাদের মাঝে বিদ্যমান।

এখানে মনে রাখা উচিত, শহরের পর শহর জয় করাকে নবিজির নাম বা তাঁর নেতৃত্ব বা তাঁর তত্ত্বাবধানের সাথে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি মূল নয়। কারণ, তিনি তো সৃষ্টির সূচনা থেকেই আল্লাহ তায়ালায় সবচেয়ে প্রিয়; বরং যারা মুসলিম হিসেবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে বাইয়াত হয়েছে, তারা বাইয়াতে সত্যবাদী এবং আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষার্থে খুশি ও আগ্রহের সাথেই তাঁর ফয়সালার ওপর প্রতিষ্ঠিত; এটা প্রমাণ করে দেখানোই আসল ও প্রকৃত বিষয়। আর এগুলোই বিজয় ও আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য জরুরি। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۖ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের থেকে তাদের জানমাল কিনে নিয়েছেন এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জন্মাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতঃপর মারে এবং মরে।

* * *





আপসের সব ব্যর্থ চেষ্টা

ইবনে ইসহাক থেকে ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন—

কুরাইশদের বিখ্যাত নেতা ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব উতবা ইবনে রবিয়া একবার কুরাইশদের এক বৈঠকে বলল—ভাইয়েরা, তোমাদের কী মত বলো তো, আমি যদি কিছু প্রস্তাব নিয়ে মুহাম্মাদের কাছে যাই এবং তার সাথে আলাপ-আলোচনা করি, আর সেও রাজি হয়, তাহলে কেমন হয়?

কুরাইশরা বলল—কেন যাবে না! অবশ্যই, তুমি তাড়াতাড়ি যাও এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলো।

বৈঠকের সিদ্ধান্তক্রমে উতবা নবিজির কাছে এসে মুখোমুখি বসে। সে বলা শুরু করে—ভাতিজা, তুমি তো জানো, বংশের লোকদের মাঝে তোমার মর্যাদা ও বংশীয় সম্মান সবাব থেকে আলাদা; কিন্তু তারপরও তুমি লোকদের সামনে বড়ো বিপদ দাঁড় করিয়ে দিয়েছ। তুমি ঐক্যের মাঝে বিভেদের ডঙ্কা বাজিয়ে দিয়েছ। এবং শ্রম্বেয় মৃত বুদ্ধিজীবীদের নির্বোধ বলে অভিহিত করেছ। আমার কথা শোনো। আমি তোমার সামনে কিছু প্রস্তাব ও পরামর্শ রাখছি। সেগুলো নিয়ে তুমি চিন্তা-ফিকির করলে কিছু কিছু হয়তো সমর্থন করবে।

নবিজি বলেন—ঠিক আছে, আবুল ওয়ালিদ, বলো। আমি শুনছি।

সে বলল—ভাতিজা, যেই ধ্বিনের দাওয়াতের কাজ তুমি শুরু করেছ, এর দ্বারা যদি তোমার সম্পদশালী হওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা কথা দিচ্ছি—আমরাই তোমাকে এত অর্থকড়ি দেবো যে, তুমিই হবে আমাদের মধ্যে সর্বশীর্ষ



ধনী। অথবা তোমার দাওয়াতের দ্বারা যদি সম্মান, মর্যাদা ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের আশা করে থাকো, তাহলে বলো, আমরা নির্বাচন ও ইলেকশন ছাড়াই এককথায় তোমাকে আমাদের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মেনে নিতে রাজি আছি। এমনকি একটি কাজও তোমার অজান্তে বা তোমার স্বাক্ষর ব্যতীত হবে না।

আর যদি তোমার ওপর কোনো জিনের আছর পড়ে থাকে এবং তোমার মনে হয়, সেই আছর দূর করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে বলো—আমরা তোমার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ কবিরাজ (ডাক্তার) নিয়ে আসি। সে তোমার পূর্ণাঙ্গ সুস্থতা লাভ পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়ে যাবে এবং সকল ব্যয়ভার আমরা বহন করব।

নবিজি বললেন—আবুল ওয়ালিদ, তোমার কথা শেষ হয়েছে?

আবুল ওয়ালিদ বলল—হ্যাঁ।

নবিজি বললেন, এবার আমার কথা শোনো—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمِّ تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كِتَابُ فَصَلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا غَرِيْبًا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرِ مَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। হা-মিম। পরম করুণাময় অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এই কুরআন। এটা এমন গ্রন্থ—যার আয়াতগুলো আরবি ভাষায় বিস্তারিতভাবে ভুলে থরা হয়েছে বিচার-বুখিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য। এই গ্রন্থ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। তবুও অধিকাংশ মানুষ বিমুগ্ধতা প্রদর্শন করেছে। ফলে তারা শোনে না। তারা বলে—তোমার আহ্বানকৃত বিষয়ের ব্যাপারে আমাদের অন্তর মোড়কবদ্ধ। আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং আমাদের ও তোমার মাঝে রয়েছে অন্তরায়। সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো, আমরাও আমাদের কাজে লিপ্ত। আপনি বলে দিন—আমিও

তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তবে আমার কাছে এই মর্মে ওহি আসে যে, তোমাদের সকলের উপাস্য একজন। কাজেই তোমরা তাঁর অভিमुखেই দৃঢ় থাকো এবং (আপনি) তাঁর কাছেই কমাপ্রার্থনা করুন। আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য।—

নবিজি এভাবে তিলাওয়াত করতে থাকলেন আর উতবাও মস্তমুশ্ব ও আশ্রহারা হয়ে শুনতে থাকল। একপর্যায়ে নবিজি যখন ১৩ নম্বর আয়াতে পৌঁছেন, যার অর্থ হলো—

এরপরও তারা যদি বিমুখতা প্রদর্শন করে, তাহলে আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের আদ-সামুদের বিক্ষসী শক্তির মতো শক্তির ভয় দেখাচ্ছি।

উতবা তখন নবিজির মুখ চেপে ধরে। তিলাওয়াত বন্ধ করতে বলে এবং আশ্রীয়তার দোহাই দেয়। কারণ, এই আয়াতে প্রদত্ত ধমকিতে সে ভয় পেয়ে যায়। তারপর সে কুরাইশদের বৈঠকে ফিরে যায়।

সে বৈঠকে গিয়ে বসতেই সবাই তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করল—আবুল ওয়ালিদ, কী ব্যাপার? কী সুরাহা করে এলে, বলো?

তখন সে তাদের বলল—খোদার কসম! আজকে আমার কানে যেসব কথা ঢুকেছে, সেগুলো ইতঃপূর্বে আমি কখনো শুনিনি। সেগুলো কবিতাও না। জাদুমন্ত্রও না। আবার গণক বা জ্যোতিষী কথাবার্তাও না।

হে কুরাইশের লোকেরা, তোমরা যদি আমার কথা মানো এবং আমার পরামর্শের মূল্যায়ন করো, তাহলে তোমরা তাঁকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দাও। খোদার কসম! আমি তাঁর মুখ থেকে যেসব কথা শুনছি, সেগুলো সাধারণ কোনো কথা নয়; বরং অমর বাণী ও মহাসংবাদ। সেগুলো বাস্তবায়িত হবেই। আরবরা যদি তাঁর ওপর বিজয়ী হয়, তাহলে তাঁর সাথে দ্বন্দ্ব নিরসনে অন্যরাই তোমাদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট এবং তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের লড়াইয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। বিপরীতে সে যদি আরবের ওপর জয়লাভ করে, তাহলে তাঁর রাজত্ব মানে তোমাদেরই রাজত্ব এবং তাঁর ইচ্ছা মানে তোমাদেরই ইচ্ছা।



কুরাইশপ্রধানরা বলল—আবু ওয়ালিদ, খোদার কসম! সে তোমার ওপর জাদুমন্ত্র ফুঁকে দিয়েছে।

সে বলল—আমার মত এটাই। এবার তোমাদের মর্জি।

ইমাম তাবারি ও ইবনে কাসিরসহ অন্যান্য সিরাত বিশেষজ্ঞ বর্ণনা করেন—

ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা ও আস ইবনে ওয়ালেসহ মুশরিকদের একটি প্রতিনিধিদল নবিজির কাছে আসে। তারা তাঁর সামনে কয়েকটি প্রস্তাবনা পেশ করে। বলে, আমরা তোমাকে এত ধনদৌলত ও অর্থকড়ি দেবো যে, তুমি আমাদের মধ্যে সর্বশীর্ষ ধনী হয়ে যাবে। এবং চিন্তাকর্যক ও বোড়শী কুমারী দুই মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে পার। তবে...

সবকিছুর ক্ষেত্রে শর্ত একটাই—আমাদের দেবতা ও উপাস্যদের নিন্দাবাদ ও দোষচর্চা তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে এবং আমাদের চিরাচরিত রীতিনীতি ও প্রচলিত সামাজিক প্রথার ওপর সমালোচনা ও দোষারোপ তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

নবিজি স্পষ্টভাবে এসব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের প্রস্তাব অস্বীকার করেন। এরপর দাওয়াতের প্রাপ্ত দায়িত্বে লেগে থেকে তাদের দাওয়াতগ্রহণে পীড়াপীড়ি করলে তারা বলে—

ঠিক আছে, আমরা আরেকটি প্রস্তাব দিই : একদিন তুমি আমাদের দেবতাদের উপাসনা করবে, আরেক দিন আমরা তোমার রবের ইবাদত করব।

তখন নবিজি তাদের এই ফালতু প্রস্তাব তাদের দিকেই ছুড়ে মারেন এবং তাদের আবোল-তাবোল কথাকে স্পষ্ট করতে গিয়েই নাখিল হয়—

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ
دِينِ ۝

আপনি বলে দিন, হে কাকির সমাজ, তোমরা যেগুলোর ইবাদত করো, আমি সেগুলোর ইবাদত করি না। আবার আমি যার ইবাদত করি, তোমরা



তাঁর ইবাদত করো না। তোমরা যোগুলোর ইবাদত করো, আমি সেগুলোর ইবাদত কখনোই করব না। আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদত করো না। তোমাদের ধীন তোমাদের জন্য, আমার ধীন আমার জন্য ৷

কুরাইশরা উতবার মতো দ্বিতীয়বার চেষ্টা চালায়। নেতৃস্থানীয় সবাই দ্বিতীয়বার একজোট হয়ে নবিজির কাছে এসে আগের মতো খনদৌলত ও নেতৃত্ব-রাজত্ব—এসবেরই লোভ দেখায়। পাশাপাশি এ কথাও বলে—

তোমার ওপর যদি জিন-ভূতের কোনো আছর পড়েছে বলে মনে করো, তাহলে বলো, আমরা সেটার চিকিৎসা করিয়ে দিই।

কিন্তু প্রত্যুত্তরে নবিজি বলেন—

তোমাদের যা খুশি বলতে পারো। আমি কোনো রোসী নই। তোমাদের কাছে খনদৌলত, নেতৃত্ব-রাজত্ব ভিক্ষা করতে আমি আসিনি; বরং আল্লাহ তায়্যাল্লা রাসূল হিসেবে আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। আমার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাদের জাভ্রাতের সুসংবাদ দিই আর জাহল্লামের ভয় দেখাই। সুতরাং আমি তোমাদের আমার রবের বার্তা এবং সঠিক উপদেশ পৌঁছে দিয়েছি। এখন যদি তোমরা সত্য বার্তা কবুল করে নাও, তাহলে তা তোমাদের দুনিয়া-আখিরাতের জন্য কল্যাণের কারণ হবে। আর যদি একে প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর যা ফয়সালা, তাতে আমি মৈর্ষধারণ করব। তোমাদের শাসাতে থাকব। এভাবে একসময় আল্লাহ আমার এবং তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন।

কুরাইশরা বলে—

তুমি যদি আমাদের কোনো প্রস্তাব কবুল না করো, তাহলে তুমি তো ভালোই জানো, আমাদের এই এলাকা খুবই সংকীর্ণ এবং অনেকটা বসবাস অযোগ্য। এখানে পানির কত অভাব। আমাদের জীবনধারণ কতটা মুশকিল ও কষ্টকর। কাজেই তোমার দাবি অনুযায়ী তোমার যেই রব তোমাকে নবি বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে আবদার করো, তিনি যেন এই শক্ত ও পাথুরে পর্বতমালাকে সরিয়ে দেন। শাম-ইরাকের মতো



এখানেও আমাদের জন্য নদী-নালা প্রবাহিত করেন। আমাদের পরলোকগত বাপ-দাদাদের আবার জীবিত করে দেন এবং তাদের মধ্যে কুসাই ইবনে কিলাবকে অবশ্যই লাগবে। কারণ, তিনি বড়ো সত্যবাদী ছিলেন। তাই তাকে আমরা তোমার আনিত এই পয়গাম ও বার্তার বিষয়ে জিজ্ঞেস করব, এগুলো সত্য না মিথ্যা? এবং তুমি তোমার রবের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন তোমাকে আলিশান অটালিকা, মনোরম উদ্যান ও সোনা-রূপার খনি দান করেন। যেন তুমি এই ফকিরি জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে বাদশাহি জিন্দেগি লাভ করো।

আমরা তোমার কাছে যা যা আবদার করেছি, তুমি যদি সেগুলো ঠিক ঠিক করে দেখাতে পারো, তাহলে আমরা তোমার সত্যায়ন করব এবং আল্লাহর দরবারে তোমার যেই মর্যাদা ও মর্তবা, তাও আমাদের জানা হবে যে, তিনি তোমাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

এই আবদারের পরিপ্রেক্ষিতে নবিজি স্পষ্ট জানিয়ে দেন—

আমি কখনোই এমন করব না এবং আল্লাহর কাছে এ বিষয়ে কোনো দুআ-প্রার্থনাও করব না।

তারপর কুরাইশরা দীর্ঘ আলাপচারিতা শেষ করে নবিজিকে বলে—

নিঃসন্দেহে আমরা জানতে পেরেছি, ইয়ামামার ‘রহমান’ নামক এক লোক তোমাকে সব শিখিয়ে দেয়; কিন্তু আমরা তো কখনো ওই রহমান নামক লোকের ওপর ঈমান আনব না। আর মুহাম্মাদ, আমরা আমাদের এই অপারগতা প্রকাশ করছি। এবং খোদার কসম! আমরা তোমাকে ছাড়ব না। হয়তো তুমি মরবে অথবা আমাদের শেষ করবে। এসব হুমকি-ধামকি দিয়ে তারা উঠে চলে যায়।

* * *

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

নবিজির জীবনীর এই পর্বে তিনটি হিকমত (নিগূঢ় রহস্য) রয়েছে। এবং তিনটিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়ে আমরা সেগুলো আপনার সামনে তুলে ধরব—

প্রথম হিকমত

নবিজির জীবনীর এই অংশে গভীর চিন্তা-ফিকির ও ভাবনার পরে তাঁর দাওয়াতি মিশনের আসল ও প্রকৃত উদ্দেশ্য আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সাথে সাথে স্পষ্ট হয় বর্তমান সময়ে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনাকারী ও ইসলামি আন্দোলনের দাবিদারদের মনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও।

নবিজি কি তাঁর সংগ্রাম মুখর দাওয়াতি কার্যক্রমের আড়ালে রাজত্ব বা নেতৃত্ব কামনা করেছেন? নাকি পদ বা ধনদৌলত লাভের প্রত্যাশী ছিলেন? (নাউজুবিল্লাহ) নাকি কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে ওইসব ধ্যানধারণা সমাজে ছড়িয়েছেন?

এগুলো খাঁটি মুসলিমদের কাছে অনর্থক চিন্তা হলেও এমন কিছু সম্ভাবনা, যোগুলোকে ইসলামের শত্রু ও ইসলামের বিপক্ষীয় বুদ্ধিবৃত্তিক কুসেডাররা ঠিকই রংচ মাথিয়ে মানুষের সামনে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পেশ করে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল ও হাবিবের জীবনকে এত সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ ভেদ ও রহস্যে ভরপুর করে রেখেছিলেন এবং তাঁর নবির জীবনকে এত স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন চাক্ষুষ প্রমাণ ও ঘটনাবহুল করেছিলেন, যোগুলো সর্বপ্রকার সন্দেহ ও সব ধরনের সম্ভাবনার শিকড় উপড়ে ফেলেছে এবং সব রকমের কুমন্ত্রণার পথ ব্লক্ষ করে দিয়েছে। যে কারণে ইসলামের বিপক্ষীয় বুদ্ধিবৃত্তিক কুসেডাররা তাদের উগড়ে দেওয়া সকল ষড়যন্ত্রে বিফল ও ব্যর্থ। আর তাদের মাথায় ধরে না, তাদের আর কী করণীয় আছে?

কুরাইশদের মনে নবিজির নবুয়ত নিয়ে ছিল হাজার রকমের সন্দেহ ও সংশয়। এ নিয়ে তারা নবিজির সাথে প্রাইভেট এবং কমিটি—দুই ধরনের মিটিংই করেছে।



শিকহস সিরাহ

এতে আল্লাহ তায়ালার অনেক বড়ো রহস্য লুকানো ছিল। কারণ, কুরাইশরা সন্দেহ পোষণ করলেও নবিজির দাওয়াত ও রিসালাতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভালো করেই জানত। তারা জানত, তিনি তাদের কোনো লোভনীয় প্রস্তাব গ্রহণের লোক নন; কিন্তু এতে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল, ভবিষ্যতে ও পরবর্তীকালে ইসলামের দুশমন এবং দ্বীনের বিপক্ষে সন্দেহ সৃষ্টি ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই পরিচালনাকারীদের ইতিহাস যেন সর্বযুগে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে যে, নবিজিকে নিয়ে তাদের উদ্ভাবিত সন্দেহ ও সংশয় সবই সম্পূর্ণ ভুল ও বানোয়াট।

ইসলামের বিরুদ্ধে এই বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের অধীনে স্যামুয়েল নোয়াহ ক্র্যামার- ও জেরলফ ভ্যান ফ্লোটেন- এক দীর্ঘ গল্প প্রসব করেছে। রাতদিন একাকার করে জালিয়াতি ও ভিত্তিহীন অলীক কথা উগরে দেওয়ার সর্বাস্বক চেষ্টা ও তদবির তারা চালিয়েছে; কিন্তু তবুও সন্দেহ ঢোকানো এবং ষড়যন্ত্রের মেশিনে তাদের হাতে কিছুই ধরা পড়েনি; বরং শেষ পর্যন্ত তারা সত্য ও বাস্তবতা এড়িয়ে চোখ বন্ধ করে পাগলের প্রলাপ বকে গেছে—(নাউজুবিল্লাহ)—

নবি মুহাম্মাদ তার দাওয়াতি কার্যক্রমের আড়ালে রাজত্ব ও নেতৃত্ব লাভের আশায় ছিলেন!

এরা তো উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শকুন। এদের বহু আগে উতবা ইবনে রবিয়া ও তাদের সমমনা লোকদের থেকেও আল্লাহ তায়ালার এই কাজটাই নিয়েছেন। তারা নবিজির সামনে সেসব প্রস্তাব ও অফারই পেশ করে, যেন তিনি সন্তুষ্টচিত্তে সেগুলো গ্রহণ করে নেন। তিনি গ্রহণ করে নিলে কুরাইশরা তার অনুসারী হয়ে যেত। তাঁকে এবং তাঁর সাহাবিদের কষ্ট ও নির্যাতনের সকল গ্লান-প্রোগ্রাম বর্জন করত; কিন্তু তিনি কি তা-ই করেছিলেন? বরং যদি তাঁর রিসালাত ও দাওয়াতের আড়ালে এসব দৃঢ় বিষয়ই থাকত, তাহলে তিনি এই সুযোগকে গনিমত মনে করে কেন নশ্রতা ও নমনীয়তার আচরণ করেননি?

আচ্ছা, বিবেক দিয়ে একটু চিন্তা করা যাক—কেউ রাজত্ব ও নেতৃত্ব কামনা করে। তার জাতি ও এলাকাবাসী তাকে সেই অফারও দিচ্ছে এবং আপসূক্তির আকারে তার কাছে সমর্পণ করছে। এই অফার গ্রহণের বিনিময়ে মান-সম্মান ও ইজ্জত-

১৪১ স্যামুয়েল নোয়াহ ক্র্যামার (shemuel Noah cremer : ১৮৯৭-১৯৯০) একজন ঐতিহাসিক। সুমেরি সভ্যতার গবেষণায় তিনি কাজ করেছেন।

১৪২ জেরলফ ভ্যান ফ্লোটেন (Gerlof van Vloten : 1866-1903) একজন প্রাচ্যবিদ। *মাকাতিলুল উলুম* আলবি বিশ্বকোষ তার হাতে সম্পাদিত।



মৰ্হাদা সব, সবই দেওয়ার গ্যারান্টিও দিচ্ছে। উলটো এই অকার অস্বীকারে নানা রকম হুমকি-থামকিও দিচ্ছে। এত কিছু পরও কি সেই লোক তাদের বলতে পারে—

আমি যেই সত্যের বাণী নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি, তার বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে খনদৌলত ইত্যাদি কিছুই চাই না। আমি তোমাদের থেকে মান-সম্মান-ইজ্জতও চাই না। তোমাদের রাজা বা রাষ্ট্রপতিও হতে চাই না; বরং আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমার ওপর কিতাব নাজিল করেছেন এবং তোমাদের সুসংবাদ শোনানো ও ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা যদি আমার এই বার্তা কবুল করে নাও, তাহলে তা তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের উত্তম অংশ হবে। আর যদি তোমরা একে প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর যা কয়সালা, তাতে আমি ধৈর্যধারণ করব এবং আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর কয়সালার আগমপৰ্বন্ত তোমাদের শাসাতে থাকবে।

নবিজির সামাজিক জীবন ও তার জীবনযাপনের পদ্ধতি তার এই উক্তিমাফিকই ছিল। এমন ছিল না যে, বড়ো মুখে সবার সামনে নেতৃত্ব ও রাজত্ব একবাক্যে অস্বীকার করেছেন; কিন্তু তলে তলে সেগুলো অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁর খাবারদাবার খুবই সাধারণ ও সাদাসিধে ছিল। তাঁর সামাজিক জীবন ফকির-মিসকিনদের চেয়ে উন্নত ছিল না।—

ইমাম বুখারি রহ. আম্মাজ্জান আরিশা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন—

নবিজির ইন্তেকালের সময় আমার ঘরের ছোটো সেলফ-এ অল্প কিছু যব ছিল। এ ছাড়া খাওয়ার আর কিছুই ছিল না। শেষমেশ ওই অল্প যবই কিছুদিন পর্যন্ত খাই।

ইমাম বুখারি রহ. আনাস রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন—

১৪৩ নবিজি এই দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন অবলম্বন করেছেন আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়ে। এমন নয় যে, আল্লাহ তায়াল্লাই তাঁকে এ অবস্থায় রাখতে চেয়েছেন; বরং নিজেই তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন। সূত্র : *কাওতুল বায়ি*।



নবিজি সারাজীবন (আয়েশি ও সম্পদশালীদের ব্যবহৃত বিশেষ) দস্তুরখানে
খাবার খাননি এবং তিনি জীবনে কখনো চাপাতি (পাতলা, মিহি ও সফট)
রুটি খেয়ে দেখেননি।

অনুরূপ তিনি পোশাক-আশাক ও ঘরের জিনিসপত্রের ব্যাপারেও খুবই সাদামাটি এবং
একেবারেই হালকা আয়োজনের পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি খেজুরের চাটাই বা
পাটিতে বিশ্রাম নিতেন। ফলে তাঁর বরকতময় পিঠে চাটাইয়ের স্পষ্ট ছাপ ও দাগ
পড়ে যেত এবং কখনো আরামদায়ক বিছানায় শোয়া পছন্দ করতেন না।

একবার আশ্মাজান আয়িশা রা.-সহ সকল স্ত্রী একসাথে নবিজির কাছে এসে
অভাবের অভিযোগ তোলেন এবং সবাই মিলে ভরণপোষণ, পোশাক-পরিচ্ছদ,
সাজসজ্জা ও বিলাসসামগ্রীর বাজেট বৃদ্ধির আবেদন করেন; যেন সাহাবায়ে কিরামের
স্ত্রীদের থেকে তাদের অবস্থা ভালো ও উন্নত দেখায় এবং তাদের মর্যাদা বেশি
থাকে; কিন্তু একপর্যায়ে তাদের এই আবেদনের পরিপরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়াল্লা
নাখিল করেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزَوِّجَكِ إِن كُنْتِ تَرْضَيْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنِ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّخُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِن كُنْتِ تَرْضَيْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا
عَظِيمًا

হে নবি, আপনি আপনার স্ত্রীদের বলে দেন—যদি তোমরা পার্থিব জগৎ
এবং এর বিলাসিতার প্রত্যাশী হয়ে থাকো, তবে আসো, আমি
তোমাদের সম্পদ ও ভোগসামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং তারপর অতি
উত্তমভাবে তোমাদের বিদায় দিই। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল
ও আশিরাত কামনা করো, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের
সৎকর্মশীলদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মহাপ্রতিদান।

নবিজি আয়াত দুটি তাদের সামনে তিলাওয়াত করেন। মহান আল্লাহর ফরমান
শুনিয়ে তিনি তাদের ইচ্ছাধিকার দেন—ইচ্ছা হলে তাঁর চাহিদা মোতাবেক এই
দারিদ্র্যপূর্ণ অবস্থায় তাঁর সজ্জা দিতে পারে। আর না চাইলে এবং বেশি ভরণপোষণ,



সৌন্দর্য-সজ্জার জিনিসপত্র এবং ধনসম্পদের গীড়াপীড়ি করলে তিনি তাদের মৃত্তি দিয়ে দেবেন এবং উত্তমভাবে ছেড়ে দেবেন। এই অতীতিকর ও ভীতিকর কথা শুনে সব স্ত্রী দ্বিতীয় কোনো পথ না খুঁজে তাঁর সাথেই এই সাদাসিধে জীবন কাটাতে একবাক্যে সম্মতি জানান।

এত সব বিবরণ ও বর্ণনা থাকার পরও একজন বিবেকবান ও বুদ্ধিমান লোকের মনে তাঁর সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ জাগতে পারে? বা কীভাবে কারও ধ্যানধারণায় আসতে পারে, তিনি রাজত্ব-নেতৃত্ব বা ধনদৌলতের লোভী ও প্রত্যাশী ছিলেন?

নবিজির জীবনের এসব ঘটনাবলি স্পষ্ট সাক্ষী, তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম পুরোপুরি ও একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবেক ছিল। এতে দুমিরাবি কোনো চাহিদা বা লোভ-লালসার লেশমাত্রও ছিল না।

দ্বিতীয় হিকমত

এই আলোচনা থেকে ওই ‘হিকমত’-এর অর্থ স্পষ্ট হয়, যেই অর্থ নবিজি বেছে নিয়ে সেই অনুযায়ী আমল করেছেন। দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনায় যেকোনো প্রকারের বা যেকোনো অবস্থার তদবির ও কৌশল অবলম্বনের নামই কি হিকমত? নিজের উদ্দেশ্য হাসিলে যেকোনো পথে চলা বা যেকোনো উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা, যদিও তার লক্ষ্য ঠিক ও বিশুদ্ধ হোক না কেন, শরিয়তপ্রণেতা কি তার অনুমতি কাউকে দিয়েছে?

এর সুস্পষ্ট উত্তর হলো—না।

ইসলামি শরিয়ত মানবজীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গন্তব্য যেভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই গন্তব্যে পৌঁছার মাধ্যম ও উপায়-উপকরণও সুনির্দিষ্ট ও বরাদ্দ করে দিয়েছেন। শরিয়ত সবার ওপর আবশ্যিক করে দিয়েছে—আল্লাহ তায়ালার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছতে (কুরআন-সূরাহয়) বর্ণিত ও নির্ধারিত পথ ও পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। হিকমত ও তদবিরের বিভিন্ন ও গ্রহণযোগ্য একাধিক অর্থ রয়েছে; কিন্তু কেবল এগুলোই বৈধ ও শরিয়তসম্মত উপায় ও মাধ্যমের সীমারেখা।

উপর্নুক্ত ঘটনাগুলোই এর প্রমাণ। হিকমত ও তদবিরের ক্ষেত্রে এই কল্পনা বা চিন্তা করাও যেতে পারে যে, রাজত্ব ও নেতৃত্ব লাভ এবং মনে মনে পরবর্তী সময়ে এই



রাজত্ব ও নেতৃত্বকে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার শক্তিশালী মাধ্যম বানানোর দৃঢ় প্রত্যয় করে নেওয়ার শর্তেও তো নবিজি আপস ও মীমাংসা করতে পারতেন। বিশেষ করে যখন শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তৃত্ব হাসিল হয়, তখন তিনি প্রজাদের দিয়ে যেকোনো কাজ করাতে সক্ষম হন। (সেহেতু তিনিও প্রথমে শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে তারপর সরকারি ও রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞাপন জারি করে আদ্বাহর ধীন কায়েম করতে পারতেন।) আর সকলের মনে রাখা উচিত—বিভিন্ন মতবাদ ও মতাদর্শের আহ্বায়করা কিছু শাসনদণ্ড হাতছাড়া করতে রাজি নয়; যেন শাসনের মুগুর দেখিয়ে নিজেদের চিন্তাধারা ও মতবাদ গ্রহণে সবাইকে বাধ্য করতে পারে। সুতরাং নবিজিও কি তা-ই করতে পারতেন না?

কিন্তু না। নবিজি এই হিকমতে আমলি (রাষ্ট্রদর্শন) ও দাওয়াতের এই মাধ্যম পছন্দ করেননি। কারণ, এটা সরাসরি দাওয়াতের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

এ ধরনের রীতিনীতিকে যদি বিশুদ্ধ হিকমত ও সঠিক কৌশলের প্রকারভূক্ত বলা হয়, তাহলে সত্যবাদীর সত্য এবং মিথ্যুক ধোঁকাবাজের ধোঁকা ও মিথ্যার মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। অনুন্নত মুখলিস দায়ি আর মিথ্যুক ধোঁকাবাজকে এই হিকমত ও কৌশলের নামে এক পথের যাত্রী মনে হবে।

এই ধীন ইসলাম ও শরিয়তে মুহাম্মাদির দর্শন মাধ্যম ও লক্ষ্য গ্রহণে উৎকর্ষ ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্য যেভাবে সততা, উৎকর্ষ ও হকের বাগীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্যতীত সঠিক হতে পারে না, ঠিক সেভাবে ওই লক্ষ্য পর্যন্ত উপনীতকারী মাধ্যমকেও সততা, শরিয়ত ও হকের বাগীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

এ থেকে বোঝা যায়—দায়িদের অধিকাংশ অবস্থায়ই কুরবানি ও জিহাদ (তাগ ও সংগ্রাম)—এর প্রয়োজন হয়। কারণ, তাদের অনুসৃত পথ তাদের মন খুশিমতো ডান-বামে চলতে দেয় না।

এই চিন্তা নিতান্তই ভুল ও বেঠিক যে, দাওয়াতের কাছে হিকমত অবলম্বনের উদ্দেশ্য হলো—এই কাজকে সহজ ও কষ্টহীন করা বা দায়িকে দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখা; বরং উদ্দেশ্য হলো—এমন কিছু কৌশল ও টেকনিক গ্রহণ করা, যোগুলো মানুষের বিবেকের খুবই ঘনিষ্ঠ। এর অর্থ, যখন অবস্থা বিভিন্ন ধরনের হবে এবং



দাওয়াতের পথে বিদ্রোহ ও হঠকারিতার নানা প্রাচীর দাঁড় করানো হবে তখন হিকমত হলো—জিহাদের প্রত্নুতি গ্রহণ করা এবং জ্ঞানমাল উৎসর্গের জন্য তৈরি হওয়া। আর বাকি সময় হিকমত হলো—প্রতিটি বিষয়কে যথাযথানে রাখা। অর্থাৎ যেই কাজ যখন প্রয়োজন, সেটাকে তখন করা। এই হলো হিকমত ও যৌকবাজির মাঝে পার্থক্য এবং অনুপূর্ণ হিকমত ও আপসের মাঝেও এটাই পার্থক্য।

পাঠকের জ্ঞানা আছে, একবার নবিজির দরবারে কয়েকজন কুরাইশ নেতা আসে এবং ইসলামকে বুঝতে আগ্রহ প্রকাশ করে। নবিজি তখন খুশিমনে পুরোপুরি তাদের প্রতি মনোযোগ দেন। তাদের সাথে আলাপচারিতায় মগ্ন হোন। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে তাদের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে থাকেন। তাদের ইসলামের স্বরূপ বোঝাতে থাকেন। এমতাবস্থায় একজন অশ্ব সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবিজির তালিমের আগ্রহ শুনে তিনিও দাঁড়িয়ে যান এবং এক-দুইটি প্রশ্ন করেন। নবিজি যেহেতু কুরাইশদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করছিলেন, তাই অশ্ব সাহাবির কথাকে গুরুত্ব দেননি; এই চিন্তায় যে, তার জিজ্ঞাসার উত্তর পরেও দেওয়া যাবে। আপাতত কুরাইশদের সাথে আলোচনা শেষ হোক; কিন্তু এই সামান্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই আচরণকে তিরস্কার করে নাজিল করেন—

عَبَسَ وَتَوَلَّى. أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ

সে ভ্রু কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। তাঁর কাছে একজন অশ্ব এসেছে (বলে) ১৮

কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা চলাকালে অশ্ব সাহাবির জিজ্ঞাসাকে গুরুত্ব না দেওয়ার ব্যাপারে নবিজি যেই ইজতিহাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তা পছন্দ করেননি। যদিও বিষয়টি কিছু তেমন বড়ো কিছু নয় ১৮ কারণ, তিনি তখন তাদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। (অর্থাৎ প্রাপ্ত দায়িত্বই পালন করছিলেন।) কিন্তু তারপরও এই

১৪৭ সূরা আবাসা, আয়াত : ১ ও ২

১৪৮ নবি-রাসুলকে আল্লাহ তায়ালা মনবজাতির আদর্শ ও অনুসরণীয় বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তাই তাঁর যাবতীয় মানব হলো তাঁদের নিদর্শন ও শিক্ষার স্রোত। তবে মানবজাতির করণে কখনো কোনো বিষয়ে তাঁদের থেকেও চিন্তা ও গবেষণাগত ভুল স্বাভাবিকভাবে হয়ে গেছে। শরিয়তের পরিভ্রাণ একে ‘ইজতিহাদি খাতা’ বলে। আল্লাহ তায়ালায় সন্নিবেশ মানবের এই ইজতিহাদি ভুল ক্ষমাবোধ। কিন্তু মওলুবি সাহেব নবিগণের এই ক্ষমাবোধ্য ভুলকেও সাধারণ মানবের পাপের সমপর্যায়ের গণ্য করে বিভ্রান্তির পথ বাড়িয়েছেন। (দাবুল ইকতা অনলাইন : দেওবন্দ) [অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত]



কিকছস সিরাহ

উপেক্ষা যেহেতু একজন মুসলিমের মনঃকষ্টের কারণ হয়েছে, তাই আল্লাহ তায়ালা দাওয়াতের কাছে এ ধরনের ছোটো ও সামান্য বিষয় থেকেও বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, নবিজি মুশরিকদের মন খুশির লক্ষ্যে অশ্ব সাহাবিকে এড়িয়ে যান। এতটুকুও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

সারসংক্ষেপ : হিকমত ও নসিহতের নাম দিয়ে ইসলামের বিধিবিধান ও মৌলিক বিষয়ে পরিবর্তন ও বদল বা ইসলামের দণ্ডবিধির সীমালঙ্ঘন বা দণ্ডবিধিকে গুরুত্বহীন মনে করা কোনো মুসলিমের জন্য অনুমোদিত নয়। কারণ, যেসব হিকমত ও কৌশল ইসলামের বিধিবিধান, দণ্ডবিধি ও উত্তম চরিত্রের আওতাভুক্ত, সেগুলোই শুধু শরিয়তে গ্রহণযোগ্য।

ভূমির হিকমত

কুরাইশরা যখন দাওয়াতের কাজ বাদ দেওয়ার শর্তে নবিজিকে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করে এবং নবিজিকে রাজত্ব ও নেতৃত্বের লোভ দেখায়, তখন নবিজি তাদের জবাবে যেই দিক অবলম্বন করেছেন, তাতে আমাদের জন্য বহু শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। নবিজি এই অবস্থান আল্লাহ তায়ালা সাহায্য ও সমর্থনে অবলম্বন করেছেন। সকল মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, এই প্রেক্ষাপটেই নিচের আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَقَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بَالِلِهِ وَالْمَلَانِكَةِ قَبِيلًا. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْفَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِزُفَيْكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

আর কান্নার বলে—আমরা তোমার প্রতি ততক্ষণ ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্য ঝরনা প্রবাহিত করবে অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙুরের কোনো উদ্যান তৈরি হবে; যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় নদী-নালা প্রবাহিত করবে। অথবা তোমার কথানুযায়ী তুমি আমাদের ওপর আসমানকে টুকরো টুকরো করে পতিত করবে। অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের সরাসরি আমাদের সামনে হাজির



করবে। অথবা তোমার জন্য একটি স্বর্ণমহল নির্মিত হবে। অথবা তুমি আকাশে উঠে যাবে; বরং তুমি আকাশে উঠে গেলেও আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের ওপর কোনো কিতাব নাজিল করাবে। আপনি বলে দিন—আমার রব চির পবিত্র। আমি তো একজন মানুষ, প্রেরিত রাসূল।—

কুরাইশদের প্রার্থনা মোতাবেক দুনিয়াবি ধনসম্পদ না পাওয়ার কারণ এই ছিল না যেমনটি কেউ কেউ মনে করে যে, নবিজিকে কুরআন ছাড়া আর কোনো মুজিজাই দান করা হয়নি। ফলে মুজিজাত্বরূপ কুরাইশদের প্রার্থনাও পূরণ হয়নি।

এই ধারণা একেবারেই ভুল; বরং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অগণিত মুজিজা দান করেছেন। কুরাইশদের তাদের প্রার্থনামাফিক দুনিয়াবি চাহিদা পূরণ না করার আসল কারণ হলো—আল্লাহ তায়ালা খুব ভালো করেই জানতেন যে, ওরা এসব আবদার করছে কুফরি ও হঠকারিতাবশত এবং ঠাট্টা ও তামাশার ছলে। যেমনটি তাদের প্রার্থনার ধরন ও ভঙ্গিমা থেকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার।

এতে যদি তাদের সত্যিকারের আবেদন, নেক নিয়ত এবং বাস্তবেই ইসলাম গ্রহণের সদিচ্ছা থাকত, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের আবেদন মঞ্জুর করতেন এবং তাদের জীবনোপকরণে পরিবর্তন আনতেন। আরব মরুভূমিকে নদী-নালা-ঝরনা দিয়ে ভরপুর করে দিতেন; কিন্তু তাদের আচরণ ও আবদার ছিল পুরোপুরি নিচের আয়াত মোতাবেক। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَغرُجُونَ. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۝

এদের সামনে যদি আকাশের কোনো দরজাও খুলে দিই এবং এরা তাতে আরোহণে লেগে থাকে, তারপরও এ কথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে। না, বরং আমরা জাদুপ্রস্ত সম্প্রদায়।—

* * *





অর্থনৈতিক বয়কট

বন্ধন অটিকানো গেল না

মুসা ইবনে উকবা রহ.^১ ও ইবনে ইসহাক প্রমুখ থেকে বিভিন্ন সূত্রে একাধিক বর্ণনায় আছে, কুরাইশ কাফিররা নবিজিকে তাদের টোপ গেলাতে ব্যর্থ হলে রাগে-ক্ষোভে নবিজিকে মেরে ফেলাতে একজোট হয়। এ সিদ্ধান্ত তারা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে জানালে দুই গোত্র নবিজিকে তাদের হাতে তুলে দিতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানায়। কুরাইশ কাফিররা তাদের উদ্দেশ্য পূরণে বিফল হয়ে এবার নতুন চাল চালে। নবিজি, সাহাবায়ে কিরাম আর বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের বারাই নবিজির সমর্থক বলে তাদের জানা ছিল, তাদের সবার বিরুদ্ধে বয়কট ও একঘরকরণের ফন্দি আঁটে। এ যন্ত্রপায়ে তারা একটি অজ্ঞীকারনামা (Phonetic) লেখায়। সকল মুশরিক এতে সম্মতি প্রকাশ করে। অজ্ঞীকারনামার চারটি ধারা লেখা ছিল, ধারাগুলো নিম্নরূপ—

- ✓ ধারা : ১. তাদের সাথে বিয়ে-শাদি ও সব রকম সম্পর্ক স্থাপন নিষেধ।
- ✓ ধারা : ২. তাদের সাথে সব ধরনের লেনদেন নিষেধ।
- ✓ ধারা : ৩. তাদের ক্ষুধা-পিপাসায় খাবার-পানির ব্যবস্থা করা বা ব্যবস্থায় সহযোগিতা করা নিষেধ।

১৫১ আবু মুহাম্মাদ মুসা ইবনে উকবা কুরাইশি রহ. (মৃত্যু : ১৪১ হি.)। বিখ্যাত তাবিরি। বিখ্যাত হাদিসবিদগণ। বিশিষ্ট ইতিহাসশাস্ত্রজ্ঞ। নবি-ঈবনের সুসংকলিত প্রথম সাপ্লি প্রথম রচয়িতা।



✓ ধারা : ৪. তাদের সাথে যেকোনো সম্বন্ধ, সুসম্পর্ক বজায় রাখা
এবং তাদের সাথে নম্র আচরণ বা নমনীয়তা প্রদর্শন সবই
নিষেধ।

বনু মুত্তালিব যতক্ষণ মুহাম্মাদকে আমাদের হাতে তুলে না দেবে, ততক্ষণ এসব
নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। এবং ততক্ষণ এই বয়কট চুক্তি ও অবরোধ কর্মসূচিও
কঠোরভাবে কার্যকর ও পালিত হবে।

লেখা শেষে অজ্ঞীকারনামাটি তারা (ভাঁজ করে) খানায় কাবার মাঝখানে বুলিয়ে
দেয়। কুরাইশরা তিন বছর যাবৎ এই বয়কট চুক্তির ওপর অটল থাকে। এই দীর্ঘ
দূরবস্থা ও দুঃসময়ের সূচনা হয় নবুয়তের সপ্তম বছরে এবং সমাপ্তি হয় দশম
বছরে।

এক বর্ণনা অনুযায়ী, তাদের এই বয়কট ও অবরোধ কর্মসূচি দুই বছর ছিল। মুসা
ইবনে উকবার বর্ণনা থেকে পরিস্কার—

এই অজ্ঞীকারনামা সাহাবায়ে কিরামকে হাবশায়^১ হিজরতের নির্দেশ
প্রদানের আগে লেখা হয়। নবিজি বয়কটকালীন সময়ে সাহাবায়ে
কিরামকে হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দেন।

তবে ইবনে ইসহাকের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত—বয়কট চুক্তি উমর রা.-এর ইসলাম
গ্রহণ এবং হাবশায় সাহাবায়ে কিরামের হিজরতের পরে লেখা হয়।

নবিজি, সাহাবায়ে কিরাম এবং বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবসহ জ্ঞানশোনা সকল
মুসলিমকে শিয়াবে আবু তালিবে বয়কট ও অবরোধ করে রাখা হয়। স্বর্ভাব্য, মক্কার
বিভিন্ন নামের একাধিক ঘাঁটি ছিল।

শিয়াবে আবু তালিবে সাহাবায়ে কিরামের সাথে বনু মুত্তালিব ও বনু হাশিম ছাড়া
আরও কিছু কাকিরও অবরোধ ছিল। মুসলিমদের দোষ তো ছিল মুসলিম হওয়া, আর
কাকিরদের অপরাধ ছিল মুসলিমদের সহযোগিতা করা। তারা স্বগোত্র ও গোষ্ঠীর
খাতিরে নবিজির সাথে ঘাঁটিতে অবরোধ থাকাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয়। বনু
হাশিমের আবু লাহাব ও আবদুল উজ্জা ইবনে আবদুল মুত্তালিব শুধু বাইরে থাকে;
বরং তারা অন্যান্য কুরাইশ কাকিরদের সাথে একাত্মতা পোষণ করে।

১৫২ হাবশা। আধুনিক ও বর্তমান নাম ইথিওপিয়া। রাজধানী আকিস আবাবা। লোহিত সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে
অবস্থিত। প্রাচীন হাবশা ভেঙে বর্তমানে কয়েকটি দেশে পরিণত হয়েছে। বর্তমান হাবশার উত্তরে ইরিত্রিয়া ও উত্তর
পশ্চিমে সুদান। দক্ষিণে কেনিয়া। পূর্বে জিম্বুভি ও সোমালিয়া। আর পশ্চিমে দক্ষিণ সুদান।



নবিজি সাহায্যে কিরামকে নিয়ে বরকটের তিনটি বছর খুঁই কঠিন অবস্থা ও নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে কাটান। এই অসহ্যকর ও কঠিন পরিস্থিতিতে খাদ্যাভাবের কারণে সাহায্যে কিরামকে গাছের পাতা ও শুকনো চামড়া পর্বস্ত খেতে হয়েছে।

সুহাইলি... রহ. উল্লেখ করেন—

যখনই কোনো বণিক দল মক্কায় আসত, তখন কোনো সাহাবি খাদ্যদ্রব্য কিনতে বাজারে ঢুকলে আবু লাহাব দাঁড়িয়ে বলতে থাকত—হে ব্যবসায়ীরা, তোমাদের কাছে মুহাম্মাদের অনুসারীরা এলে চড়া দাম বলবে। যাতে ওরা কিনতে না পারে। ব্যবসায়ীরাও এই নেতার চামচামি করে কয়েক গুণ দাম বাড়িয়ে বলত। ফলে সাহায্যে কিরাম শূন্যহাতে ফিরে যেতেন। এমনতাবস্থায় ছোটো ছোটো শিশুরা কুখার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠত এবং বস্ত্রণায় ছটকট করতে থাকত। তবুও তাদের কিছুই করার ছিল না। নিষ্পাপ সন্তানদের মুখে তুলে দেওয়ার মতো কিছুই তাদের হাতে উঠত না।

দিন-সপ্তাহ করে অপেক্ষা করতে করতে একসময় তিন তিনটা বছর অভিবাহিত হয়। বনু কুসাইয়ের কিছু লোক কুরাইশদের নিন্দা জানায় এবং এই অমানবিক চুক্তি ভঙ্গের জোর তাগিদ দেয়। ওদিকে আব্দুল্লাহ তায়াল্লা অজ্ঞীকারপত্রে উইপোকা লাগিয়ে দেন। উইপোকা অজ্ঞীকারপত্রটি এমনভাবে খেয়ে ফেলে যে, শুধু আব্দুল্লাহ তায়াল্লার পবিত্র নাম ছাড়া আর একটা অক্ষরও বাকি থাকে না। অজ্ঞীকারপত্রের এই দশার কথা নবিজি চাচা আবু তালিবকে জানিয়ে দেন। আবু তালিব জিজ্ঞেস করেন—তোমার রব কি তোমাকে এই সংবাদ দিয়েছেন?

নবিজি জবাব দেন—হ্যাঁ।

আবু তালিব জবাব শুনেই কুরাইশদের সভায় উপস্থিত হয়ে বলেন, আনো তোমাদের সেই অজ্ঞীকারপত্র। ওটার ব্যাপারে তোমাদের সাথে কথা বলতে এসেছি।

এতে তাদের মনে হয়, আবু তালিব বুঝি তাদের শর্তগুলো মেনে নেবেন! তাই তারা অজ্ঞীকারনামাটি নামিয়ে আনে।

আবু তালিব বলেন—আমার ভাতিজা কোনো দিন মিথ্যা কথা বলেনি। সে আমাদের নিশ্চিতভাবে খবর দিয়েছে, আব্দুল্লাহ তায়াল্লা এই অজ্ঞীকারনামায় উইপোকা লাগিয়ে দিয়েছেন। তিনি এই অজ্ঞীকারনামার সকল বিমিনিষেধ উঠিয়ে দিয়েছেন। যেটাতে

১৫৩ আবুল কাসিম আবদুর রহমান আস-সুহাইলি (৫০৮-৫৮১ হি.)। হাকিম্জে হামিস। ভাবানিজানী। সিরাত বিশেষজ্ঞ।



অস্বীয়তার বন্ধন ছিল, জোর-জুলুমের কথা লেখা হয়েছে। আমার ভাতিজার কথাই যদি সত্যি হয়, তাহলে তোমাদেরও উচিত খোদার এই সিংহাস্ত মেনে নেওয়া এবং নিজেদের মন্দ কাজের ইচ্ছা থেকে ফিরে আসা। খোদার কসম! আমরা আমাদের জীবন থাকতে তাঁকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো না। আর যদি আমার ভাতিজার সংবাদ সত্যি না হয়, তাহলে আমরা তাঁকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত। তারপর তোমাদের যা খুশি তাঁকে করতে পারো।

কুরাইশরা বলল—আপনার কথায় আমরা রাজি।

তারপর তারা অজ্ঞীকারনামা খুলে দেখে, নবিজি যেমন বলেছেন, ঠিক তেমনই অবস্থা। উইপোকা সব ঝেয়ে ফেলেছে; কিছু হতভাগা কুরাইশরা এবারও পলটি দিলো। ওরা বলল—আপনার ভাতিজা এর ওপর জাদু করেছে। নরান্থমরা এই ধারণা করে আরও ক্লেপে যায়।

তারপর তাদেরই পাঁচজন নেতা ও মাতব্বর এই অজ্ঞীকার ভাঙতে এবং বয়কটের অবসান ঘটাতে উদ্যোগ নেয়। তারা হলো হিশাম ইবনে আমর ইবনুল হারিস, জুহাইর ইবনে উমাইরা, মুতরিম ইবনে আদি, আবুল বুখতারি ইবনে হিশাম ও জামআহ ইবনে আসওয়াদ। তাদের মধ্য থেকে জুহাইর ইবনে উমাইয়া বয়কট অবসানের প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়। সে প্রথমে খান্নারে কবর করছে সমবেত লোকদের সামনে আসে এক উচ্চঃস্বরে বক্তৃতা দেয়—

হে মকানাসী, আমরা কি খাবার খাই না? আমরা কি কাপড়চোপড় পরি না? দেখো, বনু মুতালিব ও বনু হাশিমের সাথে লেনদেন নিষেধ থাকার না ঝেয়ে ঝেয়ে আছি তারা মরার পথে। খোদার কসম! এই জুলুম-নির্ধাতন ও অমানবিক আচরণের মূল কারণ যেই অজ্ঞীকারনামা, সেটা আমি টুকরো টুকরো করে ফেলব এবং বয়কটও উঠিয়ে দেবো। (তোমাদের কারও কিছু বলার আছে?)

এরপর তার দেখাদেখি বাকি নেতারাও উঠে দাঁড়ায় এবং এমন বক্তব্য দেয়। তারপর মুতরিম ইবনে আদি অজ্ঞীকারপত্রের দিকে এগিয়ে যায় এবং অবশিষ্টাংশও টান মেরে ছিড়ে ফেলে। এরপর এই পাঁচ নেতা আরও অনেককে সাথে নিয়ে শিয়াবে আবু তালিবে যায় এবং সবাইকে বাড়ি ফিরিয়ে আনে।

* * *



বিক্রমসিরাহ

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

হেজরত সাহাবরশাদগণী সৈয়দ মোক্কেম

জুলুম-নির্ধাতন আর শত কষ্টে ঘেরা এই বয়কট পর্ব থেকে জানা যায়, নবিজি ও সাহাবায়ে কিরামকে দ্বীনের খাতিরে কত কষ্টের সন্মুখীন হতে হয়েছে এবং কত যত্নগা সহ্য করতে হয়েছে!

এসব নির্ধাতনের শিকার শুধু যে মুসলিমরাই হয়েছেন তা নয়; বরং বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মুশরিকরাও তাদের সাথে হেচ্ছায় নিজেদের সঁপে দেয়। নবিজিকে একা ছেড়ে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নবিজির অনুসারী না হয়েও তাদের এই অবস্থান গ্রহণের কারণ কী ছিল, তা নিয়ে এখানে আলোচনা করা আমাদের জন্য জরুরি নয়। আকিদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ বাদ দিয়ে বলা চলে, তারা নবিজির হিজাজত ও সহযোগিতার জঙ্কবায় এবং আত্মীয়তা ও সুসম্পর্ক বজায়ের উদ্দেশ্যে এমনটি করেছে। ঠিক এ কারণেই তারা অন্যান্য কুরাইশি মুশরিককে নবিজিকে হত্যা করার সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি। এভাবে তারা মনের দুটি চাহিদা ও বাসনাকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং সেগুলো একসাথে লাভন করেছে—

- ✓ এক. শিরকের ওপর জমে থাকা এবং নবিজির আনীত সত্যের প্রতি বিশ্বাসতা প্রদর্শন।
- ✓ দুই. সহযোগিতা ও আত্মীয়তার সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। যেই সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষ অন্যদের জুলুম-নির্ধাতন থেকে নিজ আত্মীয়ের হিজাজত ও সহযোগিতা করে; সে হকের ওপর থাকুক বা বাতিলের ওপর।



নবিজি এবং সাহাবায়ে কিরাম এই অববুদ্ধ সময়ের যেসব কষ্ট-যন্ত্রণা ও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন, সেগুলো শুধু এবং শুধুই আল্লাহ তায়ালার হুকুমের আনুগত্য প্রদর্শন আর দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে প্রাধান্য দিতেই সহ্য করেছেন।

কারণ, আল্লাহর সন্তুষ্টির মোকামিলায় তাঁর সৃষ্টি দুনিয়া তাদের সামনে ছিল একেবারে মূল্যহীন, নগণ্য ও তুচ্ছ। এখানে এ বিষয়ে কিস্তি আলোকপাত করা গুরুত্বের দাবিদার।

শোনা যায়, ইসলামবিরোধী কোনো কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডার দাবি তোলে—

নবি মুহাম্মাদের মিশন পরিচালনায় বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের স্বজনপ্রীতি ও আত্মীয়তার গোঁড়ামির সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তারা তখন তার হিজাজত ও সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করেছিল। তার দীনপ্রচারে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। এর দলিল হলো—কুরাইশ মুশরিকরা যখন মুসলিমদের বয়কটে ফেলে, তখন এই দুই গোত্র বয়কটের ব্যাপারে নেতিবাচক অবস্থান নেয়।

কিন্তু তাদের এই মন্তব্য ও দাবি চরম ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এসব কথা অযৌক্তিক ও অমূলক হওয়ায় কোনো অস্পষ্টতা নেই। কারণ, এটা তো একেবারে স্বাভাবিক ও বাস্তবিক যে, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব আপন ভাতিজার জীবন রক্ষার্থে এগিয়ে আসবেই। (তখনও জাহিলি যুগের অবসান ঘটেনি।) ফলে তারা স্বভাবজাত ও প্রাকৃতিকভাবেই জাহিলি যুগের সাহায্য-রীতিতে— ভাতিজার হিজাজতে এগিয়ে এসেছিল; এমন সময় যখন মুহিব্বত অপরিচিত একস্থান তাদের ভাতিজাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছিল এবং কুমতলবে তাঁর দিকে প্রসারিত হচ্ছিল।

জাহিলি রীতির সহযোগিতা যখন আত্মীয়দের এ ধরনের স্বজনপ্রীতি ও গোঁড়ামির ওপর প্রলুব্ধ ও উদ্দীপিত করে, তখন তাদের সামনে কোনো নিয়মকানুন বা আইন টেকে না। এই পরিস্থিতিতে হক-বাতিল তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাদের দৃষ্টিতে তখন শুধু স্বজনপ্রীতির গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমিই থাকে। এজন্যই তো এ থেকে পরিস্কার, নবিজির অমুসলিম আত্মীয়দের ইসলাম গ্রহণ না করার কারণ হলো, তাদের মধ্যে দুটি বিরোধপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটা—

১৫৪ জাহিলি যুগে আরবদের একটি সামাজিক রীতি। এ রীতি অনুযায়ী তারা কসড়-বিবাদ, লড়াই-যুদ্ধ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে বশবীর ও স্বসোপীয় লোকের পক্ষে থাকত। এমনকি দোষ বা অন্যায় সে করলেও তারা তার বিরুদ্ধে যেত না।



কিকছস সিরাহ

- ✓ এক. নবিজির দাওয়াতের ফলাফলে বড়াই ও অহংকার করে দাওয়াত অস্বীকার করা।
- ✓ দুই. কুরাইশি মুশরিকদের মোকাবিলায় নবিজির সাহায্য-সহযোগিতা করা।

কিন্তু নবিজির ব্যক্তিত্ব ও তাঁর মিশনে আদতে এসবের ফায়দা বা উপকারিতা কিছু ছিল কি না, পাশাপাশি তাও চিন্তা করা দরকার। অথচ নবিজি ও সাহাবায়ে কিরামকে যতটুকু যত্নগা দেওয়া হয়েছে, ঠিক ততটুকু তাদেরও দেওয়া হয়েছে। নবিজি ও সাহাবায়ে কিরাম যেসব কঠিন পরিস্থিতি ও অসহনীয় দুরবস্থার সন্মুখীন হয়েছেন, তাদেরও সেসবের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

সহজেই যেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বুঝে আসে, তা হলো—নবিজিকে তাঁর সেসব অমুসলিম আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সন্মানদান তাঁর নবুয়ত-রিসালাত ও দাওয়াতের পক্ষে সাহায্য ছিল না; বরং তাদের সহযোগিতা ছিল কেবলই নবিজির ব্যক্তিত্বের খাতিরে এবং বংশ ও গোষ্ঠীর স্বার্থে।

পরবর্তী সময়ে সাহাবায়ে কিরাম যদি তাদের এই সাহায্য-সহযোগিতার দ্বারা লাভবান হতেন এবং একে জিহাদ ও কাফিরদের ওপর বিজয় লাভের এবং কাফিরদের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনার মাধ্যম ও উপায় হিসেবে গ্রহণ করতেন, তাহলে তাদের এই চেষ্টা জিহাদের কাজে খুবই ফলপ্রসূ হতো এবং তাদের মুজাহাদার পথ হতো অতি মসৃণ।

নবিজি ও সাহাবায়ে কিরামের ঈমান রক্ষার পর্ব থেকে একটি কৌতূহল জন্মায়, সেই স্পিরিট বা মূল চেতনা কী ছিল—যা তাদের এই দুঃসময় ও সংকীর্ণ অবস্থায়ও তাঁর ওপর অটল ও জমে থাকার প্রেরণা জুগিয়েছে এবং কীসের প্রত্যাশায় এই কঠিন ও নাজুক অবস্থার মোকাবিলায় তারা টিকে ছিলেন?

এই কৌতূহলের জবাব ওই সকল লোক কীভাবে দেবে, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসী সাহাবায়ে কিরামের ঈমানের ব্যাখ্যা বলবে—

এটা ডান বাহুর বিপরীতে বাম বাহুর বিরোধিতা ও বিদ্রোহ। অর্থাৎ সম্পাদশালী ও আয়েশি লোকদের বিপরীতে হতদরিদ্র ও নিপীড়িত



লোকদের বিদ্রোহ। আর এই বিদ্রোহের চেতনাই তাদের চিকিৎসায়
রেখেছিল।

নবিজি ও সাহাবায়ে কিরামের নির্যাতন ও অত্যাচারের উপস্থাপিত ঘটনাগুলো একটু
কল্পনা করে তারপর এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে দেখতে হবে। ইসলামি দাওয়াতের
পর্বকে এমন সামাজিক বিদ্রোহ ও আন্দোলনের সাথে কীভাবে তুলনা করা চলে,
যেই বিদ্রোহের ইস্যু থাকে ক্ষুধা ও অভাব? এবং যেই আন্দোলনের নেপথ্যে থাকে
মক্কার ব্যবসায়ী ধনিক শ্রেণি আর সেখানকার অর্থনৈতিক প্রাফের বিরোধিতায়
ঘৃণা ও বিদ্বেষ?

দাওয়াতের কাজ বাদ দিতে মুশরিকরা নবিজিকে নেতৃত্ব ও ধনসম্পদের দোস্তানীয়
প্রস্তাব কম দিয়েছে? তবুও কেন তিনি এ প্রস্তাবে রাজি হননি? ক্ষুধা নিবারণ ও
স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন যদি সাহাবায়ে কিরামের জীবনের মূল লক্ষ্য ও টার্গেট হতো,
তাহলে নবিজির সামনে কুরাইশদের পেশকৃত অকার গ্রহণে তারা তাঁকে কেন বাধ্য
করেননি? কেন তাঁর ওপর জোর খাটিয়ে প্রস্তাব গ্রহণের আবদার জানাননি?

তারা যদি বামপন্থি বিদ্রোহীই হতেন, তাহলে বামপন্থি বিরোধীরা হাতে ক্ষমতার
বাগডোর আর পকেট ভর্তি টাকা-পয়সা ছাড়া আর কিছু কি চায়?

নবিজি ও তাঁর সাহাবাদের সাথে তাদের গোষ্ঠী ও বংশীয় লোকদের ওপরও
পরিপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট আরোপ করা হয়। এ পরিস্থিতিতে
তারা নিজেদের রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে শত কষ্টে উপার্জিত অর্থকড়ি, ধনসম্পদ,
পৈতৃক সম্পত্তি, জমিজমা, আত্মীয়স্বজন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে
শিয়াবে আবু তালিবের অবরোধ মেনে নেয়। ফলে ব্যবসার কোনো পণ্যদ্রব্য তাদের
কাছে পৌঁছত না। আহারের কোনো বস্তু তাদের তাঁবুতে ঢুকত না। পান করার
একফোঁটা পানিও তাদের কলস-মশকে থাকত না। নিরুপায় হয়ে তারা গাছের পাতা
খেয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে এবং এভাবেই কঠিন সময়গুলো পার করতে থাকে।
সবকিছু মুখ বুজে সয়ে যায় আর সাহাবায়ে কিরামের মতো নবিজির সঙ্গে লেগে
থাকে।

পাঠকের কি মনে হয়, অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটানো যাদের ইচ্ছা ও লক্ষ্য, তারা কখনো
এমন পরীক্ষা দিতে পারবে?



রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করলে তাঁর আগে-পরে প্রায় সকল সাহাবি মক্কা ছেড়ে যান। নিজেদের সহায়সম্পত্তি ও মালিকানাধীন সব কিছুই ফেলে যেতে বাধ্য হন এবং মদিনা সফরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

তাহলে বলুন তো, অর্থকড়ি ও ধনসম্পদের লোভীরা কি এভাবে অর্জনের নয়; বরং বর্জনের এক হুকুম পালনে সবকিছু ত্যাগ করতে এবং বিসর্জন দিতে পারবে?

অথচ সাহাবায়ে কিরাম আত্মা ও তাঁর রাসুলের ওপর ঈমান আনয়নের মোকাবিলায় সবাইকে ‘খোদা হাফেজ’ বলতে সামান্য দ্বিধাবোধ করেননি। কারণ, তাদের সামনে দুনিয়া ও দুনিয়ার শাসন বা রাজত্ব—কোনোটাই এক পয়সা মূল্যও ছিল না।

একবার ভাবেন তো, এটা কি দুমুঠো ভাতের জন্য বামপন্থিদের বিদ্রোহের আগুন উসকে দেওয়ার দলিল হতে পারে?

ইসলামের বিরুদ্ধে যারা খুঁত সন্ধান ও বাচালিপনায় লিপ্ত, তারা মাঝেমধ্যে নিজেদের অবস্থান প্রমাণ করতে নিচের লাইনগুলোকে দলিল হিসেবে পেশ করে—

প্রথম : মক্কায় নবি মুহাম্মাদের সাহাবিদের প্রথম সারি, যাদের অধিকাংশই ছিল দাস-দাসী, হতদরিদ্র ও নিঃস্ব তারা মুসলিম হয়েছে এবং তাঁর অনুসারী হয়েছে দারিদ্র্যের জাঁতাকল ও অভাবের তাড়না থেকে মুক্তি পেতে। এবং এই নতুন ধর্মের ছত্রছায়ায় থেকে একসময় ঐশ্বর্য ও ধনভাণ্ডারের মালিক হওয়ার আশায়।

দ্বিতীয় : প্রথম সারির মুসলিমদের তুলনামূলক কম সময়ই কষ্ট করতে হয়েছে। কারণ, মুসলিমদের সামনে কিছুদিন পরেই অর্থনীতির নতুন দিগন্ত খুলে যায় এবং তাদের চারপাশে ধনসম্পদের দৃশ্য জমে যায়।

আর এই অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটানোই যে নবি মুহাম্মাদের লক্ষ্য ও মিশন ছিল, এটা তার একটা দলিল।’

ইসলামবিরোধীদের নিক্ষিপ্ত ও ছুড়ে মারা এসব অভিযোগ ও আপত্তিকর মন্তব্যের বিচার-বিশ্লেষণে গেলে প্রথমই যা সামনে আসে, তা হলো—এসবই তাদের অমূলক ধারণা ও ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র এবং নির্জলা মিথ্যাচার ও মিথ্যা অপবাদ।

প্রথম সারির সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশই ছিলেন হতদরিদ্র ও দাস-দাসী—এটা যদিও পুরো সত্য, কিন্তু তবুও ইসলামবিদ্বেষীদের উদ্দীপিত এসব অবান্তর বুলি ও



চিরসত্য বাস্তবতার মাঝে ধায়ে-কাছে তো দূরের কথা, দূরবর্তী কোনো সম্পর্ক বা যোগাযোগও নেই।

কারণ, সর্বজনস্বীকৃত কথা হলো—যেই শরিয়ত সমাজে ইনসাফ ও সমতা কান্নেমের অকাটি নির্দেশ দেয় এবং প্রত্যেক জালিম, ঘোঁকাবাচ্চ ও অবাধ্যের মুখে লাগাম পরায়, সেই শরিয়তকে জুলুম-নির্ধাতন, কষ্টদান ও অবাধ্যতার জীবনযাপনে অভ্যস্তদের সবাই যে শুধু উপেক্ষা করবে, তা নয়; বরং এর বিরোধিতায় উন্মুক্ত তরবারি ও কশা নিয়ে হামলে পড়তেও তারা দ্বিধাবোধ করবে না। কারণ, এই শরিয়ত মানতে গেলে তাদের উপকারের চেয়ে অপকারই হবে বেশি।

অনুব্রূপ এটাও সর্বস্বীকৃত যে, এই শরিয়তকে ভালোবেসে এবং আদর করে কোলে তুলে নেবে প্রত্যেক ওই ব্যক্তি, যে কিনা দুর্বল, শক্তিহীন, নিপীড়িত, নির্ধাতিত এবং অবাধ্যতা ও সুবিধা ভোগের ময়দানে যাদের বিচরণ নেই। কারণ, এতে তাদের ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি। অন্ততপক্ষে অন্যদের সাথে তাদের এমন আচরণ হবে না, যে কারণে অন্যরা এই শরিয়তের দায়দায়িত্ব ও চাহিদার ওপর আমল করতে দ্বিধায় পড়ে যাবে।

নবিস্তর পাশে জড়ো হওয়া অধিকাংশই অগাধ বিশ্বাস ছিল—‘তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল।’ তবে নেতৃস্থানীয় ও কর্তৃত্বশীল অহংকারীরা এই সত্যের সামনে কাঁধা ও অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছে, মাথা নত করার ক্ষেত্রে তাদের সামনে কোনো প্রতিরোধকারী ছিল না।

এটাই বাস্তবতা—যা সবার ঋণগম্য হয়। এই বাস্তবতা আর ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারীদের কল্পনার মাঝে কোনো সম্পর্ক আছে?

এ ছাড়াও যেই ধারণা করা হয় যে—

নবি মুহাম্মাদ দাওয়াতের আকৃতিতে এর অন্তরালে যেই ইশতেহার ও ব্যবস্থাপত্র জনসমক্ষে তুলে ধরেন, তার নেপথ্যে উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের অর্ধনীতিক সমৃদ্ধশালী করা এবং তাদের স্থানে স্থানে বাদশাদের সিংহাসনে সমসীন করা; যা কিছুকাল পরেই সত্যে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন দেশের রাজদণ্ড তাদের হাতে আসে।

ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম এক করে ফেলার মতো। আচ্ছা, যখন মুসলিমদের দ্বীনের ওপর অটল-অবিচল থাকা এবং



আল্লাহ তায়ালার প্রতি পরিশুদ্ধ বিশ্বাস রাখার বদৌলতে তিনি রোম-পারস্যের শাসনদণ্ড তাদের হাতে তুলে দেন, সেসব ভূখণ্ডে তাদের বসবাসের সুযোগ করে দেন এবং তাদের চারপাশে জাগতিক বস্তুসামগ্রীর মেলা বসিয়ে দেন, তখন এর উদ্দেশ্য বা অর্থ কি এটা হতে পারে যে, তারা মুসলিম হয়েছেন রোম-পারস্যের সিংহাসন আর ধনদৌলতের লোভে?

তাদের ইসলাম গ্রহণের আড়ালে যদি ধনদৌলতের লোভ ও আকাঙ্ক্ষা কিংবা জাগতিক কোনো চাহিদা পূরণের ইচ্ছা ও বাসনা থাকতই, তাহলে তাদের একের পর এক ভূখণ্ড জয়ের মুজিজা দুনিয়া দেখতে পেত না।

ফারুককে আজম রা. কাদিসিয়ার... যুদ্ধের সেনাবাহিনী গঠন করে চিফ অব কমান্ডার বানান সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-কে। এই সেনা অভিযানের উদ্দেশ্য যদি ধনভান্ডার লুট বা পার্শ্ববর্তী ধনদৌলত কব্জা করার আকাঙ্ক্ষা থাকত, কিংবা সিংহাসন দখলের ইচ্ছা থাকত, তাহলে কশ্মিরকালেও সাদ রা. বিজয়ের সুসংবাদ ও সাহায্যের আবেদন নিয়ে মদিনায় ফিরে আসতেন না। তাকে পরাজয় ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হতো; বরং সকল যুদ্ধে এবং প্রতিটি রণাঙ্গানে মুসলিমদের দৃষ্টি ছিল একজায়গাতেই; দ্বীন ইসলামের সহযোগিতা ও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি। তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি বহিঃপ্রকাশের সময় যখন হয়, তখন তিনি তাদের হাতে পৃথিবীর শাসনদণ্ড তুলে দেন। তাদের সামনে ধনসম্পদের পাহাড় গড়ে দেন। এবং খনি ও গুপ্তধনের চাবি সঁপে দেন। যোগুলোর কল্পনা বা ধারণাও তাদের ছিল না।

কাদিসিয়ার রণাঙ্গানে যদি মুসলিমদের নিয়ত থাকত পার্শ্ববর্তী আসবাবপত্র, জাগতিক সুখ ও বিলাসসামগ্রী অর্জন, তাহলে রিবয়ি ইবনে আমির রা. বৃন্তমের... প্রাসাদসদৃশ প্যাণ্ডেলের ভেতরে ঢুকে সবকিছু বরবাদ ও বিনাশ করতেন না।

১৫৫ কাদিসিয়া। মুসলিম ও অগ্নিপুঞ্জারি পারস্য সাম্রাজ্যের মাঝে সংঘটিত এক ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ময়দান। হিজরি ১৫ সনের শাবান মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম বাহিনীর সেনাপ্রধান ছিলেন সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. আর পারস্য বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল বীর বৃন্তম।

১৫৬ দুনিয়া লাভের পরও দুনিয়াবিমুখতা নিয়ে সাহায্যে কিরামের যেসব উস্তা, বাগী ও ঘটনা রয়েছে, সেগুলো জেনে নেওয়াই এ ব্যাপারে সত্যতা যাচাই ও বাস্তবতা উপলব্ধির জন্য যথেষ্ট।

১৫৭ বৃন্তম করবুখজাদ অর্মেনি। খ্রিষ্ট সালানি তথা পারস্য সাম্রাজ্যের বিখ্যাত সেনাপতি। পারস্য সিংহাসনের শেষ প্রদীপ তৃতীয় ইয়াজদিগারদের শাসনামলে দীর্ঘ উনিশ বছর (৬৩২ থেকে ৬৫১ ই.) সেনাপ্রধান ছিল। জ্ঞানী। সমরকুশলী। রণাঙ্গানের বীর। মুসলিম উম্মাহর হাতে তার পতন হয়।



রিবয়ি ইবনে আমির রা. যখন রুস্তমের প্যাভেলের ভেতরে ঢোকেন, তখন তার আয়েশি ও বিলাসী জীবন এবং আড়ম্বরপূর্ণ বাদশাহী জিন্দেগি দেখে ঘৃণায় নাক সিঁটকান। তিনি বর্শা দিয়ে সেখানে পড়ে থাকা গালিচা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং অহমিকার জিনিসপত্র তছনছ করে দেন। আর রুস্তমের উদ্দেশ্যে বলেন—

তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে তোমার ভূখন্ডের শাসন এবং তোমার ধনসম্পদ সব তোমারই থাকবে। তোমার সামনে কোনো বাধা থাকবে না।

এটা বড়োই চিন্তার বিষয়, যেই বিজ্ঞতার দৃষ্টি থাকে শত্রুপক্ষের ওপর কর্তৃত্ব লাভ এবং ধনসম্পদ, সহায়স্বল্পের ওপর দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রতি, তার কি এসব কথা বলার সাহস আছে?

এ থেকে পরিস্কার, মুসলিমরা যেসব ভূখণ্ড জয় করেছেন, সেসব বিজয়াভিযান ইসলামের খাতিরে এবং পৃথিবীর বুকে ইনসাক ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই ছিল। পদমর্যাদার লোভ বা শাসক হওয়ার কোনো চিন্তা থেকে ছিল না।

আল্লাহ তায়ালা এ কারণেই মুসলিমদের দুনিয়ায় মান-সম্মান, ইজ্জত-মর্যাদা দান করেছেন। কারণ, মুসলিমদের মনে দুনিয়াবি মান-মর্যাদা ও পদমর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা কখনোই ছিল না। প্রতিটি রণাঙ্গনে আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টিই থাকত মুসলিমদের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের পার্শ্বব নিয়ামত দিয়ে ভরপুর করে দেন। মুসলিমদের জিহাদের উদ্দেশ্য যদি হতো দুনিয়া অর্জন, তাহলে তারা সর্বাবস্থায় এবং সর্বক্ষেত্রে মাহরুম ও বঞ্চিত হতেন।

আল্লাহ তায়ালায় যেই নিয়মনীতির আওতায় নিখিল জাহানের বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটে, সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ফিকির করলে মুসলিমদের উত্থান ও দিগ্বিদিক জয়ের রহস্য দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَرِيدُ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَظْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَتَجْعَلَهُمُ
الْوَرِثِينَ ۝

আর আমি চেয়েছিলাম দেশে (মিশরে) যাদের দুর্বল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদের নেতা বানাতে এবং (দেশের) উত্তরাধিকারী বানাতে ۝



কোনো উদ্দেশ্য-আকর্ষণে বন্দি না থেকে গোঁড়ামির উর্ধ্বে গিয়ে নিরপেক্ষভাবে এতে চিন্তা-ফিকির করলে খোদায়ি উক্ত আইন যেকোনো বিবেকবান মানুষ সহজেই বুঝতে পারবে। আল্লাহই তার তাওফিকদাতা।

* * *





ইসলামে প্রথম হিজরত

হিজরতের অনুমতি

নবিজি যখন লক্ষ করেন—নিরীহ ও নিরপরাধ মুসলিমদের ওপর মক্কার কাফিরদের নির্যাতন-নিপীড়ন তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, দিনদিন তাদের বেঁচে থাকাকে অসম্ভব করে তুলেছে এবং তাদের নিরাপত্তা ও মাথা গোঁজার মতো কোনো স্থান এখানে আর মিলছে না, তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন—

তোমরা যদি হাবশায় চলে যাও, তাহলেই ভালো হয়। কারণ, সেখানকার বাদশার প্রজাদের কেউ কারও ওপর জুলুম করতে পারে না। সেটি একটি নিরাপদ ভূখণ্ড। আল্লাহ তায়াল্লা যতদিন তোমাদের এই বিপদ নামক পরীক্ষা শেষ না করেন, ততদিন তোমরা সেখানেই থাকো।

এই অনুমতি বাণী শোনার পরপরই অত্যাচার-অবিচার ও নির্যাতনে জর্জরিত সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর স্বীনের হিজাজতের লক্ষ্যে হাবশা গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথের প্রয়োজনীয় উপকরণ বেঁধে নেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই মুসলিমদের প্রথম হিজরত।

এই মুহাজিরদের প্রথম কাতারে ছিলেন উসমান ইবনে আফফান ও তার সহধর্মিণী নবি দুলালি বুকাইয়া, আবু হুজাইফা ও তার সহধর্মিণী, জুবাইর ইবনুল আওয়াম, মুসআব ইবনে উমাইর ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. প্রমুখ। জড়ো হতে হতে এই কাফেলার সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় আশির (৮০) চেয়ে কিছু বেশি।

১৫৯ এই কর্না বিশুখ। ইবনে হিশাম তার গ্রন্থে এমনটিই উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখতে পারেন, *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩০; *কাতরুল বাদি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৩০



ফিকহুস সিরাহ

হাফসার মুদ্রিক প্রতিনিষি

(কিছুদিন পর) কুরাইশরা যখন খেয়াল করল, মুসলিমরা তো গা বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে দেশ ছেড়ে হাফসা চলে যাচ্ছে এবং তাদের হিংস্র থাবা থেকে ভেগে যাচ্ছে, তখন তারা আবদুল্লাহ ইবনে আবু রবিয়া ও আমর ইবনুল আসকে হাফসার সত্রাট নাজ্জাশি- ও তার মন্ত্রী-উপদেষ্টাদের জন্য নানা আইটেমের বিপুল পরিমাণ উপটোকন ও রত্নীয় উপহার দিয়ে পাঠায় এবং মুসলিমদের অভিবাসী হিসেবে তার রাষ্ট্রে আশ্রয় না দিয়ে প্রশাসনিক আইন জারি করে দূতদের অধীনে মক্কায় ফেরত পাঠানোর মর্মে সত্রাট বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

তারা রাজধানীতে পৌঁছে আগেই মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের হাতে উপটোকন পৌঁছে দেয় এবং উদ্দিষ্ট ব্যাপারে কথাবার্তা বলে রাখে। বাদশাহ এই খবর শোনে, তখন তিনি ‘একজনকেও ফেরত দেবেন না’ বলে পরিস্কার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। এবং মুসলিমদের নতুন ধর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফলে মুসলিম আর ওই দুই কুরাইশি দূতকে বাদশার সামনে আনা হয়।

নাজ্জাশির কথোপকথন

বাদশাহ মুসলিমদের জিজ্ঞেস করেন—এটা কেমন ধর্ম, যার কারণে তোমাদের স্বজাতিই ত্যাগ করতে হলো? এবং তারপর তোমরা না আমার ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছ, না অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছ!

জাফর ইবনে আবু তালিব রা. উত্তরে বলা শুরু করেন—

মহামানা রাষ্ট্রপতি ও সত্রাট, আমরা এক অজ্ঞ ও মূর্খ জাতি ছিলাম। মূর্তিপূজা করতাম। মৃত জন্তু ভক্ষণ করতাম। অশ্লীল ও নিকৃষ্ট কাজই ছিল আমাদের কাজ। আত্মীয়তার বন্ধন ছিল করাই ছিল আমাদের অভ্যাস। প্রতিবেশীর হক নষ্ট করতে আমরা ভাবতাম না। আমাদের সবলরা দুর্বলদের চুবে খেতে সামান্য দ্বিষাবোধ করত না। এভাবেই কাটছিল আমাদের জীবন। একসময় মহান খোদা আমাদের থেকেই একজনকে রাসুল বানিয়ে পাঠান। যার বংশ-গোত্র-পূর্বপুরুষ এবং তাঁর সত্যতা-আমানতদারি-পবিত্রতা ইত্যাদি সবকিছুই আমাদের নখদর্পণে। তিনি

১৬০ নাজ্জাশি। প্রাচীন হাফসার রাষ্ট্রপতির উপাধি। নাম আসহমা ইবনে আব্জার রা. (৫৬০-৬৩০ ঈ.)। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, নবিস্তি সা. যার গায়েবানা জলাজার সালাত আদায় করেছেন।



আমাদের এক স্টার দিকে আহ্বান করেন এবং কেবল তাঁর ইচ্ছা-উপাসনার নির্দেশ দেন। আমাদের বাপ-দাদারা যুগ যুগ ধরে যেসব মূর্তি ও পাথরের পূজা করে আসছিল, তিনি আমাদের সেসব করতে বারণ করেন। আমাদের বলেন সত্য কথা বলতে, আমানত পৌঁছে দিতে এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে। সর্বপ্রকার অত্যাচার, বাজে ও মন্দ কাজ করতে আমাদের নিষেধ করেন। তাই আমরা তাঁকে সত্যায়ন করেছি, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তিনি সেই পরম করুণাময় স্টার আল্লাহর পক্ষ থেকে যেই বাণী আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন, আমরা তার অনুসরণ করেছি।

শুধু এই কারণেই আমাদের জাতি আমাদের শত্রু হয়ে গেছে। আমাদের বিভিন্ন ধরনের কষ্টে ফেলেছে। নানা রকম যন্ত্রণায় ভুগিয়েছে। যেন আমরা আবার মূর্তিপূজার দিকে ফিরে যাই।

তারা যখন আমাদের ওপর জোর-জুলুমের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং আমাদের জীবনযাপন সংকীর্ণ ও সংকটাপন্ন করে তোলে, তখন আমরা বাধ্য হয়ে আপনার রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছি। অন্যদের মোকাবিলায় আমরা আপনার রাষ্ট্রে আপনার তত্ত্বাবধানে নিরাপদ ও নিশ্চিন্তে থাকার আশায় এ বিপৎসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি।

নাঈজাশি বলেন—

বেশ ভালো কথা। তোমাদের রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ওহি লাভ করেছেন, তা থেকে কিছু শোনাও।

জাফর রা. সূরা মারইয়ামের প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করেন। মহামহিম আল্লাহর পবিত্র বাণী শুনে সম্রাট আবেগান্বিত হয়ে পড়েন। দু-চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করে। এমনকি তার দাড়ি পর্যন্ত ভিজে যায়।

নাঈজাশি বলেন—

খোদার কসম! এ তো সেই কথা, যা ইসা ইবনে মারইয়াম নিয়ে এসেছেন।



এরপর তিনি কুরাইশি দুই দূতের দিকে ফিরে বলেন—তোমরা ভালোই ভালোই এখান থেকে ফিরে যাও। আল্লাহর কসম! একজনকেও আমি তোমাদের হাতে দেবো না। এটা হতেই পারে না।

(দ্বিতীয় দিনও) দূতেরা পুনরায় সশ্রুটের কাছে এসে কানপড়া দিয়ে বলে—জাহাঁপনা, এরা ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে খুব আজিবি আজিবি কথা বলে।

নাঈজাশি সন্দেহ দূর করতে মুসলিমদের আবার দরবারে ডেকে আনেন এবং ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।

জাফর রা. বলেন—

আমরা সেই মহান রাসুলের ব্যাপারে তা-ই বলি, যা আমাদের নবি বলেন। তিনি আমাদের বলেছেন—ঈসা ইবনে মারইয়াম আল্লাহর বান্দা। তাঁর পক্ষ থেকে রূহ এবং তাঁর কালিমা ১০০ যাকে তিনি কুমারী ও সতী নারী মারইয়ামের গর্ভে পাঠিয়েছেন।

এই বস্তু ও মস্তব্য শুনে নাঈজাশি মাটিতে হাত মেরে একটি কাঠি উঠিয়ে নেন এবং বলেন, খোদার কসম! ঈসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে তুমি যতটুকু শুনিয়েছ, তিনি এই কাঠি সমপরিমাণই; এর চেয়ে একচুলও বেশি ছিলেন না। এরপর তিনি কুরাইশি দুই দূতের আনা উপহারসামগ্রী ফিরিয়ে দেন এবং সোজা মক্কা ফিরে যেতে বলেন। আর তার রাষ্ট্রে অশ্রয় গ্রহণকারী মুসলিমদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আরও জোরদার করেন। অপরদিকে কুরাইশি দূতেরা বিফল ও ব্যর্থ হয়ে মক্কা ফিরে যায়।

কিছুদিন পর। হাবশা অভিবাসী মুসলিমদের কানে খবর পৌঁছল, মক্কার কাফিররা মুসলিম হয়ে গেছে। মুসলিমদের তেত্রিশ সদস্যের কাফেলা খুশিতে মক্কার পথে

১৬১ কালিমাভূমি ও মুহুদাহ : ইসা আ.-এর দুটি গুণবাচক নাম। কালিমা শব্দের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরিনে কিরাম থেকে তিনটি অর্থ রয়েছে—

- এক. আল্লাহপাকের ‘কুন’ নির্দেশের বাস্তবায়ন।
- দুই. আল্লাহর পক্ষ থেকে সূক্ষ্মবাদ।
- তিন. আল্লাহর নিদর্শন।

রূহ শব্দের ব্যাখ্যাতেও তাদের থেকে কয়েকটি অর্থ রয়েছে—

- এক. অতিশয় পবিত্র সত্তা।
- দুই. আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণ।
- তিন. আল্লাহর রহস্য।
- চার. আল্লাহর পক্ষ থেকে সূক্ষ্মকার।

সূত্র : তাকসীয়ে মাআরিফুল কুরআন, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২৯৮-৯৯



যাত্রা শুরু করে; কিন্তু মক্কার কাছাকাছি পৌঁছতেই শোনা গেল—এ তো খবর ছিল না, ছিল গুজব। তারপর এই কাকেলার বেশির ভাগই আবার হাবশা ফিরে যান; আর কয়েকজন মক্কায় অবস্থানকারী অন্যের নিরাপত্তা ও আশ্রয় নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। তাদের মধ্যে উসমান ইবনে মাজ্জউন রা. ওয়ালিদ ইবনে মুগিরার আশ্রয়ে আর আবু সালামা রা. আবু তালিবের নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

* * *



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

হাবশার হিজরতের তিনটি শিক্ষা

হাবশার হিজরতপর্ব থেকে তিন ধরনের শিক্ষা পাওয়া যায়—

প্রথম প্রকার : বিসর্জনে প্রকৃত ঋণ

নিঃসন্দেহে ইসলাম, ইসলামের অনুসরণ এবং ইসলামের ওপর পুরোপুরি আমলই সকল শক্তির উৎস ও ঝরনা। এই ইসলামই জমিজমা, বাড়ি-গাড়ি, ধনদৌলত, স্বাধীনতা, মান-সম্মান ইত্যাদি সব ধরনের এবং সকল প্রকারের অধিকার আদায় ও রক্ষার জিন্মাদার ও মূল চাবিকাঠি।

এজন্য দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনাকারী ও মুজাহিদগণের ওপর ওয়াজিব ও জরুরি হলো—তারা নিজেদের সকল স্বার্থ-সামর্থ্য ও সক্ষমতা ইসলামের ভিত্তি ও শিকড় রক্ষায় ব্যয় করবেন। নিজ জন্মভূমি-দেশ-ভিটেবাড়ি, জমিজমা, অর্থকড়ি, টাকা-পয়সা ও জীবন—সবকিছু ইসলাম রক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার ও উৎসর্গ করবেন এবং অকাতরে সব বিলিয়ে দেবেন। সময় ও প্রেক্ষাপট-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বস্তু বিসর্জন দিতেও কুষ্ঠা বা দ্বিধাবোধ করবেন না।

এ কারণেই তো যদি ধর্মের ওপর কোনো শকুনের ছায়া পড়ে বা ধীন মিটে যায় তাহলে এর সমাধান দেশ-ধনসম্পদ ও ভূখণ্ড না কর্তে পারলেও পার্শ্ব ও জাগতিক এসব বস্তুসামগ্রী অর্থাৎ জন্মভূমি-দেশ-ভিটেবাড়ি, জমিজমা, অর্থকড়ি টাকা-পয়সা ও জীবন—সবকিছু যদি ধীন রক্ষা ও ধীনকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়; যার ফলে মানুষের আকিদা-বিশ্বাসে দৃঢ়তা আসে, সমাজে এর ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানুষের অন্তরে এর প্রতি বিশ্বাস প্রগাঢ় ও বশ্বমূল হয়, তাহলে এ পথে উপর্যুক্ত যা কিছুই কুরবানি ও উৎসর্গ করা হোক না কেন, তা ফিরে আসবেই; বরং আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও মজবুত এবং অধিক হয়ে আসবে।



ইতিহাসের পাতা মেলে ধরলে সামনে আসে, নিখিল জাহানে এটাই আল্লাহর নীতি যে, অদৃশ্য বিষয় অর্থাৎ আকিদা-বিশ্বাস ও অভ্যন্তরীণ জগৎ যখন মজবুত ও শক্তিশালী হয়, তখন ভেতরের এই শক্তিই দৃশ্য বস্তুজগৎ ও বাহ্যিককে শক্তিশালী করে।

দুনিয়ার যেই সম্প্রদায় বা জাতিই বিশুদ্ধ আকিদা, উত্তম চরিত্র ও সামাজিক নির্ভুল মূলনীতির ওপর জমে থাকে এবং আমল করতে থাকে, বস্তুগত শক্তি ও কর্তৃত্ব তাদের দখলেই থাকে। পক্ষান্তরে তারা যখন স্বভাব-চরিত্র, আকিদা-বিশ্বাস এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রীয় আইনকানুনে থাকে নড়বড়ে ও দুর্বল, তখন তাদের বস্তুগত ও বাহ্যিক শক্তিও দুর্বল ও কমজোর হয়ে যায় এবং তারা বিলুপ্তি ও নিশ্চিহ্নের শিকার হয়।

কখনো কখনো এমন হয়েছে—কোনো জাতি তাদের আকিদা-বিশ্বাসে দুর্বল এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত কৃষ্টি-কালচার ও স্বভাব-চরিত্রে অধঃপতনের শিকার হলেও বস্তুগত ও বাহ্যিক শক্তিতে তারা সবল ও বলীয়ান; কিছু প্রকৃতপক্ষে তাদের পতনই হয় অতি দ্রুত এবং তারাই বিলুপ্ত হয় চোখের পলকে।

এর কারণ, কোনো জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসের বিবেচনায় একজন মানুষের আয়ুষ্কাল খুবই কম। কোনো মানুষ তার নিজস্ব পর্বক্ষেপে এতে কোনো সিংহাস্ত দিতে পারে না; বরং পুরো ইতিহাসের আয়নায় এর যাচাই-বাছাই হয় এবং দূরের ইতিহাস ঘাঁটখাটি করে একটা ফল বেরিয়ে আসে।

কখনো আবার এমনও দেখা গেছে—কোনো জাতি একসময় বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস লালন করত, সকল ভালো ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিল। তবে তারা বস্তুগত ও জাগতিক শৌর্ধবীর্য ও কর্তৃত্ব-নেতৃত্বশূন্য ও শক্তিহীন ছিল; কিছু যখন তারা এই বাহ্যিক কিছু আসবাবপত্রও ধীন ও বিশুদ্ধ আকিদা রক্ষায় ব্যয় করে ফেলে এবং সব ধরনের মন্দত্ব থেকে একটি পবিত্র সমাজ বিনির্মাণের ভিত্তি দাঁড় করায়, তখন অল্প সময়ের ব্যবধানেই বিশুদ্ধ আকিদা পোষণকারী এবং এর ওপর আমলকারী এই জাতিই তাদের হারানো দেশ-মাটি পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। লুপ্তিত ধনসম্পদ ফিরে পায় এবং তাদের বাহ্যিক শক্তিমত্তাও নবরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং নতুন পরাশক্তিতে জেগে ওঠে।



বিশ্বজগৎ তথা জগতের সূচনা-সমাপ্তি, মানুষ ও জীবন সম্পর্কে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ এবং যৌক্তিক ও বাস্তবিক ধারণা ও জ্ঞান ইসলাম ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ধর্মে দৃষ্টিগোচর হয় না। কারণ, ইসলাম মানুষের জন্য স্বয়ং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রণীত প্রিয় সংবিধান। ইনসাক ও ন্যায়পরায়ণতা, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক জীবনব্যবস্থা শুধু ইসলামই মানবজাতিকে উপহার দিয়েছে এবং বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে। ঠিক এ কারণেই ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রমে নিজের ধনসম্পদ, টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, পৈত্রিক সম্পত্তি এবং জীবন পর্যন্ত কুরবান ও উৎসর্গ করে দিতে হয়। এমতাবস্থায় মুসলিম তার জ্ঞানমাল ও দেশ-মাটির হিফাজত ও নিরাপত্তার জামানত হাসিল করতে পারে। এটা অযৌক্তিক কোনো ব্যাপার নয়। এজন্যই ইসলামে হিজরত শরিয়তসিদ্ধ ও সূচিত হয়েছে। যখন মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন সকল সীমা অতিক্রম করে এবং দিনদিন ধীনি কাছে তারা নতুন নতুন বাধা সৃষ্টি করতে থাকে, তখন নবিজি সাহাবায়ে কিরামকে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে এবং হিজরত করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

ধীনের পথে চলতে গিয়ে যেসব দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, এই হিজরত যেকোনো অংশেই সেসবের চেয়ে কম বা ছোটোখাটো কোনো বিপদ নয়—এটা সবারই জ্ঞান। বাস্তবে এই হিজরত বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে পালিয়ে যাওয়ার নাম নয়; বরং ঋণদায়ী সাহায্য আসা পর্যন্ত এটা পরীক্ষার ধরন ও সাধনার পথ পরিবর্তনের নাম।

এটাও সবাই জানে, মক্কা তখন ইসলামি রাষ্ট্র ছিল না। তদ্রশরও কোনো কোনো স্বল্প বোধসম্পন্ন অল্পবিদ্যার লোক অভিযোগ তোলে—সাহাবায়ে কিরাম আশ্রয়ের খোঁজে ইসলামি রাষ্ট্র মক্কা ছেড়ে কাকির রাষ্ট্র হাবশায় কেন গিয়েছিলেন?

এর বাস্তব ও আসল উত্তর হলো—ওই সময় মক্কা, হাবশা বা অন্য কোনো এলাকাই ইসলামি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ইসলাম পালনের উপযোগী স্থান ছিল না। সবই ছিল এক রকম। (কারণ, নবিজি কোনো ভূখণ্ডের অধিপতি ছিলেন না।) কাজেই এই পরিস্থিতিতে কোনোভাবে ধীন পালন ও ধীনের প্রচার-প্রসারের একটু সুযোগ-সুবিধা যেখানেই ছিল, সেখানে আশ্রয় নেওয়াই ছিল বড়ো কথা। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরাম হাবশাকে মক্কার চেয়ে নিরাপদ ও উপযুক্ত স্থান দেখে সেখানেই চলে যান। কারণ, মক্কা তখন মুসলিমদের আর কিছুই নিরাপত্তা ছিল না। পক্ষান্তরে হাবশায় জ্ঞানমাল দুটিরই নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল।



- ০১. ওয়াজিব
- ০২. জারিজ
- ০৩. হারাম

০১. ওয়াজিব

যখন ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান আত্মান-সালাত-সিয়াম-হজ্জ ইত্যাদি পালন ও আদায়ে বাধা আসে, তখন হিজরত করা ওয়াজিব।

০২. জারিজ

যখন মুসলিমদের সামনে নানা রকম সমস্যা ও বিপদ এবং দুঃখ-কষ্টের প্রাচীর দাঁড় করানো হয় এবং তাদের সংকীর্ণ অবস্থার সম্মুখীন করা হয়, তখন হিজরত করা জারিজ।

০৩. হারাম

হঠকারিতা বা অসমতাবশত ইসলামি অনুশাসন মোতাবেক জীবন পরিচালনা না করার উদ্দেশ্যে এমন কোনো স্থান, যেখানে শরিয়ত পালনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, সেখানে হিজরত করা হারাম।

বিত্তীয় প্রকার : ইসলামের সাথে ইসলামি ধর্মের নৈকট্য

আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসা আ.-এর শরিয়তে কত গভীর সম্পর্ক, এই ঘটনা থেকে সেই বাস্তবতা উপলব্ধি হয়। বাদশাহ নাজ্জাশি ছিলেন ইসা আ.-এর শরিয়তে প্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামি আকিদার একনিষ্ঠ ভক্ত ও খাটি বিশ্বাসী। তার এই একনিষ্ঠতার চাহিদা ও দাবি ছিল—তিনি

১৬৩ হটব্য : তাকসিরে কুরতুবি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৫; আব্বাসুল কুরআন ইকুল আরাবি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৮৭

১৬৪ 'আমাদের নবি এক ইসা আ.' —এভাবে কলা বা লেখার দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ইসা আ. আমাদের প্রাণের নন; বরং এভাবে কলার কারণ হলো—আমরা যেহেতু শেখ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরিয়তের অনুসারী, তাই তিনি আমাদের নবি। পক্ষান্তরে যেহেতু ইসা আ.-এর শরিয়ত আমাদের জন্য নয়, তাই তিনি আমাদের নবি নন। তবে দুজনই যেহেতু ইসলামের নবি এক আত্মা সবাই মুসলিম, তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে দুজনই আমাদের প্রাণের। আর এই অর্থ নবিত্ব ও বাকি সকল নবির ক্ষেত্রে ব্যাখ্যায়িত। সুতরাং যেখানেই এভাবে কলা বা লেখা হবে, সেখানেই এই অর্থ ও উদ্দেশ্য মনে রাখতে হবে।



বিক্রম সিরাহ

ইনজিল ও ইসা আ. প্রচারিত আকিদা-বিশ্বাস পরিপাশি কোনো ধর্ম বা মতবাদের প্রতি ঝুঁকবেন না এবং তার সমর্থনও করবেন না। অর্থাৎ (আজকের মতো) তৎকালীন খ্রিষ্টানদের বস্তুব্য ছিল, (নাউজুবিদ্বাহ) ইসা আ. আদ্রাহর ছেলে এবং তিনি তিন খোদার একজন।

এদের কথা যদি সত্যি ও সঠিক হতো, তাহলে নাজ্জাশি বাদশাহ নিজে তো ইনজিলের হুকুম-আহকাম মানতেন, ইসা আ.-এর প্রচারিত শরিয়ত মোতাবেক আমল করতেন এবং একজন খাঁটি ইসায়ি ছিলেন। কাজেই এমতাবস্থায় তার করণীয় ছিল, তার নবি ইসা আ.-এর ব্যাপারে মুসলিমদের আকিদা খণ্ডন করা এবং কুরাইশদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা; কিন্তু প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন।

সব্রাট যখন ইসা আ. সম্পর্কিত কুরআনি বিবরণ শোনেন, তখন বলেন— নিঃসন্দেহে এই আলোচনা আর ইসা ইবনে মারইয়ামের বস্তুব্য একই জায়গা ও অভিন্ন সম্ভা থেকেই এসেছে।

নাজ্জাশি বাদশাহ এই কথাটি চারপাশে উপস্থিত ও উপবিষ্ট ইনজিল লেখক ও ইসায়ি উলামায়ে কিরামের সামনে বলেন। (তাদের কেউই দ্বিমত পোষণ করেননি।) কাজেই সকল নবি এক ও অভিন্ন (শরিয়ত নয় বরং) আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে যে দুনিয়ায় এসেছিলেন এবং পরবর্তী কোনো নবিই পূর্ববর্তী নবির মূল কথায় বা প্রধান কাজে বিরোধিতা করেননি—সেই দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট প্রমাণকে বাদশাহর উক্ত বস্তুব্য আরও দৃঢ়, মজবুত ও জোরালো করে। ইহুদি-খ্রিষ্টানরা যেই মতভেদ ও মতানৈক্যের উত্তব ঘটিয়েছে, সেগুলো তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, অজ্ঞতা

১৬৫ কুরআন নাজিলের সাময়িক সময়ে খ্রিষ্টানরা বেসব উপদলে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে খ্রিষ্টবাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন তিনটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদল মনে করত—মসিহই খোদা। আরেক দল বলত—মসিহ খোদার ছেলে। আরেক দলের বিশ্বাস ছিল—তিন সদস্য সমন্বয়ে খোদার একক পরিবার।

এই তৃতীয় দলের আবার দুটি উপদল ছিল। একদলের বিশ্বাস—খোদার একক পরিবারের সদস্যরা হলো পিতা আদ্রাহ, পুত্র ইসা মসিহ ও স্ত্রী মারইয়াম।

আরেক দলের মতে—আদ্রাহ, ইসা ও বুদ্ধল কুদস জিবরাইল। (নাউজুবিদ্বাহ)। সূত্র : *তাকসীরে মাআরিফুল কুরআন*, বাংলা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ৩০০

এদের সবার খণ্ডনে আদ্রাহ তারালা সূরা নিসায় বলেন—

আহলে কিতাবগণ তোমরা ধ্বিনের ব্যাপারে বাড়বাড়ি করো না এবং আদ্রাহর শানে নিত্যন্ত সংগত বিষয় ছাড়া কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মারইয়ামের ছেলে মসিহ ইসা আদ্রাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি পাঠিয়েছেন মারইয়ামের নিকট এবং তাঁর বৃহৎ—তাঁরই কাছ থেকে আসত। অতএব, তোমরা আদ্রাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করো এবং তোমরা তিন খোদা বলো না।’ সূরা নিসা, আয়াত : ১৭১

প্রচলিত খ্রিষ্টবাদ বিষয়ে জানতে *হৃষ্টব্য ইক্বাল হক*, *খৃষ্টধর্মের বৃহৎ সম্মানে* ইত্যাদি গ্রন্থ।



আর অনবগতির কারণে নয়; বরং তা জ্ঞানের আলো তাদের কাছে আসার পরও উপেক্ষা, হঠকারিতা ও অবাধ্যতার ফসল। যেমনটি আব্বাহ তায়াল্লা সূরা জাসিয়ার ১৭ নং আয়াতে এবং অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় প্রকার : অমুসলিম দেশে আশ্রয়

এ থেকে এটাও পরিষ্কার যে, প্রয়োজনের খাতিরে মুসলিমরা অমুসলিমদের আশ্রয়ে যেতে পারবে। আশ্রয়দাতা অমুসলিম বা আহলে কিতাব, যা-ই হোক না কেন। যেমন—বাদশাহ নাজ্জাশি তখনও খ্রিষ্টান ছিলেন। পরে তিনি মুসলিম হন। আবার কখনো প্রয়োজনে এমন কারণও আশ্রয়ও নেওয়া যাবে, হোক সে কোনো মুশরিক। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিমরা যখন হাবশায় থেকে মক্কাবাসীর মুসলিম হওয়ার সংবাদ পান, তখন তারা মক্কায় ফিরে এসে দেখেন, খবরটি ভুয়া ও মিথ্যা। এমনতাবস্থায় কয়েকজন মুসলিম আবু তালিবসহ আরও কিছু মুশরিকের অধীনে আশ্রয় নেন। অনুরূপ আগে গিয়েছে (এক সামনে আসবে), নবিজি তারেক থেকে ফিরে মুতর্রিম ইবনে আদির আশ্রয় নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন।

কিছু এই সহযোগিতা ও আশ্রয় লাভের জন্য শর্ত হলো—দাওয়াতি কার্যক্রম যেন কোনোভাবে বাধাপ্রস্তু না হয়। স্বীনের হুকুম-আহুকামে পরিবর্তন না ঘটে। এবং কোনো হারাম কাজে নীরব থাকা শর্তযুক্ত না হয়। অন্যথায় এসব শর্তের ভিত্তিতে কোনো অমুসলিমের আশ্রয় লাভ মুসলিমদের জন্য অনুমোদিত নয়। এর দলিল নবিজির ওই অবস্থান—যা তিনি চাচা আবু তালিবের আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভের সময় গ্রহণ করেছিলেন। আবু তালিব যখন বলেছিলেন—তুমি তোমার প্রশ বাঁচাও। তোমার সাখের বাইরে কিছু করো না। মুশরিকদের ভগবানদের নিয়ে কথা বলা না। তখন নবিজি চাচার আশ্রয় ও নিরাপত্তা থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং সত্য প্রচারে ও হক স্পষ্টকরণে নীরব থাকাকে অস্বীকার করেন।

* * *





প্রথম প্রতিনিধিদলের আগমন

হাবশার আহলুল কিতাব

নবিজি ও সাহাবায়ে কিরাম যখন কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্ধাতন ও যজ্ঞা সহ্য করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে সর্বপ্রথম মক্কার বাইরে থেকে বিদেশি যেই প্রতিনিধিদল ইসলামকে জানা ও উপলব্ধির উদ্দেশ্যে নববি দরবারে হাজির হয়, তারা ছিলেন হাবশার ত্রিশের কিছু বেশি ইসায়ি উলামায়ে কিরাম।

এই প্রতিনিধিদল জাকর রা.-এর মক্কা প্রত্যাবর্তনের পরে আসে। তারা নবিজির সামনে বসে তাঁর আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা ইত্যাদি দেখে শুনে তাঁর সম্পর্কে জানেন এবং তাঁর পবিত্র মুখে কুরআনে কারিমের তিলাওয়াত শোনেন। শেষে সবাই এক বৈঠকে মুসলিম হয়ে যান। এ খবর আবু জাহেলের কানে পৌঁছতেই সে কঠিন ভাষায় বলে ওঠে—

আমরা তোমাদের চেয়ে বড়ো নির্বোধ, গাধা ও আহম্মক প্রতিনিধিদল এ জীবনে আর দেখিনি। তোমাদের জাতি তোমাদের এখানে পাঠিয়েছে এই লোকের ব্যাপারে জেনে শুনে এবং খোঁজখবর নিয়ে তাদের তার ব্যাপারে জানাতে। আর তোমরা বোকারা কিনা তাঁর কাছে কয়েক মিনিট বসেই তাঁর মিষ্টি কথায় গলে গলে এবং নিজেদের ধীন-ধর্মই ছেড়ে দিলে! এর কথায় বিশ্বাস করলে! একে আবার সত্যবাদীও বলেও স্বীকৃতি দিলে!

এই প্রতিনিধিরা উত্তরে বলে—

ফিকহস সিরাহ



তোমার প্রতি সালাম। আমরা তোমার সাথে মূর্খের মতো কথা বলতে আসিনি। তোমার ধর্ম নিয়ে তুমি থাকো, আমরা আমাদের ধর্মে আছি। আমরা নিজেদের কল্যাণ ও মজল থেকে বঞ্চিত করতে রাজি নই।

অতঃপর তাদের পরিশ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়াল্লা নাজিল করেন—

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا
أَمَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ
أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ۝

এর (কুরআনের) পূর্বে যাদের আমি কিতাব দান করেছিলাম, তারা এর প্রতি ঈমান এনেছে। আর যখন তাদের সামনে তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে—‘আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। এর আগে থেকেই আমরা মাথা নত করে আত্মসমর্পণ করেছি।’ এরাই সেসব লোক, যাদের দুইবার প্রতিদান দেওয়া হবে তাদের ধৈর্যের কারণে। এরা মন্দকে ভালোর মাধ্যমে প্রতিহত করে এবং আমার দেওয়া রিজিক থেকে স্বয়ংচ করে। আর যখন কোনো অনর্থক কথা শোনে, তখন তা এড়িয়ে চলে এবং বলে—‘আমাদের আমল আমাদের, তোমাদের আমল তোমাদের। তোমাদের ওপর সালাম। আমরা মূর্খদের সাথে ভর্ক করতে আগ্রহী নই।’

* * *



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

হাবশা থেকে প্রতিনিধিদলের এই আগমন-পর্ব থেকে দুটি বিষয় জেনে নেওয়া আমাদের জন্য জরুরি—

প্রথম বিষয় : দারিদ্র জন্ম স্বাধীন

যেই সময়ে মুসলিমদের বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করাসহ নানা ধরনের কষ্ট-যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছিল এবং বয়কটের মাধ্যমে মাতৃভূমিকে সংকীর্ণ করা হয়েছিল, ঠিক সেই সময় নবজির দরবারে এই প্রতিনিধিদলের আগমন এবং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এ বিষয়েরই স্পষ্ট ও পরিষ্কার দলিল যে, দাওয়াতের কাছে দারিদ্রের যত কষ্টই হোক না কেন এবং সাধনার পথে যত কঠিন পরিস্থিতিই সামনে আসুক না কেন, তারা নিজেদের কখনোই ব্যর্থ ও বিফল মনে করবে না। দুর্বলতা, পিছপা হওয়া বা নৈরাশ্যের শিকার হবে না; বরং আগের কথাটিই মনে রাখবে যে, এই পথে দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হওয়াই সফলতার আলামত ও বিজয়ের পূর্বলক্ষণ।

আগত এই প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিল ত্রিশজনের বেশি। এক বর্ণনা অনুযায়ী চল্লিশের বেশি। উদ্ভাল সমুদ্রের ভয়ংকর ঢেউয়ের পর ঢেউ পাড়ি দিয়ে তারা নবজির দরবারে পৌঁছান। যেন এই কুলহীন বিদ্যালয় থেকে কয়েকটি মুক্তা তুলে নিতে পারেন। এই নতুন দাওয়াত কবুল করে এর সাথে হৃদয়তা ও ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করতে পারেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে পারেন—‘ইসলামের শত্রুরা এই দাওয়াতি কাছে যতই বাধা দিক না কেন, মুসলিমদের যতই কষ্ট-যন্ত্রণায় জর্জরিত করুক না কেন, সবকিছু করেও তারা ইসলামের তেজোদীপ্ত আলোকরশ্মি পূর্ব-পশ্চিমে সূর্যালোকের মতো ছড়িয়ে পড়তে কোনোভাবেই আটকাতে পারবে না এবং এর সুমিষ্ট ফল ভোগে বাধা দিতে পারবে না।’



যেই না আবু জাহেলের কানে প্রতিনিষিদের ইসলাম গ্রহণের খবর পৌঁছল, তৎক্ষণাৎ এই শয়তান মনের কোভ নিকট শব্দে প্রকাশ করে এবং খুব বাজে শব্দে তাদের সম্বোধন করে; কিন্তু এই শয়তানের আর কীই-বা করার ক্ষমতা ছিল? এই কুস্তা ও তার সমমনাদের তো এই শক্তিই ছিল যে—এরা সাহাবায়ে কিরামকে আরও বেশি নির্যাতন-নিপীড়নের নিশানা ও টার্গেট বানাবে। বাকি ইসলামের দাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত করা তাদের পক্ষে অকটিভাবে আর সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয় বিষয় : হাবশিদের ঈমান ও সাধারণ মুমিনের ঈমান কি একই

হাবশার এই প্রতিনিষিরা নবিজির ওপর যে ঈমান এনেছেন, তার ধরন কী? তাদের ঈমান আর কুফর বর্জনকারী মুমিনের ঈমান কি একই রকম?

না। এক রকম নয়। প্রকৃতপক্ষে এবং বাস্তবে তাদের ঈমান পূর্ববর্তী ঈমানেরই ধারাবাহিকতা ও গতিশীলতা; যেই ঈমান ও আকিদা-বিশ্বাস তারা আগে থেকেই বৃক্ ধারণ ও লালন করছিল এবং সেই অনুযায়ী ধীন পালন করে আসছিল। যেমনটি সিরাতশাজ্জাত ও বিশেষজ্ঞরা বর্ণনা করেছেন।

বিশেষজ্ঞরা বর্ণনা করেন—তারা ইসা'য়ি ছিলেন। ইনজিলে বিশ্বাস করতেন। সে অনুযায়ী আমল করতেন। কলে ইনজিলই তাদের নির্দেশ দিচ্ছিল, ইসা ইবনে মারইয়ামের পরে যেই নবি আসবেন, তাঁর ওপর তোমরা ঈমান আনবে এবং ইনজিলই তাদের সেই নবির শারীরিক গঠন-কাঠামো ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলির বিবরণও ভুলে ধরেছে। কাজেই ইনজিলের প্রতি বিশ্বাস রাখার দাবিই ছিল যে, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনবে এবং তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করবে।

নবিজির প্রতি তাদের ঈমান আনয়নের অর্থ এক ধর্ম থেকে আরেক ধর্মে প্রবেশ তথা ধর্মান্তর নয়; বরং এ তো ইনজিলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান রাখারই বাস্তব অবস্থার ধারাবাহিকতা। কারণ, ইসা ইবনে মারইয়াম আ. এবং ইনজিলই তাদের শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে সজাগ থাকতে বলেছে। এই বিষয়বস্তু বোঝাতেই নাযিল হয়েছে—

وَإِذَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ
مُسْلِمِينَ ۝

আর যখন তাদের সামনে তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে—
আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ আমাদের
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। এর আগে থেকেই আমরা মাথা নত করে
আত্মসমর্পণ করেছি।

অর্থাৎ আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বেই তাঁর
প্রতি ঈমান এনেছি। এবং তাঁর আনুগত্যে মাথা নত করেছি। কারণ, তাঁর প্রতি
ঈমান আনা ইনজিলেরই একটি হুকুম।

প্রকৃতপক্ষে মুসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালামের আনীত শরিয়ত ও হুকুম-আহকামে
যায়া সঠিক ও পূর্ণাঙ্গা আমলকারী, তাদের যে কেউ নবিজিকে মানতে বাধ্য। কারণ,
তাওরাত ও ইনজিলের ওপর ঈমান আনয়ন ও বিশ্বাস স্থাপনের চাহিদা ও দাবিই
হলো—পরবর্তী সময়ে আগমনকারী কুরআন ও কুরআনপ্রাপ্ত নবির ওপর ঈমান
আনা। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে নির্দেশ দেন, যারা তাওরাত ও
ইনজিলের প্রতি ঈমান রাখে, তাদের আপনি সঠিক ও বাস্তবিকভাবে গ্রন্থে বর্ণিত
চাহিদা ও আদিষ্ট দাবির ওপর আমল করার দাওয়াত দেন। তাহলে দেখবেন, তারা
নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনার ওপর ঈমান আনবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا الشُّرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ...

আপনি বলে দেন—হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা তাওরাত-ইনজিল
প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত (হিদায়াতের) কোনো অংশের ওপর নও...

উপর্যুক্ত বিবরণের আলোকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, সত্য ধর্ম একটি হওয়ার
জ্ঞান রাখা। ধর্ম বলতে যা বোঝায়, তা কখনো একাধিক নয়; বরং একটি। এই
একমাত্র ধর্মই আদি পিতা ও প্রথম নবি আদম আ. থেকে শেষ নবি মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত। পক্ষান্তরে কিছু কিছু
মানুষের মুখে ‘আসমানি ধর্মসমূহ’ বলে চমকপ্রদ যেই শব্দের প্রচলন ঘটেছে, তা
একেবারেই ভুল ও অর্থহীন এবং ষড়যন্ত্রমূলক। কারণ, আল্লাহর কাছ থেকে
একাধিক ধর্ম কখনো আসেনি।

হ্যাঁ, আসমান থেকে একাধিক যা এসেছে, তা হলো নিয়মকানুন তথা শরিয়তের বিভিন্নতা। ফুগ, সমাজ ও মানুষের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেক পরবর্তী শরিয়ত পূর্ববর্তী শরিয়তকে রহিত করেছে; কিন্তু ‘আসমান থেকে ধর্ম এসেছে একাধিক’—এই কথা সম্পূর্ণ ভুল ও অশুদ্ধ। এতে শৃঙ্খলাশুধির কোনো বালাই নেই। ধর্মজগতের সূচনালগ্ন থেকে একটিই। আর তা হলো ইসলাম। তবে একেক নবির যুগে একেক নবির অঞ্চলে শরিয়ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এজন্যই আমাদের কর্তব্য ও করণীয় হলো ‘ধর্ম’ ও ‘শরিয়ত’ শব্দ দুটি ব্যবহারে ভুল করেও জগাষিচুড়ি না পাকানো।

কারণ, শব্দ দুটির মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য। স্বীন বা ধর্ম বলতে বোঝায় আকিদা-বিশ্বাস। আর শরিয়ত হলো ইবাদত-মুআমালাত— সম্পর্কিত অনুসৃত নিয়মনীতি ও হুকুম-আহকাম।

* * *

১৬৯ শরিয়তের অধীনে চারটি বিষয় : ১. ইবাদত (সালাত-সিয়াম ইত্যাদি), ২. মুআমালাত (লেনদেন, চুক্তি ইত্যাদি), ৩. মুআশারাৎ (বিয়ে তলাক দখলান ইত্যাদি) ও ৪. আখলাক (সভাব-চরিত্র, আচর ব্যবহার ইত্যাদি)





শোকের বছর

প্রিয়তমা জী ও চাচার বিদায়

নবিজির নব্যত লাভের দশম বছরটি ইসলামি ইতিহাসে ‘শোকের বছর’। এ বছর নবিজির প্রিয়তমা সহধর্মিণী খাদিজাতুল কুবরা রা. ও প্রিয় চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। ইবনে সাদ রহ. তার *তাবাকাত* গ্রন্থে লেখেন—দুজনের ইন্তেকালের মাঝে এক মাস পাঁচ দিনের ব্যবধান ছিল।

খাদিজা রা. মর্যাদায় বহু উঁচু স্তরের নারী। ইবনে হিশাম লেখেন—

তিনি ইসলামের প্রকৃত বধু। নবিজি যখনই ঘরে এসে তার কাছে মনের কোনো ব্যথা বা আঘাতের কথা বলতেন, তখনই তিনি তাঁকে পরম ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও প্রশান্তির চাদরে জড়িয়ে নিতেন।

অপরদিকে আবু তালিবও বাইরে তাঁর বাহু এবং পুরো জাতির মোকাবিলায় প্রধান সাহায্যকারী হিসেবে আবির্ভূত হতেন।

ইবনে হিশাম লেখেন—

আবু তালিবের ইন্তেকাল কুরাইশ কাফিরদের জন্য নবিজিকে কষ্ট দেওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়। তারা তার জীবদ্দশায় যেই কষ্ট নবিজিকে দেয়নি, এবার তাও শুরু করে। এমনকি কুরাইশদের এক নির্বোধ ও হতভাগা নবিজিকে পথব্লুন্ড করে তাঁর মাথা মূবারকে মাটি ঢেলে দেয়। এই মাটিভরা অবস্থায়ই তিনি ঘরে ফিরলে এক মেয়ে মাথা ধুয়ে দেন আর কাঁদতে থাকেন। নবিজি তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—



‘মা গো, কেঁদো না। নিশ্চিত জেনে রাখো, তোমার বাবার
হিজাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ।’”

এ বছর দাওয়াতের কাজে অসংখ্য কঠিন পরিস্থিতি ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার কারণে
তিনি এই বছরকে ‘শোকের বছর’ (عام الحزن) বলে ঘোষণা দেন।

* * *



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

একটি প্রশ্ন ও উত্তর

মকায় দুর্বল মুসলিমদের শক্তি অর্জনের আগেই নবিজির পৃষ্ঠপোষক ও সহায়ক আবু তালিবকে আল্লাহ তায়ালা মৃত্যু দিয়ে দেন। অথচ তখনও এক আবু তালিব ছাড়া আর কেউ ছিল না, যে কিনা নবিজির দেখভাল করবে এবং কুরাইশদের পক্ষ থেকে বাধাবিপত্তি এবং কঠিন ও জটিল পরিস্থিতিতে তাঁর পাশে থাকবে। আবু তালিব নিজের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী নবিজির হিফাজত ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং যথাসম্ভব কাকিরদের ছালা-যন্ত্রণা ও বিপদাপদ থেকে তাঁকে বাঁচাতেন। কাজেই এত তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কী হিকমত লুকায়িত ছিল?

অনুরূপ তিনি দাওয়াতি কাজে বাইরের সকল ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের পেরেশানি নিয়ে ঘরে এলে খাদিজা রা. থেকেই ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও প্রশান্তি লাভ করতেন। এবং এই দুজনের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রকাশে তাঁর মনের দুঃখ-বেদনা বহুলাংশে কমে যেত। সুতরাং তাকেও দ্রুত উঠিয়ে নেওয়ার মধ্যে কী ভেদ বা রহস্য ছিল?

এ থেকে পরিস্কারভাবে যেই হিকমত বা রহস্য বোঝা যায়, তা ইসলামি আকিদা-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তা হলো—আবু তালিব যদি নবিজির হিফাজত ও তত্ত্বাবধানের আরও সুযোগ পেতেন, আর এভাবেই একসময় মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করত এবং নবিজি ও সাহাবায়ে কিরাম মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবে অনেকেরই ধারণা হতো—

‘দাওয়াতি কার্যক্রমে তো আবু তালিবের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ছিলই, এবার এই ইসলামি রাষ্ট্র কায়মও হয়েছে তার পরোক্ষ দিকনির্দেশনা এবং সাহায্য-সহযোগিতায়। কারণ, স্বজাতির কাছে আবু তালিব ছিলেন বহু উঁচু স্তরের লোক। তাকে সবাই সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথেই দেখত। তিনি যদিও তার ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটাননি, তবুও ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রমে এবং ইসলামি রাষ্ট্র কায়মে তার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সাহায্য-সহযোগিতা ছিল। যার ফলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি



ওয়া সাদ্লাম সফল ও কামিয়াব হয়েছেন। পক্ষান্তরে বাকি সব মুসলিমকে এমন হিফাজত ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কাম্বিরদের অত্যাচার বেশি সহিতে হয়েছে।’

ঠিক এ কারণেই খোদায়ি ফয়সালা ছিল আবু তালিব ও খাদিজা রা. ছাড়াও বাহ্যিকভাবে তাঁর অন্য সহযোগী ও সমর্থকদের উঠিয়ে নিয়ে নিচের দুটি বাস্তবতা সবার সামনে তুলে ধরা—

প্রথম বাস্তবতা : নিঃসন্দেহে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। কেউ যদি তাঁর সহযোগী নাও হতো, তবুও তিনিই তাঁর রাসুলকে মুশরিকদের থেকে হিফাজতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর সত্তা নিরাপদ ও সুরক্ষিতই থাকত এবং তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম সফল হতোই।

দ্বিতীয় বাস্তবতা : আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ ۝

অর আল্লাহই আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। ১০

এখানে মানুষের অনিষ্ট থেকে হিফাজত ও রক্ষার অর্থ এই নয় যে, কাম্বির-মুশরিকরা তাঁকে বাহ্যিকভাবে দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনায় ফেলতে পারবে না; বরং এর অর্থ হলো—তারা তাঁকে খুন ও হত্যা করতে পারবে না। ১১

এ ছাড়া অন্যান্য দুঃখ-কষ্ট পর্যাণ্ত ও যথেষ্ট পরিমাণে নবীগণকে ভোগ করতে হয়েছে। কারণ, বাস্তবতা এটাই, হক ও সত্যের পথে বিশদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হতেই হয়। এটা উক্ত হিফাজতের প্রতিশ্রুতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝

অতএব, আপনি যেই বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করেন এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করেন। আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য আমিই যথেষ্ট। ১২

১৭১ সূরা মারিফা, আয়াত : ৬৭

১৭২ ভ্রমণ ও বাস্তব প্রতিকলন বিজ্ঞানের রাস্তা হয়। কুরাইশি যুদ্ধের পরে চেষ্টা ও কৌশল ব্যতিরেকে তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। পক্ষান্তরে পূর্বে বনি ইসরাইলের ইয়ুদিয়া তাদের একাধিক নবিকে হত্যা ও খুন করেছে। তাদের ক্ষেত্রে এই প্রতিশ্রুতি ছিল না।

১৭৩ সূরা বিজর, আয়াত : ১৪-১৫



وَلَقَدْ تَعَلَّمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ
السَّاجِدِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

আমি খুব ভালো করেই জানি, এদের কথাবার্তার কারণে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। কাজেই আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাবাহীর মাধ্যমে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকেন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন। আর আপনার রবের ইবাদত করতে থাকেন মৃত্যু পর্যন্ত।

খোদায়ি নিয়মের দাবি অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ হিকমত হলো—দাওয়াতি কার্যক্রমে নবিজি যেভাবে সর্বপ্রকার কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে তার উন্মত্তকেও ঠিক সেভাবে সকল প্রকার কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে এবং সবকিছু সয়ে নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং খুশির সাথেই সব ধরনের ছালা-যন্ত্রণা হজম করতে হবে। নবিজি যদি তাঁর দাওয়াতি মিশনে দুঃখ-কষ্ট ভোগ না করেই গম্ভ্যে পৌঁছে যেতেন, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম এবং পরবর্তী দায়িগণ আরাম-আয়েশের জিন্দেগি কামনা করতেন এবং এ কাজে বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট সহ্য করাকে অস্বীকার করতেন।

কিন্তু বাস্তব কথা হলো—নবিজির দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার কারণে ফল দাঁড়িয়েছে এই—উন্মত্ত এখন যখন দাওয়াতি কাজে সেসবের সম্মুখীন হয়, তখন তাদের মনে পড়ে, নবিজিকেও তো এসবের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তাঁকেও তো এসব ঝড়-তুফানের মোকাবিলা করতে হয়েছে। (সুতরাং এতে দুঃখের কী আছে?) এসব ভেবে তারা হাসিখুশিতে সব বরণ করে নেয়। নবিজিকে সময়ে সময়ে হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, লাঞ্ছনা ও অপমানের মুখে পড়তে হয়েছে। যেমন : তাঁর মাথা মুবারকে মাটি ঢেলে দেওয়ার ঘটনা।

ভাবা যায়, কার মাথায় মাটি ঢালা হয়েছে? যিনি বিশ্বব্রষ্টা ও মহাশক্তির আল্লাহর বশু এবং নিখিল জাহানের সকল কিছুকে বাদ দিয়ে যাকে তিনি বশুড়ের জন্য বেছে নিয়েছেন তাঁর মাথায়!

অনুরূপ তায়েফ যাত্রায় তিনি যেসব কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতি ও অসহনীয় নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, সেগুলোও মুসলিমদের দাওয়াতি কাজে আপতিত সকল



নির্ধাতন-নিপীড়নের মোকাবিলায় দৃঢ় থাকার উৎসাহ ও প্রেরণা জোগায়। ফলে তারা সহজেই এবং স্বাচ্ছন্দ্যেই সব দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নেয়।

‘শোকের বছর’ নামটি কেন

দ্বিতীয় যেই বিষয়টি এই পর্ব থেকে উঠে আসে, তা হলো—কারও কারও ধারণা, নবিজি নবুয়ত লাভের দশম বছরকে ‘শোকের বছর’ (আমূল হুজুন/عام الحزن) নাম দিয়েছেন কেবল খাদিজা রা.-এর বিরহ বেদনা ও আবু তালিবের বিচ্ছেদের কারণে। আবার কেউ কেউ তো আরও অশ্রুসর হয়েছেন। তারা নিজ আত্মীয়স্বজন ও প্রিয় পরিজনদের মৃত্যুতে মাতম করা এবং দীর্ঘদিনব্যাপী শোক পালনের দলিল রীতিমতো উদ্ভাবন করেছেন সিরাতের এই পর্ব থেকে।

অথচ বাস্তবতার নিরিখে এসব মত ও মন্তব্য তাদের বোধ ও চিন্তার ভুল ও অশুদ্ধতা। নবিজি প্রিয় চাচা ও প্রিয়তমা সহধর্মিণীর বিচ্ছেদে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে শোকাভূত হয়ে পড়েননি এবং এই দুই নিকটাত্মীয় ও মনের মানুষ হারানোর বেদনা ও দুশ্চিন্তার কারণেও এই বছরকে শোকের বছর নাম দেননি; বরং এই নামকরণের আসল কারণ তাদের দুজনের চলে যাওয়ায় দাওয়াতি কার্যক্রমের কয়েকটি দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া।

চাচা আবু তালিবের সহযোগিতায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি সহজেই দাওয়াত পৌঁছাতে পেরেছেন; কিন্তু চাচার ইচ্ছেকালে সেই সুবিধাটি বন্ধ হয়ে যায়। তিনি যখনই দাওয়াতের জন্য বেরোতেন, তখনই সামনে একাধিক বাধা ও শত্রুতা পথ আটকে দিত। এবং যখনই কোনো দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, সামনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যেত। ফলে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যেভাবে ঘর থেকে বের হতেন, সেভাবেই আবার ঘরে ফিরে আসতেন। নতুন করে কেউ তাঁর ওপর ঈমান আনবে তো দূরের কথা, তাঁর কথাও শুনত না; বরং প্রত্যেকেই হাসি-তামাশা করত, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, কথার বিরোধিতা করত এবং অসম্মানজনক অভঙ্গ আচরণ করত। তিনি প্রাপ্ত দায়িত্বে আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় খুবই চিন্তাশ্রান্ত ও মর্মান্বিত হতেন। আর এ কারণেই মূলত এ বছরের নাম দেন শোকের বছর; বরং তিনি তো কখনো কখনো এই ভেবে মর্মান্বিত হতেন—

আমি যা নিয়ে এসেছি, তা অকাটাভাবে শতভাগ সত্য হওয়ার পরও মানুষ কেন তা গ্রহণ করছে না? কেন আমার ওপর ঈমান আনছে না?



দিনের বেশির ভাগ সময় এই চিন্তাটাই তাকে কুরে কুরে খেত। তাঁর এই পেরেশানি কমাতে এবং মানসিক অশান্তি দূরীকরণ ও সমবেদনা জ্ঞাপনে আল্লাহ তায়ালা নিচের আয়াতগুলো নাজিল করেন। আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সান্ত্বনা দিয়েছেন, আপনি শুধু দাওয়াত-তাবলিগের কাজ করেন। এর বেশি আপনার দায়িত্ব নয়। এরা যদি আপনার পৌছানো হকের বার্তা কবুল না করে, তাহলে খামোখা নিজের ওপর কোনো প্রেসার বা চাপ নেবেন না। কুরআনে কারিমের ভাষায়—

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

আমি ভালো করেই জানি, তাদের কথাবার্তা আপনাকে দুঃখিত করে। তবে এরা কিছু আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না; বরং জালিমরা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করছে। অবশ্যই আপনার পূর্ববর্তী অনেক রাসূলকেও মিথ্যুক বলা হয়েছিল। তখন তাঁদের কাছে আমার সাহায্য আসা পর্যন্ত তাঁরা মিথ্যুক অভিহিত হওয়া ও কষ্ট পাওয়ার ওপর ধৈর্যধারণ করেছে। আল্লাহর কালিমার কোনো পরিবর্তনকারী নেই। অবশ্যই আপনার কাছে রাসূলগণের কিছু সংবাদ এসেছে। আর ওদের বিমুখতা প্রদর্শন যদি আপনার কাছে বড়ো মনে হয়, তবে আপনি যদি জমিনে কোনো সুড়ঙ্গা পেয়ে যান অথবা আসমানে ওঠার কোনো সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে পারেন; অতঃপর কোনো মুজিছা তাদের সামনে দেখান, তবুও (এরা ঈমান আনবে না)। আল্লাহ চাইলে অবশ্যই এদের হিদায়াতের ওপর একতাবন্ধ করতে পারতেন। কাজেই আপনি কখনোই মূর্খদের দলভুক্ত হবেন না ৮

* * *





তায়েফ যাত্রা

মক্কার কুরাইশরা জুলুম-নির্যাতনের শেষ সীমায় উপনীত হলে একদিকে সাহাবায়ে কিরাম হাবশায় হিজরত করেন, অপরদিকে নবিজি বনু সাকিফের সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর সত্য বাণী কবুল করে তাঁর ওপর ঈমান আনয়নের আশায় তায়েফে অভিযুক্ত যাত্রা করেন।

তায়েফ পৌঁছার পর প্রথমেই সাক্ষাৎ হয় বনু সাকিফের একদল লোকের সাথে। এরা গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোক। তিনি তাদের মাঝে বসেন এবং তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের দাওয়াত দেন। আর এতদূর আগমনের উদ্দেশ্যও জানান; কিন্তু এরা খুব বাজেভাবে তাঁর দাওয়াতের জবাব দেয় এবং এমন কিস্তি ভাষায় কথাবার্তা বলে, যা তাঁর কাছে ছিল একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত ও আশ্চর্যীত। তিনি তাদের থেকে উঠে পড়েন এবং যাওয়ার সময় শেষ আবদার করেন—‘আমার এখানে আসার খবর কুরাইশদের থেকে গোপন রাখবে।’

কিন্তু ওরা এ ব্যাপারেও তাঁকে ইতিবাচক কোনো উত্তর দেয়নি। এতেই ক্রান্ত থাকেনি। তায়েফের এই নেতা ও প্রধানরা এলাকার দুটো ও বাজে ছেলেপেলে আর গোলামদের তাঁর পেছনে লেলিয়ে দেয়; ওরা যেন তাঁকে বিরে শোরগোল ও হইচই করে, পাগল-উদ্ভাদ বলে চ্যাঁচামেচি ও গালিগালাজ করে এবং সমান তালে পাথর

১৭৬ তায়েফ। বর্তমান সৌদি আরবের পশ্চিম-দক্ষিণের মাঝামাঝি একটি শহর। মক্কা থেকে ৯০ কিলোমিটার, জেদ্দা থেকে ১৬০ কিলোমিটার আর রাস্তানী রিহাদ থেকে ৯০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আরব উপদ্বীপের অন্যতম প্রাচীন নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্রদের কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত। জাহিলিয়াতের ‘উকাছ’ বাক্সার এই তায়েফের সীমারেখাতেই অবস্থিত। এলাকাটি কবির জন্য উর্বর। এখানকার উল্লেখযোগ্য মসজিদের মধ্যে আছে মসজিদে ইবনে আব্বাস রা. ও মসজিদে আব্বাস রা.। এখানে অসংখ্য টিলা, ছোটো ছোটো লেক, পর্বতন স্পষ্ট আছে। *হাউসুজাতু ১০০০ মাদিনাতি ইসলামিয়া*: ৩২৪-৩২৫



কিকহস সিরাহ

মারতে থাকে। ফলে ওরা তা-ই করতে শুরু করে। নিষ্কিণ্ট পাখরের আঘাতে আঘাতে নবিজির দুই পা মুবারক রক্তস্রাব হয়ে যায়।

এ সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন আজাদকৃত দাস জায়েদ ইবনে হারিসা রা। তিনি আঘাত ঠেকাতে তাঁর সামনে নিজের শরীর পেতে দেন। আঘাতের প্রচণ্ডতা ও তীব্রতায় তাঁর মাথাতেও কয়েকটি গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়।

নবিজি এভাবে চলতে চলতে উতবা ইবনে রবিয়ার আঙুর বাগানে গিয়ে পৌঁছেন। তিনি হাতের নাগালের বাইরে চলে আসায় ইবলিস ছেলেপেলেও ধীরে ধীরে ফিরে যায়। দুর্বলতা ও আঘাতের যন্ত্রণা তাঁকে বসে বিশ্রাম নিতে বাধ্য করে। তিনি আঙুর গাছের ছায়ায় বসে পড়েন। রবিয়ার দুই ছেলে দূর থেকে সব দেখছিল। কিছুক্ষণ ছায়ায় বসে কিছুটা স্থিতি ও শান্তি অনুভব করলে তিনি মাথা মুবারক ওঠান এবং দু'আ করেন—

হে মাওলায়ে কারিম, আমি আপনার কাছে আমার শারীরিক দুর্বলতা, আমলি শক্তির ঘাটতি আর মানুষের চোখে নিজের অসহায়ত্বের অভিযোগ করছি। হে করুণার আধার, আপনি সব দুর্বলের প্রভু। আপনি আমারও প্রভু। আপনি আমাকে কার কাছে ছেড়ে দিচ্ছেন? আপনি কি আমাকে এমন কারও কাছে ছেড়ে দিচ্ছেন, যে বুট চেহারায় আমার সামনে আসবে? আপনি কি আমার বিষয়াশয় কোনো শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছেন? আপনি যদি আমার প্রতি নারাজ না থাকেন, তাহলে এসব কষ্ট আমার কাছে কিছুই না। তবে আপনার পক্ষ থেকে যদি আমি ক্ষমা ও শান্তি পাই, তাহলে তা আমার জন্য প্রশান্তি। আমি আপনার নুর ও আলোর আশ্রয়প্রার্থী; যেই নুরের ছটায় সকল আঁধার আলোকিত হয়ে যায়। দুনিয়া-আখিরাতের কাজকারবার সঠিক ও পুরস্কারযোগ্য হয়। আমার ওপর আপনার গজব পড়া থেকে আমায় রক্ষা করুন। আমার ওপর আপনি নারাজ থাকবেন না। আমি আপনার সন্তুষ্টির ভিখারি, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আপনার শক্তি ও জোর ব্যতীত আর কোনো শক্তি নেই।



নবিজির সাথে আদাসের সাক্ষাৎ

নবিজির এসব আচরণ ও কাজ দেখে বাগানের মালিক রবিয়ার ছেলেদের মনে দয়ার উদ্রেক হয়। তারা তাদের আদাস নামের এক ইসারি গোলামকে ডেকে আনে। এক খোকা আঙুরের একটি পাত্র আদাসের হাতে দিয়ে নবিজির কাছে পাঠায়। আদাস আঙুরের পাত্র নিয়ে নবিজির সামনে হাজির হয় এবং সম্মানের সাথে খেতে বললে তিনি ‘বিসমিল্লাহ’ বলে হাত বাড়ান এবং কয়েকটি আঙুর খান।

নবিজির বিসমিল্লাহ উচ্চারণ শুনে আদাস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, খোদার কসম! খাওয়ার আগে এ রকম কথা তো এই এলাকার কারও মুখে শোনা যায় না। (আপনি তাহলে)? নবিজি জানতে চান, তুমি কোন এলাকার এবং তোমার ধর্ম কী? সে উত্তর দেয়—আমি একজন ইসারি (খ্রিষ্টান)। আমার বাড়ি মাওসিলের নিনগরা। তিনি জিজ্ঞেস করেন, ও তুমি কি তাহলে আল্লাহর নেক বান্দা ইউনুস ইবনে মাত্তার এলাকার?

আদাস জিজ্ঞেস করে—আপনি ইউনুস ইবনে মাত্তাকে কীভাবে চেনেন?

নবিজি জবাব দেন—তিনি তো আমার দ্বীনি ভাই। তিনি নবি ছিলেন আর আমিও নবি। এ কথা শুনেই আদাস নবিজির একেবারে কাছে এসে তাঁর মাথা, হাত ও পা মুবারকে চুমু খেতে থাকে।

জিনদের তিলাওয়ার্ত গ্রন্থ

ইবনে ইসহাক বলেন—

নবিজি তায়েফ থেকে মকায় ফেরার সময় পথমধ্যে নাখলা নামক স্থানে সালাতে দাঁড়ান। ঘটনাক্রমে একদল জিন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের কানে নবিজির

১৭৮ মাওসিল বা মওসুল বা মসুল। উত্তর ইরাকের গ্রন্থি নগরী। নিনগরা জেলার বিজারীর শহর। জিজির প্রথম শতকেই এখানে ইসলাম পৌঁছে। জনসংখ্যার বিবেচনার রাজধানী বাগদাদের পরই এর স্থান। শহরটি বাগদাদ থেকে ৪৬৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ শহর নিয়ে আছে বহু ইতিহাস। *মার্টিনহুজ ১০০০ মানিমাতি ইসলামিয়া*: ৪৮৯ ১৭৯ নিনগরা। পৃথিবীর প্রাচীনতম নগরগুলোর একটি। বর্তমান ইরাকের উত্তর-পশ্চিমে এর অবস্থান। এর পশ্চিমে সিরিয়া। এটি নজ্জার উত্তরে আর এর বিপরীতে মাওসিল। আলুরি সত্রটি নিনাউস নিজের নামে এ নগরীর গোড়াপত্তন করে। তারপর একসময় নগরটি ধর্মীয় কেন্দ্রের রূপ নেয়। পরবর্তী সময়ে মাওসিল শহর প্রতিষ্ঠিত হলে ধীরে ধীরে এটিই বড়ো ও বৃহত্ত নগরীতে পরিণত হয়। আর নিনগরা হয়ে যায় তার অংশ ও জেলাশহর।

১৮০ হুইয়া: ইমানে খিলাম, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪২০

১৮১ নাখলা উপত্যকা। মকা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা। বনু হুজাইলের আবাসস্থল। এর একটি পথ গেছে ইরাকের দিকে, আরেকটি গেছে বৃহত্তর শামের দিকে।



তিলাওয়াতের শব্দ পৌঁছেতেই তারা জায়গায় দাঁড়িয়ে যায় এবং নব্বিজির পুরো তিলাওয়াত শোনে। সালাত শেষ হলে তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে এ ব্যাপারে সংবাদ দেয় এবং ভয় দেখায়। তারা সবাই শ্রুত বাণী মেনে নেয় এবং বিশ্বাস করে। এই ঘটনাটিই আদ্রাহ তায়াল্লা এভাবে বর্ণনা করেন—

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجْزِكُمْ مِنْ عَذَابِ آلِيمٍ.

স্মরণ করেন ওই সময়কে, যখন একদল জিনকে আপনার অভিমুখী করে দিয়েছিলাম; যারা মনোযোগ দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল। তারা যখন আপনার কাছে পৌঁছে, তখন পরস্পরে বলে—সবাই চুপ থাকো। তারপর যখন তিলাওয়াত শেষ হয়, তখন তারা নিছক সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যায় ভীতি প্রদর্শকরূপে। তারা গিয়ে বলে—হে আমাদের জাতি, আমরা এমন এক কিতাব শুনে এসেছি—যা মুসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারীরূপে। যা সত্য ও সরল পথপ্রদর্শন করে। হে আমাদের জাতি, তোমরা আদ্রাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে আশ্রয় দেবেন ১০০

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ...

আপনি বলে দিন, আমার কাছে ওহি এসেছে যে, একদল জিন মনোযোগ দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনেছে ১০০...

নব্বিজি জায়িদ রা.-কে নিয়ে আসতে আসতে যখন মক্কার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন, তখন জায়িদ রা. জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি কীভাবে মক্কায প্রবেশ



করবেন, ওরা তো আপনাকে এখান থেকে বের করে দিয়েছে? নবিজি জবাব দেন—

জারিদ, তুমি যা দেখছ, আল্লাহ তায়ালা তাতে প্রশস্ততা দেবেন। তিনি একটা উপায় বের করে দেবেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী। তাঁর নবিকে বিজয় দানকারী।

তিনি এই বলে জারিদ রা.-কে বনু খুজাআর মুতয়িম ইবনে আদির কাছে পাঠান এবং জানাতে বলেন—তিনি তার আশ্রয়ে মকায় প্রবেশ করতে চান। মুতয়িম খবর পাওয়ামাত্র প্রস্তাব গ্রহণ করে। এভাবে নবিজি পুনরায় মকায় প্রবেশ করেন।

* * *



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

নবিজির তায়েফ যাত্রা, সেখানে তাঁর ওপর চালানো জুলুম-নির্যাতন এবং তারপর মক্কা ফিরে দাওয়াতের নতুন কর্মসূচী ও কৌশল অবলম্বন ইত্যাদি নিয়ে পর্যালোচনা করলে সেগুলোকে এভাবে বর্ণনা করা যায়—

নবিজিকে যেসব কঠিন পরিস্থিতি ও দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বিশেষ করে এই তায়েফ যাত্রায় যেসব অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্যে হয়েছে, সবকিছুই সম্পর্ক দাওয়াত-তাবলিগের সাথে।

তিনি যেভাবে আমাদের কাছে ব্রহ্মা ও সৃষ্টির ব্যাপারে আকিদা-বিশ্বাসের বিশুদ্ধ ও বাস্তবিক জ্ঞান পৌঁছিয়েছেন এবং হুকুম-আহকাম, ইবাদত-বন্দেগি, স্বভাব-চরিত্র ও ইসলামের যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন, ঠিক সেভাবে মুসলিমদের আল্লাহর রাস্তায় কী পরিমাণ ধৈর্য ধরতে হবে, তাও বলেছেন। শুধু বলেননি, বরং ধৈর্য ও দৃঢ়তার প্রকৃতি ও স্বরূপ নিজ আমল ও কর্মজীবনের মাধ্যমেও দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا...

ইমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ধরো। দৃঢ়পদ থাকো এবং যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকো...—

নবিজি ‘তোমরা ঠিক সেভাবেই সালাত পড়ো, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখো’ বলে যেভাবে সালাতের ধরন-পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে ঘোষণা দিয়েছেন—



তোমরা আমার আমল দেখে দেখে তোমাদের সব ইবাদত-পাখতি শিখে
নাও।

এর ওপর বিবেচনা করে এবং এই মৌলিক কাজের ওপর অন্য সব আমলের ভিত্তি
দাঁড় করিয়ে দাওয়াতের কাজে নানা ধরনের, নানা প্রকারের কষ্ট-যন্ত্রণা বরদাশত
করার ব্যাপারে তিনি বলেন—‘তোমরাও তেমন ধৈর্যধারণ করো, যেমন আমাকে
করতে দেখো।’

এ থেকে পরিস্কার, ঝামেলা ও বিপদাপদে ধৈর্য ধরা, কঠিন ও জটিল পরিস্থিতি
এবং সংকীর্ণ ও সংকটাপন্ন অবস্থার মোকাবিলা করাও ইসলামের ভিত্তিমূলক ও
মৌলিক বিষয়। যোগুলোর ব্যাপারে সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এক নবিজি
নিজেও সেই নির্দেশের অধীন।

নবিজির তায়েফ সফর থেকে কারও মনে খটকা লাগতে পারে—

(নাউজুবিল্লাহ) তিনি সেখানে পরাজিত হয়েছেন। সেখানেও তাঁর ওপর
জুলুমের শেষ সীমা অতিক্রম করা হয়। এতে তাঁর মনে প্রচণ্ড আঘাত ও
চোট লাগে। তাই তিনি বাগানে যাওয়ার পর মনের দুঃখে আল্লাহর কাছে
ওই দুআ করেন।

কিন্তু এই ধারণা শুধু ধারণাই; বরং আসল ও বাস্তব কথা হলো—তিনি এইসব
জুলুম-নির্যাতন ও বিপদাপদের প্রতি সন্তুষ্ট থেকেই ধৈর্য ও দৃঢ়তার মাধ্যমে এসব
কঠিন পরিস্থিতি ও চরম দুরবস্থার মোকাবিলা করেন।

অন্যথায় তিনি চাইলে ওইসব বাজে ও দুষ্ট ছেলেপেলে এবং ওদের উসকানিদাতা
তায়েফ নেতৃবৃন্দের থেকে প্রতিশোধ ও বদলা নিতে পারতেন; কিন্তু তিনি প্রতিশোধ
নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না।

এর দলিল ‘সহিহ বুখারি’ ও ‘সহিহ মুসলিম’-এর বর্ণিত হাদিস। আশ্মাজান আয়িশা
রা. থেকে বর্ণিত—

একবার আশ্মাজান আয়িশা নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ,
আপনার জীবনে কি উহুদের দিনের চেয়েও কঠিন ও বেদনাদায়ক কোনো
দিন অতিবাহিত হয়েছে?

জবাবে তিনি বলেন—তোমার জাতি থেকে আমাকে কয়েকবার কষ্টে
পড়তে হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন দিন ‘ইয়াওমুল আকাবা’



খিকহস সিরাহ

তথা তায়েফের দিন। আমি ইবনে আবদ ইয়ালায়ল ইবনে আবদ কিলাল—এর সামনে গিয়ে দাওয়াত পেশ করলে সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। আমার মুখ যেদিকে ফিরে সেদিকেই চলতে থাকি। যেতে যেতে আমি ‘করনুস সাআলিব’—এ পৌছে ওপরের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখি, মেঘেরা আমার ওপর ছায়া দিয়ে আছে।

লক্ষ করলাম, তাতে জিবরাইল আ. উপস্থিত। তিনি আমাকে লক্ষ করে বলেন—আপনার জাতির সব বেয়াদবিমূলক কথাবার্তা আপনার রব শুনছেন। আপনার দাওয়াতের জবাব যে তারা কী এবং কীভাবে দিয়েছে, তাও তাঁর জানা হয়েছে। তিনি এই মুহূর্তে আপনার ইচ্ছাপূরণে পর্বতমালার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদের পাঠিয়েছেন।

অতঃপর প্রধান ফেরেশতা আমায় সালাম দিয়ে বলেন, হে মুহাম্মাদ, আল্লাহ আপনার জাতির অশোভনীয় জবাব শুনছেন। আমি পর্বতমালার নিয়োজিত প্রধান ফেরেশতা। আপনার রব আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার ইচ্ছা পূরণে। বলুন, আপনার ইচ্ছা কী? আপনি চাইলে এদের দু-দিকের পাহাড় দিয়ে পিষে ফেলি। নবিজি জবাব দেন—না। এমন করবেন না। আমি আশাবাদী, আল্লাহ তায়াল্লা এদের ঔরসে এমন প্রজন্মের আগমন ঘটাবেন, যারা তাঁর ইবাদতগুজার হবে।

নবিজি এভাবে তার প্রিয় ছাত্র সাহাবায়ে কিরামকে কঠিন পরিস্থিতি ও মহাবিপদের মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করতে শিখিয়েছেন; বরং এ পথে যেকোনো বালা-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ এবং দৃঢ় ও অনড় থাকার নিয়মিত পাঠদান করেছেন।

একটি প্রশ্ন

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে—

আচ্ছা তা-ই যদি হয় তাহলে দুশ্চিন্তা ও বিবর্ততা এবং দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে দুআ করার দরকার কী ছিল?

১৮৬ ইবনে আবদ বা লাইল ইবনে আবদ কিলাল। বনু সাকিকের বড়ো একজন সর্গায় ও মাতব্বর।

১৮৭ করনুস সাআলিব। উচ্চৈশ্ব করনুস মানাজিল। এটা নজমবাসীর ইহরাম বাঁধার মিকাত। মক্কা থেকে এক দিন ও এক রাতের দূরত্বে অবস্থিত।



প্রবন্ধের উত্তর

এর উত্তর হলো—মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা, তাঁর সামনে নিজেকে হীন ও তুচ্ছ হিসেবে পেশ করা, নিজের কমজোরি ও দুর্বলতা তুলে ধরাই তাঁর পূর্ণ ইবাদত-বন্দেগি ও তাঁর নৈকট্যলাভের মাধ্যম এবং সান্নিধ্যের উপায়।

এতে রহস্য হলো—বিপদাপদ ও ব্যথা-বেদনায় পীড়িত ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং ইবাদত-বন্দেগি প্রদর্শন করে আল্লাহর দরবারে ভিকার হাত বাড়িয়ে দেয়। ফলে সে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর নৈকট্যলাভে খন্য হয়।

তো এভাবে ধৈর্যধারণের সাথে আল্লাহর দরবারে কল্যাণের দুআ করা এবং দয়া ও অনুগ্রহ ভিক্ষা করার মাঝে কোনো সংঘর্ষ বা কৈশিকতা নেই; বরং নবিজি তো আমাদেরকে তাঁর পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবনাদর্শের মাধ্যমে এই শিক্ষাটাই দিয়েছেন, বালা-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণের পাশাপাশি বিপদাপদের মালিক আল্লাহর দরবারে কায়মনো বাক্যে দুআ করা বিশিষ্ট লোকদের আমল এবং সাথে সাথে নিজের হীনতা, দীনতা, তুচ্ছতা ও অক্ষমতা মুখ ফুটে বলা ও প্রকাশ করা ইবাদতের সর্বোচ্চ তরিকা।

মানুষ নিজে সাধনা করে বা অলৌকিকভাবে মানবিক উৎকর্ষের যত ওপরই উঠুক না কেন, সে সর্বদা মানবত্বের গভির ভেতরেই থাকে। এর বাইরে যায় না। কারণ, আদমসন্তান হওয়ার কারণে তার প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যে ভালো-মন্দের অনুভব ও উপলব্ধি থেকেই যায়। ফলে সে মজাদার নিয়ামতের স্বাদ যেমন আত্মদান করতে পারে, ঠিক তেমনি অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদাপদ ও ব্যথা-বেদনার তিক্ততাও চাখতে পারে। দু-অবস্থায় সে অটোমেটিক দু-ধরনের স্বাদগ্রহণে মুকাদ্দাফ ও বাধ্য।

এই সবকিছুর মর্ম হলো—নবিজি যদিও যেকোনো কষ্ট বা বিপদের মুখোমুখি হতে নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সব সময় প্রস্তুত রাখার অলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান ছিলেন, তাই বলে তাঁর মানবত্বের বৈশিষ্ট্যও বিলীন হয়ে যায়নি। যে কারণে মজাদার নিয়ামতের স্বাদ আত্মদান করতেন এবং কষ্টদায়ক নিয়ামতের বিস্বাদও অনুভব করতেন। তবে তিনি আল্লাহর পথে স্বাদ ও ভোগের নিয়ামতের তুলনায় বালা-মুসিবত, বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট খুশিমনে ও আনন্দচিত্তে বরণ করে নিতে পারতেন। শুধু এবং শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন আর তাঁর উপযুক্ত বন্দেগি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এটাই সাওয়াব অর্জন এবং আল্লাহ তারালার সন্তুষ্টি ও রাজি-খুশি অর্জনের উপায় ও মাধ্যম। আর এভাবেই তার মুকাদ্দাফ হওয়ার বিষয়টি ফুটে ওঠে।



সিরাতের বিভিন্ন ঘটনা ও দৃশ্যপট পর্যালোচনা ও গবেষণায় উঠে আসে, নবিজিকে স্বগোষ্ঠীয় মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট প্রদানের তুলনায় তায়েফ ভূখণ্ডে তীব্র ও মারাত্মক নিপীড়ন ও যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হয়েছে; কিন্তু যখনই তাঁকে কষ্টে ফেলা হয়েছে, তখনই আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে। তিনি প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তিনি তাঁর হাবিবকে সাহুনা দিয়েছেন। তাঁর নবির ওপর দয়া প্রদর্শন করেছেন। যেন লাগাতার দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন পরিস্থিতির কারণে তাঁর মনে নিরাশা বাসা বাঁধতে না পারে।

আগে গিয়েছে, এই তায়েফ যাত্রায় দুই ও বাজে ছেলেদের পাথর নিক্ষেপের ফলে শারীরিক কষ্ট আর দাওয়াত অস্বীকারের কারণে মানসিক যন্ত্রণা—দু-ধরনের আঘাতই নবিজি পেয়েছেন। মক্কার মতো এখানেও আল্লাহ তায়ালা এই জুলুম-নির্যাতনের ব্যাপারে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তায়েফের যেই বাজে ও দুই ছেলেপেলে তাঁকে পাথরের পর পাথর মেরে রক্তাক্ত করেছে এবং যেসব নেতা ওদের উসকানি দিয়েছে আর নবিজিকে করেছে গালমন্দ, সবার ব্যাপারেই তিনি কঠিন ধমকি শোনান; কিন্তু এই সফরেই আবার ঘটেছে ঈসায়ী আদাসের ইসলাম গ্রহণের যথেষ্ট প্রশান্তি ও সাহুনাদায়ক ঘটনাও। আদাস মুসলিম হয়ে নবিজির মাথা-হাত-পা মুবারকে চুমু খায়। এতে বনু সাকিফের বদমাইশ ও হতভাগা পশুদের বেয়াদবি ও অভদ্রতার রেশ অনেকাংশে কেটে যায়।

প্রসঙ্গত এখানে মুত্তাফা সাদিক রাফিয়ি মিশরি রহ. (১২৯৮-১৩৫৬/১৮৮০-১৯৩৭)-এর কিছু কথা তুলে ধরা হলো। তিনি তার *ওয়াহযুল কলাম* গ্রন্থে তায়েফের ঘটনা উল্লেখের পর লেখেন—

কত বিস্ময়কর! তায়েফের ঘটনায় খোদায়ি ফয়সালার কত রহস্য-ভেদ সুস্পষ্ট ছিল! কত দ্রুত মান-মর্যাদা ও উত্তম অবস্থা এসে ধরা দেয়! কাফিরদের মন্দত্ব, নির্বুদ্দিতা ও শত্রুতার ওপর ক্ষমা চায়। সমালোচনা, গালিগালাজ ও বাজে শব্দে অভিহিত করার পরপরই আদব ও সম্মানের মুকুট পরানো হয়। এবং হাত-পা চুমুতে সিন্ত করা হয়!

রবিয়ার দুই ছেলেও ইসলামের শত্রু ছিল। এবং তাদের সজ্ঞী ছিল যারা আবু তালিবকে হুমকি দিয়েছিল, আপনি আপনার ভাতিজাকে মুক্ত করে দেন। তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অথবা তাঁকে আমাদের হাতে তুলে দেন। নতুবা এরা আপনাদের সাথে লড়াই শুরু করবে এবং দুই পক্ষের



একপক্ষ বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালাতেই থাকবে; কিন্তু এদের দুজনের পাশবিক মেজাজ ও হিংস্র স্বভাব ওই সময় মানবিক গুণ ও চরিত্রে পরিবর্তন হয়ে যায়—যেই গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সাথে এই দ্বীনের আগমন ঘটেছে। কারণ, দ্বীনের ভবিষ্যত চিন্তাভাবনার সাথে সম্পৃক্ত, কঠোর মেজাজ বা হিংস্র স্বভাবের সাথে নয়।

অনুগুণ খাঁটি ইসমায়ী শরিয়তও (বর্তমান) ইসলামের (অর্থাৎ শরিয়তে মুহাম্মাদির) খুবই ঘনিষ্ঠ এবং ইসলামকে (শরিয়তে মুহাম্মাদিকে) প্রমাণ করে। কারণ, একটি সঠিক ও সত্য বিষয় তার মতো আরেকটি বিষয়ের সাথে ভাই ভাই আচরণ করবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে পার্থক্য হলো—দুই ভাইয়ের মধ্যে থাকে রক্তের সম্পর্ক, আর দুই শরিয়তের মধ্যে আছে বিবেক-বুধির।

তায়্যেফের ওই আঙুরের ঘটনায় খোদায়ি সিদ্ধান্তের রহস্য ও ভেদের পূর্ণতা পায় এভাবে—আঙুরের পাকা মিষ্টি ও রসে ভরা যেই থোকাটি নবিজির সামনে পেশ করা হয় এবং নবিজির পবিত্র মুখে বিসমিল্লাহ উচ্চারিত হয় সেটাতে লুকায়িত ভেদটি হলো রসে ভরা আঙুরের থোকার দ্বারা ইজিত ভবিষ্যতের বিরাট ইসলামি সাম্রাজ্য। আর প্রতিটি আঙুর দ্বারা ইজিত বিরাট সাম্রাজ্যের একেকটি রাষ্ট্র :-

জায়িদ ইবনে হারিসা রা. নবিজির সুরক্ষা নিশ্চিতের যেই চেষ্টা চালিয়েছেন, তাও বিশ্ব মুসলিমের জন্য একটি উপমা ও দৃষ্টান্ত। দুট ছেলেরা যখনই নবিজির দিকে পাখর ছুড়ত তিনি নিজের শরীর নবিজির সামনে পেতে দিতেন। ফলে নিক্কেপের তীব্রতা ও আধিক্যের কারণে তার মাথায়ও একাধিক আঘাত ও জখম তৈরি হয়।

এই ঘটনায় তার প্রতিরোধকর্ম সকল মুসলিমের জন্য এক নমুনা ও আদর্শ স্থাপন করেছে যে, তারাও মুসলিম উম্মাহর প্রধান ব্যক্তি খলিফা বা ইমামের প্রাণ রক্ষার্থে নিজেদের জীবন কুরবান করে দেবে। নবিজির সাথে সাহাবায়ে কিরামের এত গভীর হৃদ্যতা ও প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল যে, তারা তাঁর জীবন বাঁচাতে নিজেদের সবকিছু ত্যাগ করতেও কোনো কষ্ট অনুভব করতেন না। আজ যদিও তিনি সশরীরে আমাদের মাঝে উপস্থিত নন যে আমরা তার চরণাশে প্রতিরক্ষা কলম তৈরি করে তাঁর হিফাজত করব, তবে এখন তার বিকল্প হলো—ইসলাম ও দাওয়াত-



তাবলিগের পথে বিপদাপদ বা দুঃখ-কষ্ট দেখে পালিয়ে না যাওয়া। আর ইসলামের প্রচার-প্রসারে এবং দিবাঁদিক তার আলো ছড়িয়ে দিতে নবিজি যেমন চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনা করেছেন, আমাদেরও তেমন মেহনত-মুজাহাদা চালিয়ে যাওয়া। সর্বযুগে ও সর্বকালে ইসলামের পথে পরিচালনাকারী বিদ্যমান ও সক্রিয় ছিল, আছে এবং থাকবেই। এ কাজে তারাই নবিজির স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিরূপের মতো।

সকল মুসলিমের ওপর ফরজ সবাই তার একনিষ্ঠ সমর্থক ও সৈনিক হবে। তার চারপাশে বৃত্তাকার বানিয়ে তার হিফাজতে লেগে থাকবে এবং তার জীবনরক্ষায় নিজেদের জানমাল সর্বস্ব বিলিয়ে দেবে, যেমনটি সাহাবায়ে কিরাম করেছেন নবিজির জন্য।

জিনজাতির সাক্ষাৎ

নাখলায় নবিজির উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতের সাথে সালাত আদায় এবং তিলাওয়াত শুনে একদল জিনের ইসলাম গ্রহণের যেই ঘটনা ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, তা থেকে পৃথিবীতে জিনজাতির উপস্থিতি, তাদের চলাফেরা এবং মানবজাতির মতো মুকাদ্দাফ তথা ধর্মীয় বিধিবিধান আরোপের উপযুক্ত ও বাধ্য হওয়া ইত্যাদি প্রমাণিত। মানুষের মতো অবস্থা তাদেরও। তাদের মধ্যেও কিছু জিন নবিজির ওপর ঈমান এনেছে, আবার কিছু কুফরি করেছে।

এই দলিল অকাট্যতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কারণ, কুরআনে কারিমে অকাট্য ও স্পষ্টভাবে এর উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সূরা জিনের প্রাথমিক কয়েকটি। সূরা আহকাক-এর তিন (২৯-৩১) আয়াত।

ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের বর্ণিত এই এক ঘটনাই ইমাম বুখারি মুসলিম তিরমিজি রহ.-ও রেওয়ায়াত করেছেন।

ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে ইমাম বুখারি রহ.-এর বর্ণিত শব্দগুলো এই—

নবিজি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে উকাজ্ বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন।

আর তখন শয়তান তথা জিনদের আসমানে আরোহণ ও চুপিচুপি

১৮৯ উকাজ্ বাজার। তাকে শহরের উত্তরে ২৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ গল্ল। ৫০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। প্রাক-ইসলামি যুগের প্রধান তিনটি বাজারের মধ্যে একটি। আরবরা জিলকদের প্রথম বিশ দিনের জন্য এখানে এসে জিনিসপত্র বিক্রি করত এবং কবিতা আবৃত্তি করত। তারপর তারা মাক্কাত্ত বাজারে শেষ দশ দিন বেচাকেনা করত। তারপর জিলহজ্জ মাসের প্রথম আট দিন জুল বাজার বাজারে অভিযোজিত করে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা করত। এ বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রথম বসতি ছিল আদাওয়ান ও হাওয়াজিন পৌন্ডের।



ঋষাঋষর সংগ্রহের সুযোগ বন্ধ ছিল। উপরন্তু তাদের ওপর উচ্চাশিঙ নিক্ষেপ করা হতো। এমতাবস্থায় জিনেরা তাদের জাতির কাছে ফিরে গিয়ে পরামর্শে বসে। তারা বলতে থাকে, আমাদের আর আসমানের মধ্যে অবশ্যই কোনো না কোনো অন্তরাল ও বাধা সৃষ্টি হয়েছে। নতুনা আমাদের ওপর উচ্চাশিঙ নিক্ষেপ করা হয় কেন? সভার সভাপতি উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে, আমাদের এই সমস্যা নতুন কোনো ঘটনা বা প্রেক্ষাপটের কারণে তা খুঁজে বের করতে হবে। কাজেই তোমরা পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ো এবং তা খুঁজে বের করো। অতএব, তারা নতুন কারণ উদঘাটনে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে।

তাদের যেই দলটি তিহামার— উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল, তারা উচ্চাধ বাজার অতিক্রমের সময় নাখলায় নবিজির সাক্ষাৎ পায়। নবিজি এখানে সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। জিনরা নবিজির তিলাওয়াত শুনে বলে, এটাই ওই বিশেষ ঘটনা ও কারণ— যা আমাদের মাঝে আর আকাশের বিষয়বস্তুর মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা সেখান থেকেই নিজ এলাকায় ফিরে যায় এবং জাতিকে লক্ষ করে বলে—ভাইয়েরা, নিশ্চিতভাবে তোমরা জানো, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন তিলাওয়াত শুনেছি; যা হিদায়াতের দিকে পথপ্রদর্শন করে। কাজেই আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এখন থেকে আমরা আমাদের রব্বের সাথে আর কিছুকে শরিক করব না। আল্লাহ নবিজিকে এই ঋকর জানিয়ে দিতে নাজিল করেন—

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ...

আপনি বলে দেন, আমার কাছে ওহি এসেছে, একদল জিন মনোযোগ দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনেছে।

ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযি রহ.-ও উপর্যুক্ত শব্দেই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাদের বর্ণনার শুরুতে কয়েকটি শব্দ বেশি আছে। শব্দগুলো এই—

১১০ তিহামা। লোকিত সাগরের উপকূলীয় আরব উপদ্বীপের পশ্চিমাংশকে অতীতে বলা হতো।

১১১ সহিহ বুখারি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৭৩



‘নবিজি জিনদের কুরআন তিলাওয়াত শোনানি এবং তারা তাঁর দৃষ্টিগোচরও হয়নি।’

ইবনে হাজার আসকলানি রহ. *ফাতহুল বারিত* লেখেন—উল্লিখিত শব্দমালা ইচ্ছে করেই হয়তো ইমাম বুখারি রহ. অনুল্লেখ রেখেছেন। কারণ, ইবনে মাসউদ রা. প্রমাণ করেছেন, নবিজি জিনদের তিলাওয়াত শুনিয়েছেন। কাজেই ইতিবাচক বিষয়টি ইবনে আব্বাস রা.-এর নেতিবাচক বর্ণনার ওপর অগ্রগণ্য। আর এদিকেই সম্ভবত ইমাম মুসলিম রহ. ইজ্জিত দিয়েছেন। তাই তিনি তার গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসের পরে ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদিস এনেছেন। তাতে বর্ণনা করেছেন নবিজি সাম্রাজ্যে আল্লাহি ওয়া সাম্রাম বলেন—

আমার কাছে জিনদের একজন দায়ি আসে। আমি তার সাথে যাই এবং জিনদের কুরআন তিলাওয়াত শুনিয়ে আসি ۞

তারপর কথা হলো—ইমাম বুখারি, মুসলিম ও তিরমিযি রহ. যেই বিবরণ তুলে ধরেছেন, সেগুলো ইবনে ইসহাকের বর্ণনার সাথে দুভাবে কিছুটা ব্যতিক্রম—

প্রথমত : ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় নবিজির সালাত আদায়ের কথা নেই। তার বর্ণনায় বোঝা যায়, তিনি একাকী সালাত আদায় করেছেন। বিপরীতে অন্যান্য সব বিবরণে আছে, তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে সালাতে নিজে ইমাম হয়ে তা আদায় করেছেন।

দ্বিতীয়ত : ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় নির্দিষ্ট করে কোনো ওয়াক্তের কথা নেই। পক্ষান্তরে অন্যান্য বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ফজরের সালাতের উল্লেখ রয়েছে।

ফলাফল দাঁড়ায়—ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অভিযোগের উর্ধ্বে। বিপরীতে অন্যান্য রেওয়াজাতে দু-ধরনের আপত্তি থাকে—

প্রথম আপত্তি : তায়েফ সফরে নবিজির সাথে জায়িদ ইবনে হারিসা রা. ছাড়া আর কোনো সাহাবি ছিলেন না। এটাই সকল সিরাত বিশেষজ্ঞের মত। অতএব, নবিজি যে সাহাবায়ে কিরামের এক জামাত নিয়ে সালাত আদায় করেছেন, তার দলিলের মজবুতি কী?



বিত্তীয় আশঙ্কি : পাঁচ ওয়াস্ত সালাত ফরজ হয়েছে মিরাজের রাস্তে। আর মিরাজ সংঘটিত হয়েছে তায়েফ সফরের পরে। এই সম্বন্ধেই সকল মুহাক্কিক তথ্য বিশ্লেষক ও গবেষক উলামায়ে কিরামের। কাজেই ফজরের সালাত আদায়ের বর্ণনার শৃঙ্খতা ও সঠিকতা কোথায় থাকল?

প্রথম আশঙ্কির জবাব : এমন হতে পারে, নবিজি তায়েফ থেকে মক্কায় ফেরার পথে নাখলায় পৌঁছলে সাহাবায়ে কিরামের এক জামাতের সাথে সাক্ষাৎ হয়। আর সেখানে তিনি তাদের নিয়ে ফজরের সালাত নিজে ইমামতিসহ আদায় করেন।

বিত্তীয় আশঙ্কির জবাব : হতে পারে নবিজির সাথে জিনদের সাক্ষাৎ ও কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণের ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে। তো একবারের ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস রা., আরেকবারের ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইবনে মাসউদ রা.। তাহলে তো কোনো ঝামেলা থাকে না। প্রত্যেক বর্ণনা স্ব-স্ব স্থানে ঠিক।

এই সম্ভাবনামূলোর ওপরই ইবনে হাজার রহ.-সহ জমহুর মুহাক্কিক আলিমের ঐকমত্য। এটা ওই অকথ্য, যখন মিরাজের ঘটনা তায়েফ সফরের পরে হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর যদি তায়েফ সফরের আগে হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে কোনো রিওয়াযাত নিয়েই ঝামেলা নেই।

জিনজাতির মুকাদ্দাক হওয়ার বিশ্বাস রাখা

এই ঘটনা পর্যালোচনায় যেই কথাটি জানা আমাদের জন্য জরুরি, তা হলো— জিনজাতির অস্তিত্ব ও উপস্থিতি, তাদেরও আল্লাহ তারালার সৃষ্টি হওয়া এবং আমাদের মতোই তারাও তাঁর হুকুম-আহকামের মুকাদ্দাক হওয়ার প্রতি প্রত্যেক মুসলিমের ঈমান ও বিশ্বাস রাখা; যদিও আমরা আমাদের অনুভূতি ও উপলব্ধির মাধ্যমে তাদের বুঝতে পারি না।

তাদেরকে আমাদের অনুভব না করতে পারার কারণ হলো—আল্লাহ তায়াল্লা তাদের উপস্থিতিকে আমাদের দৃষ্টিশক্তির আওতাহীন রেখেছেন। ফলে আমরা তাদের দেখতে পারি না। আর এটা তো সর্বস্বীকৃত, আমাদের দৃষ্টিশক্তি কেবল সরল রেখায় বিদ্যমান সুনির্দিষ্ট দূরত্বের বস্তু পর্যন্ত পৌঁছতেই সক্ষম।



এই সৃষ্টির অস্তিত্বহীনতা যেহেতু কুরআন-হাদিসের অকাটা বর্ণনায় প্রমাণিত এবং বিষয়টি জবুরিয়াতে বীন- তথা বীনের অপরিহার্য ও অত্যাৱশ্যকীয় অংশে পরিণত হয়েছে, সেহেতু সকল আলিমের অভিমত এটাই—কেউ যদি জিনজাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করে বা সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে সে মুরতাদ ও কাফির হয়ে যাবে।

অজ্ঞতা ও মূর্খতাবশত কোনো জ্ঞানী ও বিবেকবান লোকের উচিত নয়, তিনি দাবি তুলবেন—তিনি কেবল আধুনিক বিজ্ঞান সমর্থিত বিষয়গুলোই মানবেন। এবং বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে অহংকার করে বলবেন—‘আমি জিনজাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। কারণ, কোনো জিন আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। আবার আমার শরীরেও কখনো ভর করেনি। অতএব, জিন বলতে কিছুই নেই।’

এটা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট, এ ধরনের দাবির দ্বারা অসংখ্য অকাটা বিদ্যমান বস্তু ও সৃষ্টি অটোমেটিক অস্বীকার করা হয়। অথচ বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ খিওরি হলো—কোনো জিনিসের নাগাল না পাওয়ার অর্থ এই নয় যে, জগতে জিনিসটাই নেই। অর্থাৎ কোনো জিনিস খুঁজতে গিয়ে যদি পাওয়া বা দেখা না যায়, তাহলে এতে জিনিসটার অস্তিত্বহীনতা বোঝায় না।

একটি প্রশ্ন

তায়ফ সফরে নবিজি যা কিছু দেখেছেন, অথবা যেসব সমস্যায় তাঁকে পড়তে হয়েছে, সেগুলো তাঁর ওপর কী প্রভাব ফেলেছে?

প্রশ্নের উত্তর

এই প্রশ্নের উত্তর তা-ই, যা নবিজি জায়েদ ইবনে হারিসা রা.-কে দিয়েছেন। জায়েদ রা. জিজ্ঞেস করেছিলেন—ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি মক্কার আবার কীভাবে প্রবেশ করবেন? ওয়া তো আপনাকে বের করে দিয়েছে!

উত্তরে নবিজি বলেছিলেন—জায়েদ, তুমি যেসব দূরবস্থা দেখতে পাচ্ছ, আল্লাহ তায়ালাই এসবের প্রশস্ততা দানকারী এবং নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর নবির সাহায্যকারী ও রক্ষক।

১৯৩ যেসব বিষয় শরিয়তে মুহাম্মাদির অন্তর্ভুক্ত বলে ধারাবাহিক পরম্পরায় বর্ণিত এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবারই জানা, সেগুলোকে জবুরিয়াতে বীন। যেমন—সালাত, সিয়াম, হজ, জাকাত, আল্লাহর একত্ববাদ, নবিজির শেষ নবি হওয়া ইত্যাদি। সূর : দাবুল ইকতা, অনলাইন, দাবুল উলুম দেওবন্দ।



নবিজিকে ভায়েকে যেই দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে এক আগে মক্কার যেসব অকথা নির্ধাতন-নিপীড়ন সহিতে হয়েছে, সেগুলোর কারণে আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও নিছকের ভেতরের ইচ্ছাশক্তির ওপর কোনো প্রভাব পড়েনি; বরং তিনি ছিলেন প্রশান্ত এক আল্লাহ তায়ালার প্রতি পরিপক্ব ও পূর্ণ বিশ্বাসী। আল্লাহর কসম! তাঁর আত্মা সাধারণ কোনো আত্মা নয়; বরং তাঁর হৃদয়জুড়ে নবুয়তের বিশ্বাস ছিল অটল ও সুদৃঢ়। তিনি অকাত্যভাবে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহর হুকুম কার্যকর ও বাস্তবায়িত হবেই।

তিনি দৃঢ়ভাবে জানতেন, আল্লাহর আদিষ্ট পথেই তিনি চলমান এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহ তাঁর কাজকে পূর্ণতায় পৌঁছেবেনই। তিনি প্রতিটি ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছেন। অপেক্ষা শুধু সেই সময়ের।

এতে আমাদের জন্য একটি ইলমি ফারেল্লা বা জ্ঞানসর্গ উপদেশ রয়েছে যে, যতক্ষণ আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখে এবং তাঁর তাওকিকে তাঁর পথে চলতে থাকব, ততক্ষণ দাওয়াতি কার্যক্রমে আপতিত নানা পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট আমাদের এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। এবং আমাদের মধ্যে অলসতা ও নির্মোহতাও সৃষ্টি হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে বলীয়ান হয়, অলসতা বা হতাশাকে মনে ঠাই দেওয়া তার জন্য সাড়ে না। কারণ, যেই কাজের নির্দেশ আল্লাহ নিজে দিয়েছেন, সেই কাজে তিনি সহযোগিতা করবেন না—তা হতেই পারে না; বরং তাঁর সাহায্য করাটা সন্দেহাতীত।

অবসাদ, নিরাশা ও হীনম্মন্যতায় মূলত আল্লাহ তায়ালার অনাদিষ্ট অন্যান্য পথ ও নিয়মনীতির মাঝে আপতিত বাধাবিপত্তি ও পরীক্ষার কারণেই পড়তে হয়। কারণ, এমতাক্ষায় কর্মী তার বিশেষ যোগ্যতা এক তার চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনার ওপরই নির্ভর করে। (কাজের পূর্ণতা দানকারী আল্লাহর অনাদিষ্ট হওয়ান্ন তাতে তাঁর সাহায্য থাকে না।) আর এসবই যে মানুষের নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত আওতার বাইরে নয়; বরং সীমিত ও সীমাবদ্ধ, তা সবারই জানা।

কাজেই মানুষের সীমিত শক্তির মানদণ্ড ও মাপকাঠির বিবেচনায় এবং অসংখ্য পরীক্ষা ও অগণিত দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির কারণে আমলের শক্তি, নিজস্ব পরিকল্পনা, হতাশা ও অলসতার শিকার হবে—এটাই স্বাভাবিক।

* * *



মিকহস সিরাহ



ইসরা ও মিরাজ...

ইসরা ও মিরাজের পার্থক্য

ইসরা ও মিরাজ। ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম অলৌকিক ও আলোচিত ঘটনা। লক্ষাধিক নবির মধ্য থেকে আল্লাহ তায়ালা কেবল আমাদের নবিকেই এই অপার্থিব সম্মানে ভূষিত করেছেন। উর্ধ্বাকাশের এই সফরটি দুই ভাগে বিভক্ত—

- ০১. ইসরা
- ০২. মিরাজ

ইসরা : মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্বন্ত সফরকে ইসরা নামে অভিহিত করা হয়।

মিরাজ : মসজিদুল আকসা থেকে সপ্তম আসমানের ওপরে—সৃষ্টিজগৎ, মানুষ, জিন ও ফেরেশতাদের ইলমেয়ও ওপরের জায়গা সিদরাতুল মুনতাহার সফরটি মিরাজ নামে প্রসিদ্ধ। সফরের পুরো প্রক্রিয়াটি এক রাতেই সমাপ্ত হয়।

কোন বছর মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল

মিরাজের তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মাঝে এই বিষয়ে অল্পবিস্তর মতভিন্নতা রয়েছে যে, এটা নবুয়তের দশম বছর হয়েছিল, না আরও পরে; ইতিহাসবিদ ইবনে

১১৪ মিরাজ (الميراج) শব্দটি سَمْعَال-এর ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে। ওপরে ওঠার বছকে الميراج বলা হয়। এটি সিঁড়ির মতোই; কিন্তু এটি কেমন, তা জানা সম্ভব নয়। এর হুকুম অন্যান্য গায়েরি বিশ্বের হুকুম একই রকম। আমরা এগুলোর ওপর ইমান আনয়ন করি; কিন্তু এগুলোর কাহিনীকৃত (ধরন) জানার চেষ্টা করি না।



সাদ আত-তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে বলেন—‘ইসরা ও মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল হিজরতের অষ্টারো মাস আগে।’

অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের ঐকমত্যে, মিরাজের ঘটনা দৈহিক ও আত্মিক উভয়ভাবে সংঘটিত হয়েছে। সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফে মিরাজের ঘটনা সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে।

১৯৫ এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার আমরা আশা ইবনে মালিক রা.-এর মিরাজের ঘটনা প্রসঙ্গে বা বলেছেন, সেই বর্ণনাটি পড়ে নিতে পারি। তিনি মিরাজের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন—

‘রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একরাতে কবীর মসজিদুল হারাম থেকে সত্তর করানো হয়। নবিকির কাছে এ বিষয়ে ওহি পাঠানোর আগে তাঁর কাছে তিনজন কেরেশতর জামাত আসে। অষ্ট তখন তিনি মসজিদুল হারামে হুমিয়ে ছিলেন। কেরেশতাদের প্রথমজন বলে, তিনি কে? দ্বিতীয়জন বলেন—তিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোক। সর্বশেষ কেরেশতা বলেন—তাহলে তাদের সবচেয়ে ভালো লোকটিকেই নিয়ে চলো।

সে রাতের ঘটনা এতটুকুই। এখন তিনি আর তাদের দেখেননি। শেবে তারা অন্য এক রূতে এলেন, যা তিনি অস্তর দ্বারা দেখছিলেন। তাঁর চোখ দুমার, অস্তর দুমার না। এভাবে অন্য নবিশের চোখ হুমিয়ে থাকে, অস্তর দুমার না। এ রাত্তে তারা তাঁর সঙ্গে কোনো কথা না বলে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে জমজম কূপের কাছে রাখলেন। জিবরাইল আ. তাঁর সাধিদের থেকে নবিকি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দারিড় নিলেন। জিবরাইল আ. তাঁর গলার নিচ হতে কুক পর্বত বিদীর্ণ করলেন। তাঁর কুক ও পেট থেকে সবকিছু নেড়েচড়ে জমজমের পানি দ্বারা নিছ হতে বৌত করে পরিষ্কার করলেন, তারপর সেনার একটি তশতরি আনা হলো। এক তাতে ছিল একটি সেনার পায়—যা ইমান ও হিকমাত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর কুক ও গলার রক্তগুলো এর দ্বারা পূর্ণ করলেন। তারপর সেগুলো বক্ষস্থানে রেখে বখ করে দিলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে পৃথিবীর আসমানের দিকে উঠলেন। আসমানের দরজাগুলো হতে একটি দরজাতে নাড়া দিলেন। কলে আসমানবাসী তাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এ কে? তিনি উত্তরে কললেন—জিবরাইল। তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গে কে? তিনি কললেন—আমার সঙ্গে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জিজ্ঞেস করলেন—তাঁর কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি কললেন—হ্যাঁ। তখন তারা কললেন—মারফুফান ওয়া আফলান। তাঁর আসমানে আসমানবাসী দুইই অনন্বিত। আল্লাহ জমিনে কী করতে চাচ্ছেন, তা আমাদের না জানানো পর্বত আমরা জানতে পারি না।

দুনিয়ার আসমানে তিনি আদম আ.-কে পেলেন। জিবরাইল আ. তাঁকে দেখির কললেন—তিনি আপনার পিতা, তাঁকে সালাম দেন। নবিকি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সালাম দিলেন। আদম আ. তাঁর সালামের উত্তর দিলেন এক কললেন—মারফুফান ওয়া আফলান হে আমার পুত্র! তুমি আমার কতই-না উত্তম পুত্র!

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার আসমানে দুটি প্রবহমান নদী দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন—এ দুটি কোন নদী, হে জিবরাইল! তিনি কললেন, এ দুটি হলো নীল ও ফুরাতের উৎসসূ। এরপর জিবরাইল আ. নবিকি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সঙ্গে নিয়ে এ আসমানে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি আরও একটি নদী দেখলেন। এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল মোতি ও জাবরিকামের তৈরি একটি প্রাসাদ। নবিকি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নদীতে হাত দিলেন। তা ছিল অতি উত্তমমানের শিক। তিনি কললেন, হে জিবরাইল, এটি কী? জিবরাইল আ. কললেন—হাউজে কাউসার, যা আপনার রব আপনার জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন।



শিকহুস সিরাহ

তারপর তিনি নবিজিকে সজ্ঞা করে দ্বিতীয় আসমানে গেলেন। প্রথম আসমানের ফেরেশতগণ তাকে যা বলেছিলেন, এখানেও তা বললেন। তারা জানতে চাইল, তিনি কে? তিনি বললেন, জিবরাইল! তারা বললেন, আপনার সজ্ঞা কে? তিনি বললেন—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারা বললেন—তার কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন—হ্যাঁ। তারা বললেন—মারহুমান ওয়া আহ্বালান।

তারপর নবিজিকে সজ্ঞা করে তিনি তৃতীয় আসমানের দিকে গেলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আসমানের ফেরেশতারা যা বলেছিলেন, তৃতীয় আসমানের ফেরেশতারাও তা-ই বললেন। তারপর তাকে সজ্ঞা করে তিনি চতুর্থ আসমানের দিকে গেলেন। তারাও তাঁকে আগের মতোই বললেন। তারপর তাকে নিয়ে তিনি পঞ্চম আসমানে গমন করলেন। তারাও পূর্বের মতো বললেন। এরপর তিনি তাঁকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দিকে গেলেন। সেখানেও ফেরেশতারা আগের মতোই বললেন। সবশেষে তিনি নবিজিকে নিয়ে সপ্তম আসমানে গেল সেখানেও ফেরেশতারা পূর্বের মতো অভিবাদন জানালেন। প্রত্যেক আসমানেই নবিশপ্ন রয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাম উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে আমি মনে রেখেছি যে—দ্বিতীয় আসমানে ইদরিস আ., চতুর্থ আসমানে হারুন আ., পঞ্চম আসমানে অন্য একজন নবি, যার নাম আমি স্মরণ রাখতে পারিনি। ষষ্ঠ আসমানে রয়েছেন ইব্রাহিম আ. এবং আল্লাহর সজ্ঞা কথা বলার মর্যাদার কারণে মুসা আ. আছেন সপ্তম আসমানে। সে সময় মুসা বললেন—হে আমার রব, আমি তো ধারণা করিনি, আমার ওপর কাউকে উচ্চমর্যাদা দান করা হবে। তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এত ওপরে ওঠানো হলো, যে, ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই জানে না। শেষে তিনি সিদ্ধান্তলব্ধ মুনতাহার পৌঁছলেন। এখানে প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী হলেন। অতি নিকটবর্তী ফলে তাঁদের মাঝে দুই ধনুকের সমান ফারাক রইল অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহি পাঠালেন। অর্থাৎ তাঁর উম্মতের ওপর রাত ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াস্ত সালাত আদায়ের কথা ওহিবোগে পাঠানো হলো। তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামলেন।

মুসা আলাইহি সালামের কাছে এলে তিনি তাঁকে আটকিয়ে বললেন, এই মুহাম্মাদ, আপনার রব আপনাকে কী নির্দেশ দিলেন? নবিজি বললেন—রাত ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াস্ত সালাত আদায়ের হুকুম দিয়েছেন। উত্তরে তিনি বললেন—আপনার উম্মত তা আদায় করতে পারবে না। কাজেই আপনি কিরে যান, তাহলে আপনার রব আপনার এবং আপনার উম্মত হতে এ আদেশটি সহজ করে দেবেন। তখন নবিজি জিবরাইলের দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন তিনি এ ব্যাপারে তার থেকে পরামর্শ চাচ্ছিলেন।

জিবরাইল আ. তাঁকে ইসরায়াল বললেন—হ্যাঁ, আপনি ইচ্ছা করলে তা হতে পারে। তাই তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে প্রথমে আল্লাহর কাছে গেলেন। তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বখাশ্বানে থেকে বললেন, হে আমার রব, আমার উম্মত এটি আদায় করতে পারবে না। তখন আল্লাহ সালাত দশ ওয়াস্ত করিয়ে দিলেন। এরপর মুসা আলাইহিস সালামের কাছে কিরে আসলে তিনি তাঁকে ধামালেন। এভাবেই মুসা তাঁকে তাঁর রবের কাছে পাঠাতে থাকলেন। শেষে পাঁচ ওয়াস্ত বাকি থাকল। পাঁচ সংস্থায়ও মুসা আ. তাঁকে ধামিয়ে বললেন, শোনেন মুহাম্মাদ, আমি আমার বনি ইসরাইল কওমের কাছে এটা হতেও সামান্য কিছু পেতে চেয়েছি। তবুও তারা দুর্বল হয়েছে এক পরিত্যাগ করেছে। অথচ আপনার উম্মত শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টিশক্তি ও ব্রহ্মশক্তি সব দিক দিয়ে আরও দুর্বল। কাজেই আপনি আমার যান এবং আপনার রব থেকে আদেশটি আরও সহজ করে আনেন। প্রতিবারই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরামর্শের জন্য জিবরাইলের দিকে তাকাতেন। পঞ্চমবারেও জিবরাইল তাঁকে নিয়ে বরজ করলেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—হে আমার রব, আমার উম্মতের শরীর, মন, ব্রহ্মশক্তি ও দেহ খুবই দুর্বল। তাই আদেশটি আমাদের থেকে আরও সহজ করে দেন। এরপর পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেলেন—মুহাম্মাদ!

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বোরাকে চড়ে মসজিদুল আকসায় আসেন। আর বোরাক হলো গাধার চেয়ে বড়ো এবং ঘোড়ার চেয়ে একটু ছোটো প্রাণীসদৃশ জন্তু। যার দিগন্তবিস্তৃত পাখনা রয়েছে...

নবিজি মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করলেন। তারপর সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ হতে জিবরাইল আ. দুটি পেয়ালা নিয়ে এলেন। যার একটি শরাবের আর অপরটি দুধের। নবিজি দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করলেন। নবিজির দুধের পেয়ালা গ্রহণ করা দেখে জিবরাইল আ. বললেন—‘আপনি আপনার ফিতরাতের অনুগামী হয়েছেন...’

...এরপর তিনি উর্ধ্বাকাশে মন করলেন; প্রথম আসমান, দ্বিতীয় আসমান, তৃতীয় আসমান, এভাবে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলেন। (সেখানে) আল্লাহ তায়লা তাঁর কাছে বা পাঠানোর ছিল, ওহির মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলেন।

এখানেই মুসলিমদের জন্য পাঁচ ওয়াস্ত সালাত ফরজ করা হয়। যা মূলত রাত-দিনে ৫০ ওয়াস্ত ছিল।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আপনার নিকট উপস্থিত, স্বর্গবার উপস্থিত। আল্লাহ বললেন—আমার কথার কোনো পরিবর্তন-পরিবর্তন হয় না। আমি তোমাদের ওপর বা ফরজ করেছি, তা উল্লেখ কিতাব তথা লাভুহে মাযকুন্নে সংরক্ষিত আছে। প্রতিটি নেক আমলের নফল নেকি রয়েছে। উল্লেখ কিতাবে সালাত পঞ্চাশ ওয়াস্তই লেখা আছে। তবে আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য তা পাঁচ ওয়াস্ত করা হলো।

এরপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসা আলাইহিস সালামের কাছে কিয়ে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন? নবিজি বললেন, আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের প্রতিটি নেক আমলের পরিবর্তে নফল সাওয়াব নির্ধারিত করেছেন।

তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি বলি ইসরাইলের নিকট হতে এর চেয়েও অল্প জিনিসের আশা করেছি, কিন্তু তারা তাও আদায় করেনি। আপনার স্বপ্নের কাছে আপনি আবার কিয়ে যান, যেন তিনি আরও একটু কমিয়ে দেন। একার নবিজি বললেন, হে মুসা, আল্লাহর শপথ! আমি আমার স্বপ্নের কাছে বারবার গিয়েছি, আবার যেতে লজ্জাবোধ করছি, যেন তাঁর সন্তোষ বৃত্তভেদ করছি। এরপর মুসা আ. বললেন—বামতে পারেন আল্লাহর নামে। এ সময় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহত হলেন, দেখলেন, তিনি মসজিদুল হারামে আছেন। সূত্র : সুনানুন নাসারি : ৪৫০

১৯৬ আপনি বলি মিরাজের এই ঘটনা বিস্তারিত পড়তে চান, তাহলে আপনি সহিহ বুখারি বা সহিহ মুসলিম থেকে বর্ণিত ঘটনাসূচী পড়ে নিতে পারেন। এর বাইরে ‘মিরাজু ইবনি আব্বাস’ বা এই ধরনের আরও কিছু বই আছে,



মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া ও আবু বকর রা.-এর সত্যায়ন

নবিজি সাদ্লাম্মাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালবেলা রাতের ঘটনা শোনালেন। কাকিরদের খুশির অন্ত নেই। এতদিন পর তারা নবিজিকে নিয়ে হাসি-মজা করার মোক্ষম একটি উপলক্ষ্য পেয়ে গেল। এই অসম্ভব কথা পাগল ছাড়া কে বিশ্বাস করবে! তারা ঠাট্টাচ্ছিলে মানুষের কাছে বিষয়টি বলে বেড়াতে লাগল। এমনকি বুকভরা আশা নিয়ে নবিজির সবচেয়ে আস্থাভাজন আবু বকর রা.-এর কাছে গেল। আবু বকর সিদ্দিক রা. বললেন—যদি নবিজি নিজ মুখে এই ঘটনা বলে থাকেন, তাহলে এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কয়েকজন বলল, যদি তিনি সত্যিই সেখানে গিয়ে সালাত আদায় করে থাকেন, তাহলে বাইতুল মাকদিসের পূর্ণ বিবরণ আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হোক। তবেই আমরা তাঁর দাবি সত্য বলে মেনে নেব। তারপর বাইতুল মাকদিস সম্বন্ধে তারা নবিজিকে এমন সব আঙ্গুবি প্রশ্ন করতে শুরু করল, যা ছিল সম্পূর্ণ অমূলক ও অযৌক্তিক।

অযৌক্তিক প্রশ্নের লা-জবাব উত্তর

তারা নবিজির কাছে বাইতুল মাকদিসের খুঁটি, সিঁড়ি, দরজা-জানালা ইত্যাদির সংখ্যা জানতে চাইল। এমন কুটিল প্রশ্ন করে নবিজি সাদ্লাম্মাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লা-জবাব করাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, মানুষ সফরে গিয়ে এসব বিষয়ের পেছনে পড়ে না। নবিজির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। তারা প্রশ্নের উত্তর না পেলে এন্সুনি তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। ঠিক তখনই আকাশ থেকে আল্লাহর সাহায্য নেমে এলো। এ প্রসঙ্গে *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* শরিফের হাদিসে নবিজি নিজ মুখে ইরশাদ করেন—

‘আল্লাহ তায়ালা তখন বাইতুল মাকদিসের পুরো কাঠামো আমার সামনে উপস্থিত করে দিলেন। তখন আমি এমনভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম, যেন আমি বাইতুল মাকদিসকে দেখে দেখে উত্তর দিচ্ছি।’

যেগুলো মিথ্যার পরিপূর্ণ, এগুলো থেকে বেঁচে থাকবেন। এবং চেষ্টা করবেন, সুন্নাহর সহিহ কোনো বর্ণনাসংবলিত হাদিস থেকে ঘটনাটি জেনে নেওয়ার।—লেখক।

বিশেষ দৃষ্টান্ত : শ্রব্দের পাঠকের জন্য আমরা এর আগেই একটি দীর্ঘ সহিহ বর্ণনা সংযুক্ত করে দিয়েছি। টাকায় সংযুক্ত আনাস ইবনে মালিকের সূত্রে বর্ণিত এই হাদিসটি পড়লে আশা করছি, পাঠক মিরাজের রাতের ওই ঘটনার একটি স্পষ্ট চিত্র পাবেন।—সম্পাদক।



এরই মাঝে জিবরাইল আ. নবিজির কাছে এসে সালাতের সময় ও পদ্ধতি বর্ণনা করলেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বিধিবিধি হওয়ার পূর্বে নবিজি সকাল ও সন্ধ্যায় ইবরাহিম আ.-এর মতো দুই রাকাত করে সালাত আদায় করতেন।

* * *



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

মিরাজের শিক্ষা

নবিজি সাদ্দাম্‌হু আলাইহি ওয়া সাদ্‌মের সাথে মুজিহা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সময়ের প্রয়োজনে নব জীবনের বাঁকে বাঁকে প্রকাশিত হয়েছে মুজিহার অলৌকিকতা; কিন্তু কিছু মানুষ নবিজির জীবন আলোচনার সময় মুজিহাকে পাশ কাটিয়ে যায়। তারা মুজিহাকে মানবীয় স্বভাববহির্ভূত বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করে অস্বীকার করে। তারা দৃঢ়তার সাথে বলে, মুজিহার অলৌকিকতা নবিজির মর্যাদা পরিপন্থি এবং তিনি তা দেখাতে সক্ষম নন। তারা দলিল হিসেবে কুরআনুল কারিমের নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করে—

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ

‘বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহর কাছেই।’^১

প্রাচ্যবিদদের স্বত্বস্বাধীনতা

মুজিহা অস্বীকারকারী এইসব ব্যক্তির মূলত পাশ্চাত্যের অমুসলিম গবেষক প্রাচ্যবিদ গুস্তাভে লে বুন^২, ডেভিড হিউম^৩, ওগ্যুস্ত কোঁত^৪, গোস্‌জিয়ার^৫ প্রমুখ দ্বারা

১৯৭ সূরা আনআম, আয়াত : ১০৯

১৯৮ চার্লস ম্যারি গুস্তাভে লে বুন (Charles-Marie Gustave Le Bon) জন্ম : ১৮৪১; মৃত্যু : ১৯৩১।

একজন শীর্ষস্থানীয় ফরাসি পলিম্যাথ। বার আবার ফ্রেঞ্চপুলো নৃবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, চিকিৎসা, উদ্ভাবন ও পার্শ্ববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি তার ১৮৯৫-এর কাজ ‘দ্য ক্রড : এ স্টাডি অব দ্য পপুলার মাইন্ড’-এর জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। গুস্তাভে লে বুন ইউরোপীয় ক্রড, উইলফ্রেড হুটার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

১৯৯ ডেভিড হিউম ছিলেন একজন ব্রিটিশ দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং প্রবন্ধক; তিনি দার্শনিক সর্গীটিন ভাংকারা ও প্রকৃতিবাদে তার অত্যন্ত প্রভাবশালী অবস্থানের জন্য সুপরিচিত। দর্শনে হিউম-এর অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাকে জন লক ফ্রান্সিস বেকন ও টমাস হোবসের সাথে একটি ব্রিটিশ এমপিফিস্ট হিসেবে স্থান দিয়েছে। তার জন্ম ৭ মে, ১৭১১, এডিনবরা, বৃটান্স এক মৃত্যু : ২৫ আগস্ট, ১৭৭৬, এডিনবরা, বৃটান্স।



প্রভাবিত। পাশ্চাত্যের গবেষকরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও নাস্তিকতা প্রচার না করে নতুন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলিমদের চিন্তায় অবিশ্বাস ও সংশয়ের বীজ বপন করার জন্য নবিজির জন্য এমন সব গুণাবলি প্রচার করতে থাকে—যা নবি-জীবনের একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করে। নেতা, সেনাপতি, বীর ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত করে সাধারণ মানুষের জীবনের মতো উপস্থাপন করতে থাকে। নবিজির মুজিজা, মিরাজ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক বিষয় থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে ফেলে। একপর্যায়ে মানুষ মুজিজাকে অসম্ভব মনে করে অলীক কল্পকাহিনি মনে করতে শুরু করে। এর ফলশ্রুতিতে আবশ্যিকভাবে তারা ইসলামের অসংখ্য অকাটাবিধান অস্বীকারকারী সাবাস্ত হয়। এভাবে একসময় তাদের ঈমানই শেষ হয়ে যায়।

দুঃখজনক সত্য হলো—অনেক মুসলিম জেনে বা না জেনেই তাদের পেতে রাখা ফাঁদে পা দিয়েছে। তাদের মেধা ও অর্থ অমুসলিমদের মতবাদ প্রচারের কাছে ব্যয় করছে। মূলত ইউরোপের বৈজ্ঞানিক উৎকৃষ্টতায় প্রলুপ্ত হয়ে তারা এই খোঁকায় নিমজ্জিত হয়েছে।

বীর, সেনাপতি, নেতা। মুশ্বকর বিশেষণ; কিন্তু নবি-জীবনের সাথে এই বিশেষণগুলো ব্যাপক প্রচারের মধ্যে রয়েছে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র। এর মাধ্যমে পাশ্চাত্যের ইসলামবিদ্বেষীদের উদ্দেশ্য হলো, ইসলাম অস্ত্র ও জনবলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এই বিষয়টি প্রমাণ করা। তাদের এই ষড়যন্ত্র আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন নবিজির উম্মতকে ‘মুসলিম’ শব্দের পরিবর্তে ‘মুহাম্মাদিয়ান’ বলে নামকরণ করে।

কল্পনার প্রচ্ছন্ন আবরণ নয়, যুক্তি, বাস্তবতা ও অনুসন্ধানসু হৃদয়ে প্রবল কৌতুকে কয়েকটি পয়েন্টে নবি-জীবন নিয়ে আলোচনা করব। যেন সত্য ও সুন্দরের সোনারোদ স্বমহিমায় আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়।

♣ ক. মুজিজা অস্বীকারের পরিশ্রুতি

২০০ ওগুস্ত কোঁত। তিনি ছিলেন একজন ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী ও লেখক। তিনিই প্রথম সোশিওলজি পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। তাকে সমাজবিজ্ঞানের জনক গণ্য করা হয়। সমাজবিজ্ঞানে প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি দৃষ্টবান বা পলিগ্লেজিকাল দর্শনের উদ্ভাবনে অসামান্য অবদান রাখেন। জন্ম : ১৯ জানুয়ারি, ১৭৯৮, সেন্টপেরিয়ের, ফ্রান্স। মৃত্যু : ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭, প্যারিস, ফ্রান্স।

২০১ পোভজিয়ার, যাকে প্রায়শই ‘ইসলাম পোভজিয়ার’ হিসেবে কৃতিত্ব দেওয়া হতো। তিনি ছিলেন একজন হাঙ্গেরিয়ান। জার্মান শিওডর নলমেক এক ডাচ ক্রিস্টিয়ান বুক প্রকাশনাজেজের পাশাপাশি তিনি ইউরোপে আধুনিক ইসলামি গবেষণার প্রতিষ্ঠাতা (প্রাচ্যবাদের জনক) হিসেবে বিবেচিত হন।



ওহি। আসমানি প্রত্যাদেশ। মহান প্রভুর অকাট্য নির্দেশ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সাথে ওহির গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক। তাঁর জীবনের সিংহভাগ গুণাবলি নবুয়ত ও রিসালাতের সাথে সম্পৃক্ত। রিসালাতের যাবতীয় বিষয় উর্ষজগতের সাথে সম্পৃক্ত। এতে মানবীয় হস্তক্ষেপের দূরতম কোনো সুযোগ নেই। এই বাস্তবতার জানালায় দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—মুজিজা ও অলৌকিক বিষয়াদি নবি-জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। এগুলো পাশ কাটিয়ে যাওয়া নবুয়তের মূল মর্ম, বস্তু ও বিশ্বাস অস্বীকার করার নামান্তর। পশ্চিমা পণ্ডিতগণ এই ভয়াবহ সত্য গোপন করে তাদের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু দিন শেষে তাদের দুরভিসন্ধি চাপা থাকেনি। কতক স্থানে অজান্তেই তারা এই সত্য প্রকাশ করে দিয়েছে। ডারউইন মতবাদের বলিষ্ঠ প্রচারক শিবলি শুমাইল কোনো রাখঢাক না করেই মুজিজাকে ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত করেছে।^১

দ্বীনের মৌলিক বিষয় মুজিজা প্রবলবিশ্ব ও অস্বীকারের পাত্র বানানো দ্বারা মুজিজাসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্বীকার করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

❖ খ. মুজিজার অকাট্যতা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোকিত জীবন মুজিজায় প্রাচুর্যময়। এই অলঙ্ঘনীয় সত্য অস্বীকার করার জো নেই। বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রের পরম্পরায় তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। অকাট্য বর্ণনা, বোধ, চিন্তা ও বিশ্বাসের আয়নায় মুজিজার সত্যতা সকলের কাছে অতি পরিচিত। নবিজির আঙুল মুবারক দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়া সকলের কাছে অতি পরিচিত ও বহুল প্রচলিত একটি মুজিজা। ইমাম বুখারি ‘কিতাবুল অজু’, ইমাম মুসলিম ‘কিতাবুল মাসাইল’ ইমাম মালিক ‘কিতাবুত তাহারাত’ এবং অন্য ইমামগণ বিভিন্ন সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম জুরকানি ইমাম কুরতুবির সূত্রে বলেন—

নিঃসন্দেহে একাধিকবার অনেক মানুষের সম্মুখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আঙুল থেকে পানি প্রবাহিত হওয়ার মুজিজা

২০২ টীকা: ড. শিকলী শুমাইল বুকানজের কিতাব আরবিতে অনুবাদ করেছে। সেই কিতাবে ডারউইনের মতবাদের উৎকৃষ্টতা বর্ণনা করা হয়েছে। কিতাবের ভূমিকায় শিবলি এই মন্তব্য করেছে।



সংঘটিত হয়েছে। এ হাদিসটি এত অধিকসংখ্যক মানুষ বর্ণনা করেছেন যে, তা অকাট্য বর্ণনার রূপ নিয়েছে।—

অনুরূপ চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা। ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম এবং অন্য অনেক ইমাম এই রেওয়াজাত বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে কাসির বলেন—

থারাবাহিক কিশুখ সনদে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। এই মুজিজ্ঞা নবিজির জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়েছে।—

মুজিজ্ঞাসংক্রান্ত হাদিসগুলোর কিশুখতার ব্যাপারে উলামারে কিরাম ঐকমত্য পোষণ করেন। মিরাজ ও অন্য মুজিজ্ঞাসমূহের অকাট্যতার ব্যাপারে বিশ্বের মুসলিমদের কোনো দ্বিমত নেই; কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো—মুজিজ্ঞার প্রামাণ্যতার পক্ষে অকাট্য দলিলের প্রাচুর্য সত্ত্বেও একদল লোক নবি-জীবন থেকে মুজিজ্ঞাকে পৃথক করতে সদা তৎপর। এজন্য তাদের কৌশলের অন্ত নেই। তারা নবিজির জন্য অতিমাত্রায় ‘মেধাবী’ শব্দটি প্রয়োগ করে মুজিজ্ঞার ঐশ্বরিক গুণটি ধামাচাপা দিতে চায়। মুজিজ্ঞা প্রসঙ্গে তারা অশ্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মুজিজ্ঞার স্বপক্ষের হাদিসগুলো পাশ কাটিয়ে যায়। এর কারণ হলো, এই অকাট্য হাদিসগুলো তাদের প্রান্ত মতবাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়।”

১৬. মুজিজ্ঞার পরিচয় ও সম্ভাব্যতা

মুজিজ্ঞা মূলত কী? দীর্ঘ আলাপসূত্র ছাড়া এককথায় বলা যায়—মানুষের মাঝে অপ্রচলিত ও দুর্লভ বিষয়কে মুজিজ্ঞা বলা হয়; কিন্তু বাস্তবে মুজিজ্ঞার সংজ্ঞা এমনটি নয়। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রচলিত অসামান্য বিষয়গুলোও মুজিজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। চাঁদ, আকাশ, মানুষের শিরাতন্ত্র, সুশৃংখল রক্ত সঞ্চালন ও বৃহ গুণিজনের কাছে প্রতিটি বিষয় মুজিজ্ঞা। এ ব্যাপারে ফ্রান্সের একজন বিজ্ঞানী সূক্ষ্ম কথা বলেছেন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো অজ্ঞানভাবে জড়িত হওয়ার কারণে এগুলো মুজিজ্ঞা হওয়ার বিষয়টি তারা ভুলতে বসেছে। মানুষের মনে প্রোথিত প্রচলিত বিষয়গুলোকেই কেবল তারা মুজিজ্ঞা মনে করে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও

২০৩ জুরকানি আলাল মুআততা, বন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৫

২০৪ তাকসিরু ইবনি কাসির, বন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৬১

২০৫ হযরতে মুহাম্মাদ প্রাশ্বের লেখক এই প্রান্ত মতবাদ প্রচারকদের অন্যতম একজন। নিজের শিষ্ট বাঁচিয়ে মুজিজ্ঞার স্বপক্ষের হাদিসগুলোর প্রামাণ্যতা অকার্যকর করতে তিনি এমন কল্‌পিতা ও বাস্তব্য কথাবার্তার পথ অবলম্বন করেছেন—যা নিতান্তই বাস্তবতা বিবর্তিত ও কল্পনামূলক।



সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ এই ভুল ধারণা থেকে বের হতে পারেনি। ভাবনার দ্বার ঈর্ষা উন্মুক্ত করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, পৃথিবীর ছোটো-বড়ো প্রতিটি সৃষ্টি একেকটি মুজিজা। যে মহান প্রভু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধুর জন্য মিরাজ ও চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ গুলিম জোল বলেন—

কিছু মানুষ মুজিজাকে অসম্ভব বিষয় বলে মন্তব্য করে; কিছু কথা হলো, আলোচ্য মুজিজাগুলো পৃথিবী সৃষ্টি করার চেয়ে কঠিন কাজ নয়। যে আল্লাহ তায়াল্লা আসমান জমিনের মতো প্রকাণ্ড সৃষ্টির স্রষ্টা, তাঁর জন্য আলোচ্য মুজিজা অসম্ভব আনা নিতান্তই সহজ।

● ব. মুজিজার আগের ঘটনা

মিরাজের ঘটনা অন্য দশটি মুজিজার মতো নয়। এই ঘটনার পেছনে রয়েছে বেদনাদায়ক ইতিহাস, রোমহর্ষক দৃশ্যপট। দশম হিজরি। একে একে মারা যান বটবৃক্ষের ছায়া হয়ে থাকা চাচা আবু তালিব ও ব্যথিত হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দেওয়া প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা। তাদের ইন্তেকালে কাফিরদের অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বেড়েই চলল। পুরো মক্কা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দুনিয়ার জাহান্নামে পরিণত হলো। বুকু আশার পাহাড় বেঁধে নিয়ে পাড়ি জমালেন প্রতিবেশী তায়েফে। মুহূর্তেই প্রত্যাশার পাহাড় ভেঙে কাচের পাত্রের মতো টুকরো টুকরো হলো। জীবনের সবচেয়ে কষ্টের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন নবিজি। তায়েফে সফরে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে রবিয়ার দুই ছেলের বাগানে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত শরীর-মন। করুণ আর্তনাদে আল্লাহর কাছে সাহায্যের আর্জি জানালেন। ধৈর্যের পাহাড় বুকু আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে জানালেন—‘আয় মেরে রব, যদি এই পরীক্ষা সমস্ত আপনার অসন্তুষ্টির কারণে আপতিত না হয়ে থাকে, তাহলে এগুলোতে আমার কোনো পরোয়া নেই।’

এমনই ভয়াবহ এক পরিস্থিতিতে নবিজিকে সান্ত্বনা ও সম্মানে ভূষিত করার জন্য আল্লাহ তায়াল্লা কাছে ডেকে নিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নব উদ্যমে দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন। মিরাজের ঘটনা দ্বারা এই বিষয়টিও প্রমাণিত হলো যে, নবিজির ওপর মুসিবত আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণে আরোপিত হয়নি।



আল্লাহ তায়াল্লা দাওয়াতের ময়দানে যুগে যুগে তার শ্রিয় বান্দাদের এভাবেই পরীক্ষা করেন।

৬. বাইতুল মাকদিস রক্ষা করো

বাইতুল মাকদিস। আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও সম্মানিত মসজিদ। মিরাজের ঘটনার সাথে এই মসজিদের নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেখানে আল্লাহ তায়াল্লা সকল নবিদের একত্র করেছেন। এই ঘটনার কালে ইসলামি ইতিহাসে বাইতুল মাকদিস স্পর্শ করেছে মর্যাদার হিমালয়।

এই ঘটনায় মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশ হলো—এই পবিত্র ভূমি দুশমনদের কালো থাবা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ও আশ্রাসনের বিরুদ্ধে নমনীয় অবস্থানের কোনো সুযোগ নেই। তাদের নাপাক হাত থেকে এই মসজিদকে পুনরুদ্ধার করা সকল মুসলিমের ঈমানি দায়িত্ব। কে জানে! ইতিহাসের মহাবীর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মিরাজের সেই শিক্ষা থেকে উদ্ধৃত হয়ে বাইতুল মাকদিস থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করেছিলেন।

৭. ইসলাম জীবনের জন্য

মিরাজের সফরে জিবরাইল আ. নবিজি সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে শরাব ও দুধের পেয়ালা উপস্থাপন করেছিলেন। নবিজি দুধের পেয়ালা হাতে নেন। শরাব স্পর্শ করেননি। মিরাজের এই ঘটনা প্রমাণ করে, ইসলাম মানবজীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামের প্রতিটি বিশ্বাস ও বিধান মানুষের সুস্থ চাহিদার অনুকূল। দ্রুতগতিতে ইসলামের বিস্তৃতি ও মানুষের মাঝে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার এটাই গুঢ় রহস্য। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতি ও পার্থিব প্রশান্তি তার দ্বীনের চাহিদা পালনের ওপর নির্ভর করে। পৃথিবীর অন্য কোনো মতবাদ নয়, কেবল ইসলাম মনুষ্য চাহিদা পূরণের নিরাপদ ঠিকানা।

৮. মিরাজ কি স্বপ্ন ছিল, না সন্দরীয়ে

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, মিরাজের ঘটনা আত্মিক ও শারীরিক উভয়ভাবে সংঘটিত হয়েছে। ইমাম নববি রহ. *শরহে সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে লিখেছেন—

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সিংহভাগ যুসুফা, মুহাম্মদিসিন, মুতাকাল্লিমিন মিরাজ সন্দরীয়ে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে একমত। এই অকাট্য সত্য বিষয়টি



বিশ্বাস করার জন্য কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। যারা মনগড়াভাবে এর বিপরীত মত প্রকাশ করে, তা নিতান্তই অজ্ঞতাসূলভ মন্তব্য।”

ইমাম ইবনে হাজার রহ. *সহিহ বুখারির* ব্যাখ্যাগ্রন্থ *ফাতহুল বারিতে* লেখেন—

নিঃসন্দেহে ইসরা ও মিরাজ একই রাত্রে জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে। বিশুদ্ধ বর্ণনা, গ্রহণযোগ্য ফকিহ, মুহাদ্দিস ও তর্কশাস্ত্রবিদরা এই মতামত পেশ করেছেন। এ রকম স্পষ্ট বিষয়ে দ্বিমত করা দুঃখজনক। কারণ, যুক্তির বিবেচনায় সশরীরে মুজিজ্জা সংঘটিত হওয়া এমন অসম্ভব কিছু নয় যে, তাতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতে পারে।”

মিরাজ সশরীরে সংঘটিত হওয়ার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম বড়ো প্রমাণ হলো—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মিরাজের সংবাদ দেওয়ার সাথে সাথে আশ্চর্যাব্বিত হয়ে তা প্রত্যাখ্যান করল। যদি নবিজি তাদের কাছে স্বপ্নযোগে মিরাজে যাওয়ার কথা বলতেন, তাহলে তারা আশ্চর্যাব্বিত হয়ে তা অস্বীকার করত না। কারণ, স্বপ্নে দেখা জিনিস কারও কাছে তেমন গ্রহণযোগ্য বিষয় নয়। মুসলিম-কাফিরনির্বিশেষে সকলেই স্বপ্নযোগে মিরাজে যাওয়ার দাবি করতে পারে। এরচেয়ে বড়ো কথা হলো—যদি নবিজি স্বপ্নযোগে মিরাজে যাওয়ার কথা বলতেন, তাহলে কাফিররা বাইতুল মাকদিসের খুঁটি, দরজা-জানালা ইত্যাদি সম্বন্ধে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করত না।

মোটকথা হলো, পৃথিবীর অন্যান্য মুজিজ্জা যেভাবে সংঘটিত হয়েছে, মিরাজের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম নয়। অন্য দশটি মুজিজ্জার মত মিরাজও একটি মুজিজ্জা।

❖ জ. ইবনে আব্বাস কি মিরাজবিষয়ক কিতাব লিখেছেন

মিরাজে ইবনে আব্বাস শিরোনামে একটি কিতাব প্রচলিত রয়েছে। কিতাবটি মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্ভট কথাবার্তায় ভরপুর। কোনো সূত্র ছাড়াই উদ্ভট বর্ণনাগুলো ইবনে আব্বাস রা.-এর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন—এসব মিথ্যা বর্ণনার সাথে ইবনে আব্বাস রা.-এর দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি মিরাজসংক্রান্ত কোনো কিতাব রচনা করেননি। কিতাব রচনার প্রচলন উমাইয়া শাসনামলের শেষ দিকে শুরু হয়েছে।

২০৬ শরহুন নববি আল্লা সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯০

২০৭ ফাতহুল বারি শরহ সহিহি বুখারি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৩৬-১৩৭



ইসলামবিদ্বেষী কিছু লোক এই কিতাবটি সম্মান পেয়ে মানুষের ঈমান হরণ করার জন্য তা প্রচার করতে শুরু করে। ইসলামবিদ্বেষী মুনাফিক ও কাফির ব্যক্তিরাই কেবল এই কিতাবটি প্রশংসা করেছে। ডক্টর লুইস আউস স্পট জানতেন, এই কিতাব ইবনে আব্বাস রা. লেখেননি; কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য নির্জলা মিথ্যাকে তিনি সত্য হিসেবে প্রচার করা শুরু করলেন। এইসব ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়— এই কিতাবটি ইসলামবিদ্বেষীদের চক্রান্তের ফসল। এই কিতাবের সাথে ইবনে আব্বাস রা.-এর কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

* * *





প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ ও ইসলাম গ্রহণের সূচনা

নব্বিজর অক্লান্ত দাওয়াত

হজের মৌসুম। লোকে লোকারণ্য হারামের চারপাশে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে ধর্মমত-নির্বিশেষে সকলের গম্ভব্য স্বর্ণখচিত কালো গিলাফের আবরণে আচ্ছাদিত কাছিত ঘরটি। নব্বিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বছরের এই সময়টির অপেক্ষায় প্রহর গোনে। মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর এটাই তো মোক্ষম সুযোগ। একই সাথে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে ইসলামের বার্তা। এজন্য তিনি বাইতুল্লাহর জিয়ারতে আসা লোকদের কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতে। আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিতেন; কিন্তু সাধারণত কেউ তা গ্রহণ করত না।

ঐতিহাসিক ইবনে সাদ তার *তাবাকাতুল কুবরা* গ্রন্থে হজের সময়ের চিত্র সার্থকভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন—

নব্বিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বছর হজের মৌসুমে উকাজ, মাজিমা ও জুল-মাজাজ মেলায় গিয়ে মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। বলতেন—হে লোকসকল, তোমরা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলো, তাহলে তোমরা সফল হয়ে যাবে। আরবের রাজত্ব তোমাদের হাতে চলে আসবে। অনারব দেশগুলো নতজানু হতে বাধ্য হবে। যদি তোমরা ঈমান আনো, তাহলে তোমরা জন্মতেও কর্তৃত্ব লাভ করবে; কিন্তু দুঃখজনক হলো, বুকভরা দরদ নিয়ে আহ্বান করলেও কেউ তার ডাকে সাড়া দিত না।



দাওয়াত দেওয়ার পুরো সময়জুড়ে নরাখম আবু লাহাব নবিজির পেছনে চলতে থাকত। সে চলতে চলতে বলত—তোমরা তাঁর কথা শুনো না; সে ধর্মত্যাগী, মিথ্যুক। মাআজ্জান্নাহ!

আবু লাহাবের কথা বিশ্বাস করে মানুষ নবিজির দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্টও দিত।”

ইবনে ইসহাক ইমাম জুহরি থেকে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু আমির ইবনে সা’সা’র নিকট আদ্বাহর একত্ববাদ ও রিসালাতের দাওয়াত দিলেন। তৎক্ষণাৎ বাহিরা ইবনে ফাররাস নামক এক ব্যক্তি বলে উঠল—আদ্বাহর শপথ! কুরাইশ বংশের এই যুবক আমার সাথে থাকলে পুরো আরব জয় করতে পারব। তারপর সে নবিজিকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা বলুন তো, আমরা আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার পর আদ্বাহ তায়াল্লা শত্রুদের বিপক্ষে জয়যুক্ত করলে আপনার পর কে বাদশাহ নিযুক্ত হবেন?

নবিজি উত্তর দিলেন—সব ক্ষমতার লাগাম তো আদ্বাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করবেন। উত্তর শুনে লোকটি বলল—আমরা জান বাজি রেখে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, আর জয়লাভ করার পর আমরা ছাড়া অন্য কেউ ক্ষমতার মসনদে বসবে, এটা কখনো মানা যায় না। নাহ, আপনার দাওয়াত গ্রহণ করলে আমাদের ভবিষ্যৎ অশুকার।”

প্রতিনিধিত্বের সাক্ষাৎ

নব্যুত্তের এগারোতম বছর। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজের সময় অন্যান্য বছরের মতো মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী জামরায়ে আকাবায় নিকটবর্তী স্থানে একটি কাফেলার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে।”

নবিজি তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের পরিচয়?

২০৮ আত-তাবাকাতুল কুবরা শিবনি সাহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০০-২০১; সিরাত ইবনে হিশাম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২৩; ইবনে ইসহাক একই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

২০৯ সিরাত ইবনে হিশাম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৫; তারিখুত তাবারি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৫০

২১০ কাকেলার ছয়জন লোক ছিলেন। আলআদ ইবনে জুরায়, আউক ইবনুল হারিস, রাফি ইবনে মালিক, কুতবা ইবনে আমির, উকবা ইবনে আবু আমির ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ।



তারা উত্তর দিলো—আমরা মদিনার খাজরাজ গোত্রের লোক ।

ফের প্রশ্ন করলেন—তোমরা কি ইহুদিদের ভ্রাতৃত্বপ্রতিম লোকদের অন্তর্ভুক্ত?

তারা বললেন—হ্যাঁ ।

এরপর তিনি তাদের সাথে বিস্তারিত আলাপের ইচ্ছা পোষণ করলেন । কাফেলার লোকদের বললেন—আপনাদের হাতে সময় থাকলে কিছু কথা বলতাম । তারা নবিজির পাশে বসতে বসতে বলল—অবশ্যই, কিছু বলতে চাইলে বলেন ।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে আল্লাহর একত্ববাদের পরিচয় তুলে ধরলেন । কুরআনের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন । পরিশেষে তাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন । দাওয়াতের মর্মবাণী তাদের হৃদয়ের গভীরে স্পর্শ করল । তা ছাড়া পূর্ব থেকেই ইসলামের প্রতি তাদের দুর্বলতা ছিল । হৃদয়ে ছিল ইসলামের প্রতি অগাধ ভালোবাসা । এই ভালোবাসা এক দিনে তৈরি হয়নি । এই ভালোবাসা তৈরির পেছনে রয়েছে বর্ষিল এক ইতিহাস ।

খাজরাজের ইসলাম গ্রহণের কারণ

অনেক বছর যাবৎ ইহুদিদের সাথে ছিল খাজরাজ গোত্রের বসতি । একসাথে বসবাসের সুবাদে ইহুদিদের মুখে জীবনে অসংখ্যবার নতুন একজন নবির আগমনবার্তার কথা শুনছে । এমনকি খাজরাজ গোত্রের সাথে ইহুদিদের মনোমালিন্য হলে তারা বলত—

অচিরেই শেষ নবির আগমন ঘটবে, আমরা তাঁর অনুসরণ করব । তাঁর নেতৃত্বে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আদ ও ইরম জাতির মতো তোমাদের ধ্বংস করব ।

নবিজির সাথে কথা বলা অবস্থায়ই খাজরাজ গোত্রের লোকগুলো পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি দিতে থাকল । একপর্যায়ে তারা বলতে লাগল—আল্লাহর কসম! উনি তো সেই নবি, যার আগমনের ব্যাপারে ইহুদিরা আমাদের বারবার ভয় দেখাত । আসো, দেরি না করে আমরা ইহুদিদের পূর্বেরই তাঁর অনুসারী হয়ে যাই । তারপর সবাই ইসলাম গ্রহণ করল ।

ইসলাম গ্রহণ শেষে তারা আরজ করল—অন্য সব গোত্রের চেয়ে বর্তমানে আমাদের গোত্রে খুব বেশি পারস্পরিক কলহ চলছে, আমরা আশাবাদী, আপনার দাওয়াতের



ওসিলায় আল্লাহ তায়ালা পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। আমরা স্বীয় গোত্রের কাছে আপনার পক্ষ থেকে দাওয়াত পৌঁছাব এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাব। যদি আল্লাহ তায়ালা তাদের আপনার হাতে সমবেত করে দেন, তাহলে আপনি সকলের চেয়ে শক্তিশালী হিসেবে আবির্ভূত হবেন। কথাবার্তা শেষে কাফেলা ইমানের আলো নিয়ে মদিনায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। যাওয়ার সময় আগামী বছর হজ্জের সময় পুনরায় আসার ওয়াদা করে।”

* * *

২১১ অসিম ইবনে উমার-এর সূত্রে ইবনে ইসহাক এই বর্ণনটি উল্লেখ করেছেন। তারা তাদের গোত্রের মুন্সিফদের থেকে বর্ণনা করেছেন। *সিরাত ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২৮



বিকহস সিরাহ



বাইয়াতে আকাবায়ে উলা

নবুয়তের এগারোতম বছর। এ বছরই মদিনায় ইসলামের আলো প্রবেশ করে। তারপর হজের মৌসুমে বারোজন ব্যক্তি আকাবায়ে উলায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করেন। এই বাইয়াতে নারীরাও অংশগ্রহণ করেছিল। এটি অবশ্য জিহাদের বাইয়াত ছিল না। মক্কা বিজয়ের পর সাফা পাহাড়ে নবিজি নারীদের থেকে যে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, তা এই প্রকারের বাইয়াত ছিল। এই মুবারক কাফেলায় আসআদ ইবনে জুরারা, রাফি ইবনে মালিক, উবাদা ইবনে সামিত, আবুল হাইসাম ইবনে তিহান উপস্থিত ছিলেন।

এই বাইয়াত সম্বন্ধে উবাদা ইবনে সামিত রা. স্মৃতিচারণ করে বলেন—

সেই কাফেলায় আমরা বারজন ছিলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম আমাদের বললেন, ‘আসো! তোমরা আমার হাতে এই কথার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করো—আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করব না; চুরি, ব্যভিচার ও অপবাদে জড়াব না। নিজের সম্মানকে হত্যা করবে না। নেকির কাজে আমার দেখানো পথ ব্যতীত মনগড়া আমল করবে না।’ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই বাইয়াত লঙ্ঘন করবে না, তার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তায়াল্লা দেবেন। পৃথিবীতে বিভিন্ন অপরাধের কারণে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা তোমাদের গুনাহ মাফের কারণ।



পক্ষান্তরে যে গুনাহগুলো আল্লাহ তায়াল্লা গোপন রাখেন, তিনি ইচ্ছে করলে এর শাস্তি দেবেন বা বিশেষ করুণায় ক্ষমা করে দেবেন।^{১১২}

এই বাইয়াতে উবাদা ইবনে সামিত রা.-এর উপস্থিতি নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। (এই সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।) মদিনার এই বারজন লোক বাইয়াত শেষে ফিরে যাওয়ার সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুসআব ইবনে উমাইর রা.-কে তাদের সাথে প্রেরণ করলেন। এজন্য তাকে ‘মুকরিউল মদিনা’ বা ‘মদিনার শিক্ষক’ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

* * *

১১২ সহিহ বুখারি, কিতাবু আযহামিসিল আযিরা, বাবু উকুদিল আনসার ওয়া বাইআতুল আকাবাহ; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ।



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

প্রথম বাইয়াতের শিক্ষা

বাইয়াতের পর নবিজির ওপর বিভিন্ন মুসিবত ও সমস্যার পাহাড় গলে গলে পড়তে লাগল। নবিজির মৈথের ফলে পরিপক্বতার রং ধরতে শুরু করল। দ্বীনি দাওয়াতের যে বীজ বপন করেছিলেন, তা চারা গজিয়ে ক্রমে বিস্তৃত হতে লাগল; কিন্তু এ পর্যায়ে আসতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করেছেন, তা পর্যালোচনা করা অতীব প্রয়োজন।

আমরা দেখতে পাই, তিনি ইসলামের দাওয়াত কুরাইশ বংশের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখেননি। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিভিন্ন গোত্রের দ্বারে দ্বারে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। বিশেষত হজ্জের মৌসুমে অবজ্ঞা করা সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন গোত্রের মানুষের কাছে দাওয়াত দিয়েছেন।

ইমাম আহমাদ এবং সুনান হাদিসের গ্রন্থসমূহে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়ে বলতেন—

এমন কোনো ব্যক্তি কি আছেন, যিনি আমাকে তার গোত্রে নিয়ে যাবেন?
কারণ, কুরাইশরা মানুষের কাছে আমার প্রভুর দাওয়াত পৌঁছাতে আমাকে
বাধা দেয়। ৮

২১৩ কাতুল্লা বাসি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৫৬; আল কাতুল্লা রাব্বানি কি তারতাবি মুসনাদে ইমাম আহমাদ, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২৬৯; জামুল মাআদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০



নবুয়তের প্রথম এগারোটি বছর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন। কুরাইশদের অনবরত অত্যাচারে কোনো একটি মুহূর্ত স্বস্তিতে কাটাতে পারেননি। তারা নবিজিকে শহিদ করার জন্য সর্বদা ওত পেতে থাকত। শুধু কি তা-ই, নবিজি নিজ গোত্র, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও কাছের মানুষদের থেকে সীমাহীন বশ্চনার শিকার হয়েছেন। এত কিছু পরও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃঢ়চেতা মনোবলে কখনো চিড় ধরেনি। আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হয়নি। এই সীমাহীন কষ্ট-সাধনার পর আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে ইসলামি হুকুমত কায়ম করেছেন। সময়ের পরিক্রমায় মুসলিমদের অবস্থা এমনও হয়েছিল, রোম-পারস্যের মতো পরাশক্তি মুসলিমদের ভয়ে ধরধর করে কাঁপত।

মুসলিমদের এই শক্তি ও সম্মান আল্লাহ তায়ালা জিহাদ ও যৈরুহের পরীক্ষা ছাড়াই দিতে পারতেন; কিন্তু বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিয়ম হলো—সাধনার পথ পাড়ি দেওয়ার পর তিনি পুরস্কার প্রদান করেন। যেমন, আল্লাহ তায়ালা আবশ্যিকভাবে মানুষের মাঝে ইবাদত করার যোগ্যতা দিয়েছেন; কিছু বাধ্য করেননি। পরীক্ষা করার জন্য মানুষকে ইচ্ছাশিকার দিয়েছেন। কে নিজ ইচ্ছায় কষ্ট-সাধনা ও আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে, আর কে অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়। কষ্ট-ক্রেমশীল ইবাদতের মাধ্যমে কাক্ষিত মনজিল অর্জিত হয় না। পরীক্ষা ছাড়া মুনাস্ক ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্যও নির্ণীত হয় না। স্বাভাবিক নিয়ম হলো—কষ্টের পরই সফলতা অর্জিত হয়। এজন্য আল্লাহ তায়ালা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দীর্ঘ সময় কঠিন সাধনার পর সফলতার মহাসড়কের সম্মান দিয়েছেন। সফলতার উচ্চশিখরে পৌঁছার জন্য আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য দুটি করণীয় নির্ধারণ করেছেন—

- ক. মানবজীবনে শরয়ি বিধান ও ইসলামি ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করা।
- খ. এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। কষ্টকাকীর্ণ পথ গ্রহণের মানসিকতা লালন করা।

দীর্ঘ এগারো বছরের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও কষ্ট ভোগের পর নবিজির সামনে দৃশ্যমান হয়েছিল সফলতার মহাসড়ক। সাধনার কিছু চিত্র উল্লেখ করার পর আমরা ধীরে ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও কিছু সফলতার দিকে গভীর দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নেব—



কুরাইশ ব্যতীত অন্যান্য গোত্র ইসলাম গ্রহণের পর থেকে ইসলামের সফলতার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। কুরাইশ নবিজির নিজ গোত্র, কুরাইশের রয়েছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রের মুকুট। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে—তাহলে ইসলামের বিজয় কেতনের গৌরবান্বিত পতপত ধ্বনি অন্যান্য গোত্রের ললাটে কেন লেখা হলো? এর কারণ হলো—সহজভাবে ঈমান গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা মানুষের সামনে ইসলামের দাওয়াত অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশই রাখেননি।

এজন্য আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে নিরঙ্কর হিসেবে প্রেরণ করেছেন। দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি থেকে তিনি পড়ালেখা শেখেননি। নবিজি এমন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছেন, যে গোত্রের লোকদের মাঝে পড়ালেখা ও শিষ্টাচারচর্চার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। অথচ নবিজি ছিলেন বিশ্বস্ততা, পবিত্রতা, সদ্যবহারসহ পরিপূর্ণ মানবীয় গুণাবলির প্রবাদপুরুষ। পৃথিবীর অনাগত সকল মানুষের জন্য আদর্শ। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানুষের মাঝে সম্ভাব্য সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছেন। যেন মানুষ সহজেই অনুশ্রবণ করে, নবিজি নির্দিষ্ট কোনো গোত্রের জন্য প্রেরিত হননি, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সর্বোত্তম আদর্শে সুসজ্জিত করে পুরো পৃথিবীর মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন।

পশ্চিমা বিশ্বের কয়েকজন খ্রিষ্টান গবেষক এই চিরসত্য বিষয়টি সত্যায়ন করেছেন। *হাজিরুল আলামাল ইসলামি গ্রন্থে* পশ্চিমা গবেষক দিনার বরাতে নিম্নোক্ত কথাগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি বলেন—

পশ্চিমা গবেষকরা তাদের ব্রাহ্ম চিন্তার ওপর ভিত্তি করে নবিজির জীবনী রচনা করে। তাদের এই কুটিল ষড়যন্ত্র তিন-চারশত বছর যাবৎ চলে আসছে। এই গর্হিত কাজের মাধ্যমে সিরাতের সঠিক শিক্ষা বিদায় করে তাদের ব্রাহ্ম মতবাদ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চায়; কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। ইংরেজ, ফ্রান্স, জার্মান, পোলাভসহ তাবৎ পৃথিবীর ইসলামবিদ্বেষীদের চক্রান্ত নিজেদের কর্মকাণ্ডের কলে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ইসলামের বিরোধিতায় তারা পরস্পরে দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়। একজনের বক্তব্য আরেকজন প্রত্যাখ্যান করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।



● দুই.

নবিজি সাম্রাজ্যে আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমনের পূর্বেই সেখানে ইসলামের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বাইরাতে আকাবায় মদিনার সেই ছোট্ট কাকেলার ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল সেই সম্ভাবনা। মদিনার লোকগুলো ইসলাম গ্রহণের কারণ কী?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে ইতিহাসের গলি-দুপাটি। মদিনায় দুটি সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল—

- এক. মুশরিক সম্প্রদায়; যারা আদিকাল থেকেই আরবের বাসিন্দা।
- দুই. ইহুদি সম্প্রদায়; যারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হিজরত করে আরবে বসতি স্থাপন করে।

আরবের আদি বাসিন্দা মুশরিকরা মূলত দুটি গোত্রে বিভক্ত—

- এক. আওস,
- দুই. খাজরাজ।

অনুবৃণভাবে বহিরাগত ইহুদিরা তিনটি গোত্রে বিভক্ত ছিল—

- ০১. বনু কুরাইজা,
- ০২. বনু নাজির ও
- ০৩. বনু কাইনুকা।

দুরাচার ইহুদিরা নিজেদের স্বভাবজাত অভ্যাস অনুযায়ী আওস ও খাজরাজ গোত্রের মাঝে কৌশলে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। দুটি গোত্র পরস্পরের চোখের কাঁটায় পরিণত হয়। দফায় দফায় রক্তে রঞ্জিত হতে থাকে মদিনার তপ্ত জমিন। ইহুদি গোত্র বনু কুরাইজা আওস গোত্রের পক্ষাবলম্বন করে। বনু নাজির ও কাইনুকা খাজরাজ গোত্রের সাথে সমঝোতা করে। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব মুখতার সিরাতির রাসূল গ্রন্থে লিখেছেন—

এই দুই গোত্রের মাঝে একশত বিশ বছর পর্বত যুদ্ধ চলমান ছিল। আওস ও খাজরাজের মাঝে সর্বশেষ হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে তাদের বড়ো বড়ো নেতারা নিহত হয়।



মুশরিক আওস ও খাজরাজ সম্প্রদায় ইহুদিদের থেকে শেষ নবির আবির্ভাবের গল্প শুনত। তাদের সাথে মনোমালিন্য হলে বলত—

এই তো, আর কদিন অপেক্ষা করো, অচিরেই সর্বশেষ নবির আগমন ঘটবে; আমরা তাকে সাথে নিয়ে আদ ও ইরম জাতির মতো তোমাদের ধ্বংস করব।

এভাবে ইহুদিদের থেকে শুনে শুনে আওস এবং খাজরাজ সম্প্রদায় ইসলামের প্রতি আগ্রহী ও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তারা আশায় বুক বেঁধে ছিল, হয়তো শেষ নবির দ্বীনের ওসিলায় আমাদের মাঝে ঐক্যের ভিত স্থাপিত হবে। দূর হবে শত্রুতার কালো অধ্যায়।

জাদুল মাআদ গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন—

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করার পূর্বে আল্লাহ তায়ালা এভাবেই কাকিরদের হৃদয়কে ইসলামের প্রতি ধাবিত করে দেন। আল্লাহ তায়ালায় কৌশলের ফয়সালা এভাবেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, তিনি মদিনাকে ইসলামের কেন্দ্রস্থল মনোনীত করবেন। সেখান থেকেই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়বে ইসলামের শাখত বাণী।^{১০০}

তিন.

আকাবায় উলার সর্বপ্রথম বাইয়াতটি ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাইয়াতে আকাবায় মদিনার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ করলে দেখতে পাই, নবিজি তাদের মৌখিকভাবে কালিমা পড়িয়ে বিদায় দেননি। অন্তঃকরণে ও মৌখিকভাবে ইসলামের দীক্ষা দিয়েছেন। প্রাত্যহিক জীবনের লেনদেন ও আচরণ ইসলামের বিধি মোতাবেক আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের থেকে আরও বাইয়াত নিয়েছেন যে, ‘তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করবে না, চুরি, ব্যভিচার ও অপবাদে জড়াবে না। নিজের সম্ভানকে হত্যা করবে না। নেকির কাজে আল্লাহর দেখানো পথ ব্যতীত মনগড়া আমল করবে না।’

তখনও পর্বন্ত জিহাদের বিধান নাজিল না হওয়ায় বারোজনকে কাফেলা থেকে জিহাদের বাইয়াত নেননি। এজন্য ঐতিহাসিকরা এই বাইয়াতকে ‘বাইয়াতে নিসা’

নামে আখ্যায়িত করেছেন। বাইয়াতে আকাবার কাকেলকে শুধু কালিমা পড়িয়ে বিদায় দিলে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অসংগতি আপন অবস্থায় থেকে যেত। অথচ ইমানের দাবি হলো—শুধু মুখে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে শরিয়ি বিধান বাস্তবায়ন করা; কিন্তু আমরা সমাজের কিছু লোককে দেখতে পাই, যারা ইসলামকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের মনমতো জীবনবিধান রচনা করে। তারা কাজের মাধ্যমে ইসলামের বিরোধিতা করলেও তা মুখে প্রকাশ করে না; কিন্তু তাদের কাজকর্মে প্রমাণ হয়, তারা দীনকে মিটিয়ে দেওয়ার গর্হিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। সালাত, মসজিদ, সিয়ামসহ যে বিধানগুলো অনুসরণ না করে উপায় নেই, তারা সেই বিধানগুলোতে নীরবতা অবলম্বন করে। জীবনের অন্যান্য বিধানে ইসলামকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের মনমতো বিধান কার্যকর করে। সেসব ক্ষেত্রে ইসলামকে অপাণ্ডন্তেয় মনে করে।

যারা নবিজির দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল, যদি তাদের সম্মুখে বর্তমান যুগের ভাণ্ড লোকদের এই জীবনদর্শন উপস্থাপন করা হতো, তারা নিঃসংকোচে ইসলাম গ্রহণ করত। কারণ, এভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে শরিয়ত তাদের অনুগামী হতো। নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করতে সমস্যা হতো না; কিন্তু তারা জানত, ইসলাম সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল এক জীবনবিধানের নাম। সেই বিধানে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ তায়াল। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। তাতে মনগড়া কোনো বিধান প্রণয়ন বা আমলের সুযোগ নেই। কাকিররা এই বিষয়টি জানার কারণে ইসলাম গ্রহণ না করে প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিরোধিতা করেছে। কপটতার আশ্রয় নেয়নি। কিছু মানুষ ইসলামকে কিছু দুআ ও ইবাদতের সমষ্টি মনে করে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের কার্যকারিতা অস্বীকার করে। তাদের সতর্ক করে আল্লাহ তায়াল। ইরশাদ করেন—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল হয়েছে তাতে তারা ইমান এনেছে, অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও



সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর
শয়তান তাদের ভীষণভাবে পঞ্চদষ্ট করতে চায়?৷

এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ইসলাম কেবল কিছু বিশ্বাস ও ইবাদতের
মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানবজীবনের সকল সমস্যার
সমাধান।

চর.

কোনো ব্যক্তি বা গোত্র ইসলাম গ্রহণের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
কী সিন্ধান্ত নিতেন? বাইয়াতে আকাবায় উলার ঘটনায় এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে।
বাইয়াত গ্রহণ শেষে ফিরে যাওয়ার সময় ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের সাথে
মুসআব ইবনে উমাইর রা.-কে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের কুরআন শিক্ষাদান,
সালাত প্রতিষ্ঠা ও শরিয়তের বিধিবিধান শিক্ষা দিতে থাকেন।

পাশাপাশি মদিনাবাসীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। দাওয়াতের পথ
মসৃণ ছিল না তার জন্য। হরহামেশাই শত্রুর টার্গেটে পরিণত হয়েছেন। মুসা ইবনে
উমাইরকে শহিদ করতে এসে তার কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামের দাওয়াত ও
অমায়িক ব্যবহারে প্রভাবিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার গল্প নেহায়েত কম নয়।
এ যেন পরশপাথর। জীবন হরণ করতে এসে মুহূর্তেই বনে যেত পরম আপনজন।
বসে যেত ছাত্রত্বের কাতারে। এভাবে মদিনার অলিগলি ও প্রতিটি বৈঠকে ইসলামের
নাম উচ্চকিত হতে থাকল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায়
আগমনের পূর্বেই সেখানে ইসলামের জন্য তৈরি হলো অনুকূল পরিবেশ।

মুসআব ইবনে উমাইর রা.-এর মেহনতে মদিনা ইসলামের উর্বর ভূমিতে পরিণত
হলো। যিনি ইসলামের জন্য দুনিয়ার সুখ ও বিলাসিতা বিসর্জন দিয়েছেন। আরামের
জীবন ছেড়ে বেছে নিয়েছেন কষ্টের গিরিপথ। ইসলাম-পূর্ব জীবনে আকর্ষিত বিলাসিতায়
নিমজ্জিত ছিলেন। প্রাচুর্যে টইটুফুর ছিল জীবনের চারপাশ। ব্যবহার করতেন দামি
সুগন্ধি। সুঠাম দেহে পোশাকের আভিজাত্য মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিত। ইসলাম
গ্রহণের সাথে সাথে সব বিলাসিতা পরিত্যাগ করলেন। ইসলামের দাওয়াতের জন্য
জীবনের স্বপ্নসাধ বিসর্জন দিয়ে কষ্ট-সাধনার কষ্টকাকীর্ণ পথ অবলম্বন করলেন।
উলুদের যুগ্মে শহিদ হওয়ার পর পরিধানের কাপড় ছাড়া আর কোনো কাপড় ছিল



না। এই কাপড় দ্বারা পুরো শরীর আবৃত করা যাচ্ছিল না। মাথা ঢাকলে পায়ের দিক ও পায়ের দিকে কাপড় ছড়িয়ে দিলে মাথা অলঙ্গা হয়ে যাচ্ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই সংবাদ দেওয়ার পর মুসআব ইবনে উমাইরের পূর্বের স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের কথা মনে করে তিনি কাঁদতে লাগলেন। নবিজি সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, কাফনের কাপড় দিয়ে মাথার দিকে টেনে দাও, পায়ের দিকে ঘাস দ্বারা ঢেকে দাও।”

ইসলামের দাওয়াত ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত। দাওয়াতের সারকথা হলো, মানুষকে ভালো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করা। এই দায়িত্ব নবি-রাসুল ও উলামায়ে কিরামের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। দাওয়াতের এই কাজটুকু জিহাদের মতো ফরজ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক মুসলিমের সামর্থ্য অনুযায়ী এই দায়িত্ব পালন করা আবশ্যকীয় কর্তব্য। একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে অন্যান্য বিধানের মতো তার ওপর জিহাদের বিধান অর্পিত হয়। নারী-পুরুষ, আলিম-দরবেশ ও জনসাধারণ—সকলেই এই বিধানের ক্ষেত্রে সমান। আল্লাহ তায়ালা জাহাতিতের পরিবর্তে মুসলিমদের জ্ঞান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। এজন্য ইসলামকে উচ্চ শিক্ষার পৌছানোর জন্য ত্যাগের মানসিকতা লাভন করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর গুরুদায়িত্ব।

* * *





বাইয়াতে আকাবায়ে সানিয়া

বাইয়াতে আকাবা উলার ঠিক এক বছর পর পুনরায় হজ্জের মৌসুম দরজায় কড়া নাড়ল। মুসআব ইবনে উমাইর মদিনা থেকে সম্ভরজন পুরুষ ও দুজন নারীর বিরাট এক কাফেলা নিয়ে মক্কায় পৌঁছলেন। সফরসজ্জী মুশরিকদের কাছে সফরের উদ্দেশ্য গোপন রাখা হলো। কাব ইবনে মালিক রা. সেই কাফেলার গর্বিত একজন সদস্য। তিনি বাইয়াতের পুরো ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আইয়্যামে তাশরিকের মধ্যবর্তী রাতে আমাদের সাথে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করেন। সেদিন রাতে আমরা দ্রুত শূয়ে গেলাম। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর অতি সন্তর্পণে সাক্ষমতে নির্ধারিত স্থান আকাবার ঘাঁটিতে উপস্থিত হলাম। আমাদের কাফেলায় তেহাশুরজন পুরুষ ও দুজন নারী, নুসাইবা বিনতু কাব ও আসমা বিনতু আমর ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু আনহুমা উপস্থিত ছিলেন।

আমরা সেখানে নবিজির জন্য অপেক্ষমাণ ছিলাম। হঠাৎ রাতের আঁথার ভেদ করে যেন আলোর ফুল ফুটল। চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে সাথে নিয়ে আগমন করলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী। আব্বাস তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। প্রিয় ভাতিজার নিরাপত্তার জন্য এই মজলিসে উপস্থিত হয়েছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুরুতেই তাদের স্বাগত জানালেন। তারপর কাফেলার লোকেরা আলোচনা শুরু করল।



তারা নবিজির কাছে বিনীত কণ্ঠে আরজ করল—হে আল্লাহর রাসূল, আপনার জন্য এবং আপনার প্রভুর জন্য আমরা কী করতে পারি, আমাদের আদেশ করেন।

তাদের আবেদনের পরিত্রেক্ষিতে নবিজি কুরআন তিলাওয়াত করলেন। আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে বাইয়াত করার পূর্বে বললেন—আমি তোমাদের এই শর্তে বাইয়াত করব যে, তোমাদের স্ত্রী-বাচ্চাদের যেভাবে নিরাপত্তা দাও, ঠিক সেভাবে আমার নিরাপত্তা দেবে।

বারা ইবনে মারুর রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে বললেন—ওই সন্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবি করে পাঠিয়েছেন। আমরা বংশানুক্রমে যোশা জাতি। নিজেদের স্ত্রী-বাচ্চাদের যেভাবে নিরাপত্তা দিই, সেভাবেই আপনাকে নিরাপত্তার চাদরে বেঁটন করে রাখব। প্রিয় রাসূল, আমাদের আপনি বাইয়াত করে নেন।

এরই মাঝে আবুল হাইসাম ইবনে তিহাম রা. বলে উঠলেন—আমাদের এক ইহুদিদের মাঝে সমঝোতা চুক্তি রয়েছে। প্রয়োজনে আমরা চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবো; কিন্তু একটি বিষয় জানতে ইচ্ছে করছে, যখন আল্লাহ তায়াল্লা আপনাকে বিজয়ী করবেন, তখন কি আপনি আমাদের ছেড়ে মকায় স্বীয় গোত্রের কাছে চলে আসবেন?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনে মুচকি হাসলেন। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—না, কখনো আমি তোমাদের ছেড়ে চলে আসব না। আমার কাছে তোমাদের রক্ত ও সম্মানের মূল্য আমার নিজের রক্ত ও সম্মানের মতো। আমি তোমাদের মাঝে একাকার হয়ে গিয়েছি। তোমরা যাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমিও তাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হব। যাদের সাথে বন্ধুত্বের বাঁধন গড়ে তুলবে, আমিও তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখব। তারপর তাদের বললেন—তোমাদের মধ্য থেকে বারোজন নেতা নির্বাচিত করো, যারা নিজ নিজ প্রতিনিধিত্ব করবে।

তখন খাজরাজ গোত্রের নয়জন ও আউস গোত্রের তিনজনকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। তারপর নবনির্বাচিত বারোজন প্রতিনিধিকে বললেন—আমি তোমাদের ইসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিমাস সালামের সঙ্গীদের মতো দায়িত্বশীল করে পাঠাচ্ছি। তোমরা নিজ নিজ গোত্রে সামর্থ্যের সবটুকু

উজ্জ্বল করে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করবে। আমিও নিজ গোত্রের একজন দায়িত্বশীল।

বৈঠকের মৌলিক কথাবার্তা শেষ হলো। সর্বপ্রথম ইবনে মান্নুর রা. নবিজি সাদ্দাম্নাহু আলাইহি ওয়া সাদ্দামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। এই বাইয়াতে নবিজি জিহাদের কথাও যুক্ত করেছিলেন। তিনি মহান আল্লাহ তায়াল্লা ও নিজের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেন। নবিজির সাথে কৃত ওয়াদা পূরণের জন্য আনসারদের জন্য জম্মাতের সুসংবাদ শোনান। তারপর একে একে গোত্রের সকলেই বাইয়াত গ্রহণ করেন।

বাইয়াতের কাজ শেষ হলে নবিজি ঘোষণা করলেন—তোমরা প্রত্যেকের গন্তব্যে চলে যাও। চলে যাওয়ার সময় আব্বাস ইবনে উবাদা ইবনে নাফলা নবিজির কাছে অনুমতির স্বরে বলল—হে আল্লাহর রাসূল, যিনি আপনাকে সত্য নবি করে পাঠিয়েছেন ওই সম্ভার কসম! আপনি যদি অনুমতি দেন, সকলেই আমরা মিনায় অবস্থানরত মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করব। নবিজি সাদ্দাম্নাহু আলাইহি ওয়া সাদ্দাম তাকে বললেন—আমি তো তোমাদের এই নির্দেশ দিইনি; এক্ষুনি নিজ নিজ তাঁবুতে চলে যাও।

কাব ইবনে মালিক রা. বলেন—তারপর আমরা সকলেই নিজ নিজ তাঁবুতে চলে গেলাম। সকাল হতেই কুরাইশদের একদল লোক আমাদের কাছে এসে বলতে লাগল, আমাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমরা অনেক বড়ো অ্যাংজেন্ডা নিয়ে মকায় এসেছ। তোমরা নাকি মুহাম্মাদকে এখান থেকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাবে, এমনকি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তোমরা তাঁর হাতে শপথ গ্রহণ করেছ! কিন্তু তোমরা জেনে রাখো—পুরো আরবের মধ্যে অন্য সব গোত্রের চেয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমাদের কাছে খুবই অপছন্দনীয়।

এমনি সময় আমাদের জন্য আল্লাহর নুসরত নেমে এলো। আমাদের সফরসজ্জা এক মুশরিক রাভের ঘটনা সম্বন্ধে অবগত ছিল না, সে দাঁড়িয়ে বলল—খোদার কসম! আমরা কখনো এমনটি করিনি, এমনকি এই জাতীয় কোনো ঘটনা সম্বন্ধে আমরা অবগত নই। এ সময় আমরা পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করেছিলাম। এরপর সকলেই মিনা থেকে চলে গেল; কিন্তু ঘটনার রেশ এখানেই শেষ হয়নি।

কাব ইবনে মালিক রা. বলেন—কুরাইশরা রাতে ঘটনা সম্বন্ধে আরও সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারল। তারা পুনরায় আমাদের তালাশে ধের হলো; কিন্তু ততক্ষণে আমরা সেখান থেকে সরে গিয়েছি। আব্বাসির নামক স্থানে কুরাইশরা সাদ ইবনে উবাদা ও মুনজির ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে পেল। তন্মধ্যে সাদ রা.-এর হাত কাঁধের সাথে বাঁধল। তারপর নির্মমভাবে প্রহার করে কপালের চুল ধরে টানতে টানতে মকায় নিয়ে গেল।

সাদ রা. বন্দিত্ব সময়ের স্মৃতিচারণ করে বলেন, একবার কুরাইশরা আমাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছিল। এমনি সময়ে কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তি কানে কানে এসে বলল—এখানের কোনো ব্যক্তির সাথে তোমার কোনো অজীকার বা ভালো সম্পর্ক আছে?

আমি বললাম—অবশ্যই আছে। এই তো সেদিন জুবাইর ইবনে মুতরিম ও হারিস ইবনে উমাইয়্যার স্যবসায়ীদেরকে আমি নিজ শহরে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম। তখন ওই ব্যক্তি পরামর্শ দিলো—এই দুজনের প্রভাব কাজে লাগাও। আমি তার পরামর্শ মোতাবেক কুরাইশদের কাছে এই দুজনের নাম বললাম। তারা দুজন এসে কুরাইশদের হাত থেকে আমাকে মুক্ত করলেন।

উবাদা ইবনে সামিত রা. বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে জিহাদের অজীকার নিয়েছেন। আমরা আরও অজীকারে আবদ্ধ হয়েছি যে, আমরা ভালো-মন্দ সর্বাবস্থায় তাঁর আনুগত্যে অটল থাকব। তার কাছের মানুষদের সাথে বিবাদে জড়াব না। সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলব। ভরসনাকারীদের কথায় কর্ণপাত করব না।”

সর্বপ্রথম এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা নবিজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিহাদের অনুমতি দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ

২১৯ এই বর্ণনাকৃত ঘটনাটির সূত্র সিরাতে ইবনে হিশাম, মুসনাদু আহমাদ, তারিখুত তাবারিহ আরও সেইসব নির্ভরযোগ্য কিতাব, যেগুলোতে এই পরিপূর্ণ বর্ণনাটি স্থান পেয়েছে। এটি মা'বদ ইবনে কাব ইবনে মালিক রা. থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন।



بَعْضُهُمْ يَبْغِضُ لِهَدِمَتِ صَوَامِعُ وَيَبِيعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ
 اللَّهُ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥﴾

যুম্মের অনুমতি দেওয়া হলো তাদের, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম; তাদের তাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে—‘আমাদের রব আল্লাহ।’ আল্লাহ যদি মানুষদের একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত নাসারা সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, সীর্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ—যাতে খুব বেশি স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন, যে আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।”

* * *

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

হিজরতের পূর্বের দুই বছরে মদিনার দুটি কাকেলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। উভয় কাকেলা ইসলামের ঘোষণা, ধীনের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ও নবিজির সব শর্ত বিনা বাক্যে মানতে বধ্যপরিকর ছিল। উভয় বাইয়াতের ধরন একই রকম ছিল। তবে উভয় বাইয়াতের মাঝে দুটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়—

প্রথম পার্থক্য

প্রথম বাইয়াতে মদিনার বারোজন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় বাইয়াতে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পঁচাত্তরে দাঁড়ায়। তন্মধ্যে তিয়াত্তরজন পুরুষ ও দুজন নারীও ছিলেন।

প্রথম বাইয়াতের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার বারোজনের সাথে মুসআব ইবনে উমাইর রা.-কে প্রেরণ করেন। মুসআব ইবনে উমায়ের মিশন অনুযায়ী মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। ইসলামে দীক্ষিত মুসলিমদের কুরআন শিক্ষা দেন। প্রতিটি কাজে ধীনের বিধিবিধানে অভ্যস্ত করে তোলেন। তার অক্লান্ত মেহনতের ফলে মদিনার ঘরে ঘরে ইসলাম পৌঁছে যায়। ইসলামের আলোচনায় সরগরম হয়ে ওঠে মদিনার অলিগলি, প্রতিটি মজলিস। মুসআব ইবনে উমাইর রা.-এর মতো প্রত্যেক যুগের প্রতিটি মুসলিমের ওপর নিজের সামর্থ্য অনুপাতে ইসলাম প্রচার করা আবশ্যকীয় দায়িত্ব।

দ্বিতীয় পার্থক্য

বাইয়াতে আকাবায় উল্লায় জিহাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি; কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইয়াতে আকাবায় সানিয়ায় স্পষ্টভাবে জিহাদের বাইয়াত



গ্রহণ করেছেন। কারণ, নবিত্তির নিরাপত্তা ও ধীনের দাওয়াতের প্রয়োজনে অচিরেই অস্ত্র হাতে কাকিরদের মুখোমুখি হতে হবে। নবিত্তি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় বাইয়াতে জিহাদ ও দাওয়াতের কাজে মদিনাবাসী কর্তৃক সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি আলাদা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। মক্কি জীবনে জিহাদের বিধান নাজিল হয়নি; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নবিত্তিকে জিহাদের বিধান নাজিল হওয়ার পূর্বেই বিষয়টি অবগত করেছিলেন। এজন্য তিনি অশ্রিম মদিনাবাসীর থেকে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেছেন যে হিজরত সংঘটিত হওয়ার পর তোমাদের জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে। কিছু মানুষ মাক্কি জীবনে জিহাদের বিধান নাজিল হওয়ার কথা বলেন। যেমন : ইবনে হিশামের বর্ণনা থেকে বিষয়টি বোঝা যায়। তাদের এই দাবি ঠিক না হওয়ার পক্ষে আব্বাস ইবনে উবাদার ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। যখন তিনি বলেছিলেন—

হে আল্লাহর রাসুল, যিনি আপনাকে সত্য নবি করে পাঠিয়েছেন ওই সন্তার কসম! আপনি যদি অনুমতি দেন, সকালেই আমরা মিনায় অকথানরত মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করব।

নবিত্তি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে জিহাদের অনুমতি না দিয়ে বলেছিলেন—

‘আমি তো এই মুহূর্তে তোমাদের জিহাদের অনুমতি দিইনি; এক্ষুনি নিছ নিছ তাঁবুতে চলে যাও।’

এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, সূরা হজ্জের উনচল্লিশ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে সর্বপ্রথম জিহাদ শরয়ি বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পূর্বে জিহাদসংক্রান্ত কোনো আয়াত নাজিল হয়নি।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে এ আয়াত নাজিল হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন—

যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা হতে বহিস্কার করা হলো, তখন আবু বকর রা. বললেন তারা তাদের নবিকে বের করে দিলো “ইম্মা লিমাহি ওয়া ইম্মা ইলাইহি রাজিউন।” এই লোকগুলো নিশ্চিত ধ্বংস হবে। তখন এই আয়াত নাজিল হলো—

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٥٩﴾



‘যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদের—যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম।’^{২২১}

আবু বকর রা. বলেন—তখন আমি বুঝলাম, শীঘ্রই জিহাদ আরম্ভ হবে।^{২২২}

এই স্থানিস দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়—নবিজি হিজরত করার পর জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। মাক্কি জীবনে জিহাদ শরিয়ি বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—এই মতামত বক্তৃতা করার কোনো সুযোগ নেই।

জিহাদ দেরিতে শরিয়তনিস হওয়ার কারণ

কারণও মনে প্রমাণ জগতে পারে—জিহাদসংক্রান্ত আয়াত বিলম্বে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ কী? বাস্তবে এর পেছনে লুক্কায়িত রয়েছে গূঢ় রহস্য। বাস্তবতার দাবি হলো—জিহাদের বিধান নাজিল করার পূর্বে সর্বপ্রথম ইসলামের পরিচয় ও শাস্ত্রত সৌন্দর্যের দিকগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরা। দলিলের মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। দাওয়াতি কাজের বাথাবিপত্তিগুলো পর্যবেক্ষণপূর্বক অভিজ্ঞতার বুলি সম্বন্ধ করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা। এই ধাপগুলো অতিক্রম করার পর আল্লাহ তায়াল্লা জিহাদের ফরজে কিফায়া বিধান নাজিল করলেন। জিহাদের এই দায়িত্ব বিশ্বের সকল মুসলিমের কাঁধে অর্পিত হয়েছে।

মাক্কি জীবনে জিহাদের বিধান নাজিল না হওয়ার একটি কারণ হলো—তখনও মুসলিমরা মক্কার মুশরিকদের অধীনে বসবাস করত। তারা স্বতন্ত্র কোনো রাষ্ট্রের মালিক হয়নি। মুসলিমদের জন্য জিহাদের জন্য প্রয়োজন নিজস্ব রাষ্ট্র। মুসলিমদের জন্য মদিনা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হওয়ার সাথে সাথে সেই প্রতিবন্ধকতা মিটে গেল। মদিনা নামক দুর্গ থেকে পরিচালিত হতে থাকল জিহাদের সব আয়োজন।

শরিয়ি দৃষ্টিকোণে জিহাদ

জিহাদ। শান্তিপ্রিয় ইসলামের গৌরবময় বিধান। জিহাদ সম্বন্ধে কুরআন-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সুস্পষ্ট বক্তব্য ও নির্দেশনা। সত্বাসের সাথে জিহাদের দূরতম কোনো সম্পৃক্ততা নেই। সত্বাসের সম্পর্ক হিংস্রতার সাথে। জিহাদ হিংস্রতাকে উৎখাত করে সমাজে ইনসাফ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। জিহাদকে কলুষিত করতে একদল লোকের

২২১ সূরা বাক্ব, আয়াত : ৩৯

২২২ সূরা নুহ নামাযি, বাক্ব : ২, পৃষ্ঠা : ৫২; তাকসির ইবনি কাসির, বাক্ব : ৩, পৃষ্ঠা : ২২৪



চেষ্টার অন্ত নেই। জিহাদকে সম্ভ্রাস আখ্যা দেওয়ার জন্য মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক অপব্যবস্থা। মানুষের মগজে বপন করছে সম্ভ্রাসের বীজ। জিহাদ তাগুত শক্তির কাছে ভয়ংকর বিধান। জিহাদ শব্দটি শুনতেই তাদের অন্তরাঙ্গা কেঁপে ওঠে। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা অনুধাবন করেছে—মুসলিমদের থেকে জিহাদের প্রেরণা বিদায় করতে হবে। তাদের মাঝে জিহাদের চেতনা জাগরুক থাকলে পৃথিবীর কোনো শক্তির তাদের বুখার সাধ্য নেই। এই বিষয়টি উপলব্ধি করে তারা জিহাদের বিরুদ্ধে ছড়াচ্ছে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা। মিথ্যা তথ্যে ভারী করেছে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া।

তাগুত শক্তির প্রোপাগান্ডা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের সামনে কিছু বিষয় স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। তন্মধ্যে শরিয়তে জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং জিহাদের স্তর বিন্যাসের ধারণা অন্যতম। এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনার কারণ হলো, জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ ও স্তরবিন্যাসের বিষয়গুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ষড়যন্ত্র ও বিভ্রান্তির জাল। এগুলো সম্বন্ধে আলোচনার মাধ্যমে তাদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত হবে।

জিহাদ কাকে বলে

শরিয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়—কালিমার আওরাজ উচ্চকিত করতে এবং সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠা করতে নিজের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করা। এই উদ্দেশ্যে অস্ত্রের মাধ্যমে শক্তি ব্যয় করা জিহাদের একটি প্রকার। জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি ধাপে ইসলামের হুকুম কার্যে ম করা।

জিহাদের স্তর

জিহাদের পরিচয় ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানার পর এবার আমরা স্তরবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করব। ইসলামের শুরু যুগ অর্থাৎ মাক্কী জীবনে জিহাদের বিধান নাজিল হয়নি। সে সময় শত্রুদের জুলুম-নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। তারপর হিজরতের শুরুতেই রক্ষণাত্মক জিহাদের অনুমতি দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন—তোমাদের বিরুদ্ধে কেউ জুলুম করতে এলে এর সমুচিত জবাব দেবে। এর কিছুদিন পর আক্রমণাত্মক জিহাদের অনুমতি দিয়ে বলা হয়, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যারা তোমাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। জিহাদের এই স্তরটি ইসলামে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মনোনীত হয়। প্রতি যুগে



সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জিহাদ করা ওয়াজিব। যাদের সর্বশেষ স্তর
আক্রমণাত্মক জিহাদের নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ
غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٦﴾

কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের কাছাকাছি, তাদের সাথে যুদ্ধ করো এবং
তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখো,
নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে আছেন।”

এ প্রসঙ্গে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কোনো প্রভু নেই—মানুষ এর স্বীকারোক্তি
না দেওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি।
এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তাদের তাদের জীবন ও সম্পদ আমার থেকে
নিরাপদ হবে। আর তাদের চূড়ান্ত হিসাব আল্লাহ তায়ালায় দায়িতে।”

সর্বশেষ সিন্ধাস্ত

উল্লিখিত আয়াত ও হাদিসের মাধ্যমে বোঝা যায়, ইসলামে জিহাদের বিধান
আক্রমণাত্মক বা রক্ষণাত্মক বলে কোনো বিভাজন নেই। রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলাম
প্রতিষ্ঠা করার জন্য সময়ের প্রয়োজনে নমনীয় কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই
কৌশল জিহাদের অংশ বলে বিবেচিত। ফিকহের কোনো কিতাবে সেই জিহাদকে
রক্ষণাত্মক জিহাদ নামে অভিহিত করা হয়নি। ফিকহের কিতাবে পৃথক শিরোনামে এ
সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। আশঙ্কার বিষয় হলো, অনেক গবেষক বিভ্রান্তির
শিকার হয়। জিহাদের মূল অর্থের সাথে রক্ষণাত্মক জিহাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে
তালগোল পাকিয়ে ফেলে। অথচ জিহাদ বলা হয়—কালিমার আওয়াজ উচ্চকিত
করতে ও সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠা করতে নিজের সর্বোচ্চ শক্তি
ব্যয় করা। জিহাদের এই সংজ্ঞায় রক্ষণাত্মক জিহাদের নতজানু নীতির ব্যাপারে
কোনো কথা নেই। জিহাদের সংজ্ঞা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাপারে এটাই সর্বশেষ
সিন্ধাস্ত।



ইসলামবিদ্বেষীদের অপপ্রচার

জিহাদের বিধান নাজিল হওয়ার পর জিহাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা ছড়ানো হয়। জিহাদের ওপর আরোপিত বিভ্রান্তির ওপর ভিত্তি মানুষ দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইসলামবিদ্বেষী লোকগুলো ঘোষণা করতে থাকে—

ইসলাম তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে। নবিজি ও সাহাবায়ে কিরাম জোর করে মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন। মানুষের ওপর জুলুম ও কঠোরতার ফলে ইসলাম বিভিন্ন অঞ্চলে বিজয় লাভ করে। মানুষ স্ব-ইচ্ছায় ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেনি।”

যৌকর পদ্ধতি

ঈমানদার ব্যক্তিরা বলেন—ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তা ও ভালোবাসার ধর্ম। যখন জিহাদ ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না, তখনই কেবল জিহাদ করা হয়। উল্লিখিত দুটি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ একটি অপরটির বিপরীত; কিন্তু ইসলামবিদ্বেষীরা উভয় মতামতকে নিজেদের পক্ষে টেনে নেয়। উভয় মতামতের মাধ্যমে মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে কোণঠাসা করার পায়তারা করে। এক্ষেত্রে তাদের কৌশল হলো—প্রথমেই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে। মুসলিমদের পক্ষ থেকে ইসলামের শান্তি ও সৌন্দর্য তুলে ধরার পর তারা বলে, ইসলাম তো শান্তির ধর্ম, তাহলে মানুষের ওপর অত্যাচারণ করা তো ইসলামের শিক্ষার বিপরীত। এই কথা শোনার পর জিহাদ সম্বন্ধে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি পাটে যায়। জিহাদের প্রতি বিরূপ ধারণা তৈরি হয়। একপর্যায়ে জিহাদকে অস্বীকার করে।

প্রাচ্যবিদদের বক্তব্য

আমার কবু ডক্টর ওহবাহ জুহাইলি আসাবুর হারব ফিল ফিকহিল ইসলামি গ্রন্থে প্রসিদ্ধ ইংরেজ প্রাচ্যবিদ আভারসন সম্বন্ধে এই সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আমি হুবহু তার বক্তব্য এখানে তুলে ধরি—

পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে ইংরেজরা মুসলিমদের মাঝে জিহাদের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়াকে খুব বেশি ভয় করে। কেননা, এর ফলে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়ে শত্রুদের পরাভূত করবে। এজন্য তারা প্রচার করে বেড়ায়—‘জিহাদের বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে। বর্তমান যুগে



জিহাদের বিধানের কার্যকারিতা অবশিষ্ট নেই।' অ্যাভারসন সেই সকল ব্যক্তিদের অন্যতম। এই সকল বেঈমানদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

অতঃপর যদি 'মুহকাম' কোনো সূরা নাজিল হয় এবং তাতে যুশ্বের কোনো নির্দেশ থাকে, আপনি দেখবেন—যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মতো আপনার দিকে তাকাচ্ছে।

যাহোক ৩ জুন, ১৯৬০ সালের শুক্রবার দিন সম্মুখ প্রাচ্যবিদ আভারসনের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাকে জিহাদ সম্বন্ধে তার বক্তব্যের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করলাম। সে আমাকে ফিকহের মূলনীতি শুনিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল, যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামের বিধানেও পরিবর্তন ঘটে। বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের ওপর জিহাদ ফরজ নয়। বিশ্বের সকল মুসলিম বৃন্তের বন্ধনে একাটা হয়ে আছে। জিহাদের কারণে মানুষ ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কটু কথা বলে। তা ছাড়া স্বাধীনচেতা চিন্তাশীল কোনো ব্যক্তি শক্তির জোরে আধিপত্য বিস্তারকে পছন্দ করবে না।

ইসলামবিরোধী শক্তি ভালো মানুষের ছদ্মাবরণে যুগে যুগে এভাবে ইসলামে বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে।

* * *





মদিনায় হিজরতের অনুমতি

মক্কার অসহনীয় পরিবেশ

অসহনীয় জুলুমে উত্তপ্ত মক্কার পরিবেশ। কুরাইশ কর্তৃক মুসলিম নিখনের মহোৎসব চলছে। ঠিক তখনই মদিনার সম্ভারোক্ষ লোকের কাফেলা মক্কায় আগমন করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। ইবনে সাদ *আত-তাফাকাতুল কুবরা* গ্রন্থে আয়িশা রা. আনহার সূত্রে সেই সময়ের চিত্র উল্লেখ করেছেন—

কাফেলার প্রতিটি প্রাণ নবিজির পক্ষে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। আনন্দের আতিশয্যে আল্লাহর দরবারে নবিজি শুকরিয়া আদায় করেন। কুরাইশরা মদিনার কাফেলার সাথে নবিজির সাক্ষাতের বিষয়টি জানতে পেরে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। জুলুমের মাত্রা পূর্বের চেয়ে অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছল। এহেন পরিস্থিতিতে সাহাবায়ে কিরাম নবিজির কাছে হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, যারা মক্কা থেকে চলে যেতে চাও, তারা সোজা মদিনায় চলে যাও।

নবিজির অনুমতি পেয়ে সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত সংগোপনে পরস্পরের সাথে পরামর্শ করে মদিনায় হিজরত করেন। আবু সালামা ইবনে আবদুদুদাহ আসাদ সর্বপ্রথম মুহাজির হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তারপর আমির ইবনে রবিয়া তার স্ত্রী বিনতে আবু হাসামাকে সাথে নিয়ে হিজরত করেন। নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিনতে আবু হাসামা হাওদায়



আরোহণ করে মদিনায় হিজরত করেন। তারপর দলে দলে মদিনায় হিজরতের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। মদিনার আনসার মুহাজিরদের সার্বিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।^{২২৭}

অন্য সকল সাহাবির চেয়ে উমর রা.-এর হিজরতের চিত্র ব্যতিক্রম ছিল। আলি রা. সেই চিত্র বর্ণনা করেছেন—

উমর রা. ঘর থেকে রণসাজে সজ্জিত হয়ে হিজরতের ইচ্ছায় বের হলেন। গলায় ঝোলানো তরবারি, কাঁধে ধনুক, হাতে তির এবং কোমরে বর্শা বেঁধে কাবা প্রাঙ্গণে ছুটে চললেন। যেখানে পূর্ব থেকে কাকির নেতারা বৈঠক করছিল। তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ধীরেসুস্থে বাইতুল্লাহর চারপাশে সাতবার তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহিমে সালাত আদায় করলেন। তারপর সেখানে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন—আল্লাহ দুশমনদের ধ্বংস করুক, লান্ধিত করুক!

যে ব্যক্তি মায়ের চোখে অশ্রু ঝরাতে চায়, বাচ্চাদের এতিম ও স্ত্রীকে বিধবা করতে চায়, সে যেন এই মুহূর্তে আমার মুখোমুখি দাঁড়ায়। তার এই ঘোষণার পর কিছু দুর্বল ও মাজলুম ব্যক্তি তার পাশে দাঁড়ায়। তিনি তাদের সাথে কিছু কথা বলে একাই মদিনার পথে রওনা হন।^{২২৮}

এভাবেই হিজরতের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। একসময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর ও আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এবং মুশরিকদের হাতে বন্দি মুসলিম ও সফর করতে অক্ষম ব্যক্তিগণ ছাড়া সকলেই মদিনায় হিজরত করেন।

* * *

২২৭ তাবাকাতু ইবনি সাহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১০-২১১; তারিখুত তাবারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৬৭

২২৮ উসদুল গাবাহ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৮



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

হিজরতের শিক্ষা

হিজরতের পূর্বে সাহাবায়ে কিরাম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত ছিলেন। হিজরতের মাধ্যমে সেই কঠিন পরীক্ষা থেকে নিস্তার পাওয়ার পর শুরু হলো পরীক্ষার নতুন অধ্যায়। সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জন্মভিটা, সহায়সম্পত্তি, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে আসার নিদারুণ কষ্টের পরীক্ষা হাসিমুখে বরণ করেন। মক্কা থেকে হিজরত করার সময় তারা ঈমানকে বুকে ধারণ করে দুনিয়াবি সব অর্জন বিসর্জন দিয়েছেন। তাদের ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা মদিনায় এমন সাহায্যকারী প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, যারা তাদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার জন্য হৃদয়ের দুয়ার খুলে অপেক্ষমাণ ছিলেন।

মুহাজির সাহাবায়ে কিরামের এই ঘটনা পৃথিবীর অনাগত সকল মুসলিমের জন্য উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ত্যাগের নাজরানা পেশ করলে আল্লাহ তায়ালা প্রতি যুগে বান্দাদের যথাযোগ্য পুরস্কারে ভূষিত করবেন।

মদিনার আনসার সাহাবিগণ মুহাজির সাহাবিগণের জন্য নিজেদের সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে ইসলামের প্রকৃত প্রাণের দ্বার উন্মুক্ত করলেন। স্থাপন করলেন মুসলিমদের মাঝে ভালোবাসার দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তায়ালা রক্তের প্রাণের চেয়েও ইসলামি প্রাণের বন্ধনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুহাজিরদের জন্যও মিরাসের বিধান কার্যকর ছিল। মদিনায় ইসলামের ভিত্তি শক্তিশালী হওয়া পর্যন্ত মিরাসের অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য আলাদাভাবে তাদের নির্ধারিত অংশের বিধান নাজিল হয়নি। ইসলামি প্রাণের স্বার্থ রক্ষার জন্য আল্লাহ



তায়ীলা এই বিধান বিলম্বে নাজিল করেন। ইসলামি আত্ৰতের বন্ধন সুদৃঢ়করণে আল্লাহ তায়ীলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ
يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ
اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧١﴾

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ স্বারা
আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং
সাহায্য করেছে, তারা পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু
হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব
তোমাদের নেই।”

হিজরতের ঘটনা থেকে বিশেষত এই দুটি শিক্ষা মুসলিমদের জন্য পরম পাথের।

দানুল ইসলামে হিজরত করা ওয়াজিব

ইমাম কুরতুবি র ইবনুল আহ. রাবি থেকে হিজরতসংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনা উদ্ধৃত
করেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের
ফরজ বিধানের ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান রয়েছে। কোনো অমুসলিম
রাষ্ট্রে জামাতে সালাত আদায়, রোজা, হজসহ ইসলামের অন্যান্য বিধান পালনে
বাধাপ্রাপ্ত হলে মুসলিমদের জন্য সেখান থেকে হিজরত করা ফরজ। নবিজির দরবারে
উপস্থিত হওয়ার জন্য হিজরতের যে বিধান কার্যকর ছিল, মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে
তা রহিত হয়ে গিয়েছে। হিজরতের বিধান বলবৎ থাকার স্বপক্ষে এ আয়াতের
মাধ্যমে দলিল পেশ করা হয়। আল্লাহ তায়ীলা বলেন—



إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٥﴾

যারা নিজেদের ওপর জুলুম করে, তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করে— ‘তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?’

তারা বলে— ‘দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।’ তারা জিজ্ঞেস করে— ‘আল্লাহর জমিন কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে?’ এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস! তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও পায় না।”

পারস্পরিক সহমর্মিতা ওয়াজিব

ইসলামি ভ্রাতৃত্ব দেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বিশ্বব্যাপী। বিশ্বের সব প্রান্তের মুসলিমদের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। সকল উলামায়ে কিরাম এই বিধানে একমত যে, কোনো মুসলিম নির্ধাতিত হলে অপর মুসলিমের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নির্ধাতিত মুসলিমের সাহায্যার্থে এগিয়ে না এলে কবির গুনাহকারী সাব্যস্ত হবে।

আবু বকর ইবনুল আরাবি বলেন—

কোনো মুসলিম কাকিরদের হাতে বন্দি বা জুলুমের শিকার হলে অন্য মুসলিমদের ওপর তার শরয়ি অধিকার সাব্যস্ত হয়। ওই মুসলিমকে মুক্ত করার জন্য অন্য মুসলিমদের ওপর শারীরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সবটুকু ব্যয় করা ওয়াজিব। এমনকি এই জন্য মুসলিমদের কাছে কোনো সম্পদ অবশিষ্ট না থাকলেও এই দায়িত্ব থেকে পাশ কাটানোর সুযোগ নেই।”

কাকিরের সাথে বশুত্ব নিষিদ্ধ



মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। পরস্পর শত্রুত্ব ও বশুত্বের বাঁধনে আবদ্ধ থাকবে। সম্পর্কের এই বাগডোরে আবদ্ধ থাকা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে অমুসলিমদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা যাবে না। কুরআনুল কারিমের আয়াতের মাধ্যমে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِغُضُّهُمْ أَوْلِيَاءَ بَغِيضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٣٧﴾

আর যারা কুফরি করেছে, তারা পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক। যদি তোমরা তা না করো, তবে জমিনে ফিতনা ও মহাবিপর্ষয় দেখা দেবে।”

আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—‘কাফিরদের সাথে আন্তরিক সম্পর্কে জড়ালে মুসলিমদের ওপর নেমে আসবে বিপদের ঝঞ্ঝাবায়ু।’ ইসলামের বিজয়ের জন্য এই শিক্ষা বৃকে ধারণ করার বিকল্প নেই।

ইবনুল আরাবি আরও বলেন—

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম ও কাফিরদের মাঝে বশুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছেন। মুসলিম ও কাফির প্রত্যেকের জন্য নিজ ধর্মের লোকদের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্কের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, প্রত্যেকের স্বধর্মের লোকদের বিশ্বাস, আমল ও আচরণ-সংস্কৃতির সাথে মিল রয়েছে।”

আল্লাহ তায়ালার এই শিক্ষা প্রতি যুগের মুসলিমদের বিজয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুসলিমরা যখনই শত্রুত্ববোধ ভুলে কাফিরদের সাথে হাত মিলিয়েছে, তখনই মুসলিমরা নতজানু হতে বাধ্য হয়েছে। নেমে এসেছে লাঞ্ছনার ঝড়।

* * *





মদিনার পথপানে

আবু বকরের অপেক্ষা

সাহাবায়ে কিরাম হিজরত করে দলে দলে ছুটে চললেন মদিনার পানে। মক্কায় হাতে গোনো দুয়েকজন ছাড়া কোনো মুসলিম নেই। এই পরিস্থিতিতে আবু বকর রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হিজরতের অনুমতি কামনা করলেন। নবিজি বললেন—

আর কিছুদিন অপেক্ষা করো; আমি আশাবাদী, আল্লাহ তায়ালা আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেবেন।

আবু বকর রা. অবাক মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন—আপনার ওপর আমার মা-বাবা কুরবান হোক! আপনিও সফরের ইচ্ছা পোষণ করেন!

নবিজি বললেন—হ্যাঁ।

আবু বকর রা. নবিজির সাথে সৌভাগ্যময় সফরের আশায় মক্কায় রয়ে গেলেন। সফরের বাহন হিসেবে দুটি উট ক্রয় করে খুবই যত্নে লালনপালন করতে থাকেন।^১

নবিজিকে হত্যার চেষ্টা

দিনদিন ইসলামের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখে কুরাইশদের কপালে নিদারুণ চিন্তার অসংখ্য ভাঁজ পড়ল। তারা দেখতে পেল—শুধু মক্কা নয়, আশপাশের এলাকা থেকেও মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ছুটে আসছে। এই ভেবে তাদের দুশ্চিন্তার মাত্রা আরও বেড়ে গেল যে, অচিরেই হয়তো মুহাম্মাদ তাঁর অনুসারী অধুষিত



আশপাশের কোনো এলাকায় গিয়ে তাদের সংঘবদ্ধ করে আমাদের ওপর আক্রমণ করবে। এই পরিস্থিতিতে তাদের করণীয় নির্ধারণ করার জন্য তারা কুসাই ইবনে কিলাবের বৈঠকঘর দায়ুন নদওয়াতে মিলিত হলো। দীর্ঘ আলোচনার পর তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো—

প্রত্যেক গোত্র থেকে সূঠাম দেহবিশিষ্ট যুবক বাছাই করা হবে। প্রত্যেক গোত্র থেকে বাছাই করার উদ্দেশ্য হলো, সব গোত্রের বিরুদ্ধে নবিজির বংশ প্রতিশোধ নিতে সাহস করবে না। সবার হাতে থাকবে ধারালো তরবারি। নির্ধারিত দিনে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আক্রমণ করে নবিজিকে শেষ করে দেবে।

এহেন জঘন্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য তারা দিনকণ্ঠে নির্ধারিত করল। তখনই জিবরাইল আ. নবিজির কাছে এসে হিজরতের সুসংবাদ শোনালেন। রাতে নিজ বিছানায় ঘুমাতে নিবেশ করে দিলেন।”

আল্লাহর আশ্রিত বর্ন

হিজরতের ঘটনা প্রসঙ্গে আয়িশা রা. বলেন—

একদিন আমরা ঠিক দুপুরবেলায় আবু বকর রা.-এর ঘরে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আবু বকরকে খবর দিলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মস্তক আবৃত অবস্থায় আসছেন। তা এমন সময় ছিল—যে সময় তিনি ইতঃপূর্বে কখনো আমাদের এখানে আসেননি। আবু বকর তাঁর আসার খবর শুনে বললেন—আমার মাতা-পিতা তার প্রতি কুরবান। আল্লাহর কসম, তিনি এ সময় নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণেই এসেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌঁছে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি ভেতরে প্রবেশ করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে বললেন—এখানে অন্য যারা আছে, তাদের বের করে দাও।

—হে আল্লাহর রাসুল, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান! এরা তো আপনারই পরিবার।



—আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

—হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান! আমি আপনার সফরসঙ্গী হতে ইচ্ছুক।

—ঠিক আছে।

—হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতামা-তা কুরবান! আমার এ দুটি উট হতে আপনি যেকোনো একটি নিন।

—নিতে পারি, তবে মূল্যের বিনিময়ে।

আয়িশা রা. বলেন—আমরা অতি শীঘ্রই সফরের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করলাম এবং একটি খেলের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী গুছিয়ে দিলাম। আমার বোন আসমা বিনতে আবু বকর তার কোমরবন্ধের কিছু অংশ কেটে সে খেলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ কারণেই তাকে ‘কোমরবন্ধওয়ালি’ বলা হতো।

ইবনে ইসহাক ও ইমাম আহমাদ যৌথভাবে বর্ণনা করেন, আসমা রা. বলেন—

আবু বকর রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজরতের সময় ঘরের পাঁচ বা ছয় হাজার দিরহামের সবগুলো নিয়ে এসেছিলেন। তখন আমার দাদা আবু কুহাফা বললেন, আমার মনে হয় আবু বকর ঘরের সব টাকা-পয়সা নিয়ে গেছে; কোনো কিছু রেখে যায়নি। আমি বললাম—না, দাদা; বরং বাবা আমাদের জন্য যথেষ্ট টাকা-পয়সা রেখে গেছেন।

তখন দাদার দৃষ্টিশক্তি ছিল না। তাকে বুঝ দেওয়ার জন্য আমি কিছু পাথর একত্র করে বাবার টাকা-পয়সা রাখার পাত্রে সেগুলো রেখে ওপরে কাপড় বিছিয়ে দিলাম। সেই কাপড়ের ওপর দাদাজানের হাত স্পর্শ করানোর পর তিনি সেগুলোকে দিরহাম মনে করলেন। দাদা খুশি হয়ে বললেন—সে কিছু হলেও রেখে গেছে; যাক খুব ভালো কাজ হয়েছে।

আসমা রা. বলেন—দাদাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমি এই কৌশল অবলম্বন করেছিলাম। মূলত ঘরে তখন কোনো অর্থকড়ি ছিল না।”

নবিজির বিদ্যনায় কে

কুচকুচে কালো রাত। বৈঠকের সিঁদ্বাস্ত এবং পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক কাকির যুবকরা ঘেরাও করেছে নবিজির ঘরের চারপাশ। এদিকে নবিজি সাদ্দাম্লাহু আলাইহি ওয়া সাদ্দামের হিজরতের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আলি রা.-কে নিজ বিদ্যনায় রেখে এলেন। এর কারণ হলো—কাকিররা নবিজির প্রতি সীমাহীন শত্রুতা পোষণ করলেও পুরো মক্কায় তাঁকে সবচেয়েয়ে বিশ্বস্ত মনে করত। তাদের দামি গয়নাগাটি, আসবাবপত্র নবিজির কাছে আমানত রাখত। সেই আমানতগুলো নবিজি যথাযথভাবে মালিকদের কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বের হওয়ার সময় আলি রা.-কে আশ্বস্ত করে নবিজি সাদ্দাম্লাহু আলাইহি ওয়া সাদ্দাম বললেন, সকাল অবধি নিশ্চিন্তে শূয়ে থাকো, তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।

নবিজি সাদ্দাম্লাহু আলাইহি ওয়া সাদ্দাম ঘর থেকে বের হলেন। কাকিরদের চোখ লক্ষ্য করে মাটি নিক্ষেপ করলেন। মুহূর্তেই তাদের চোখে ভর করল রাজ্যের ঘুম। আদ্রাহর কুদরত প্রকাশিত হলো। তিনি তাদের শরীর ঘেঁষে বের হয়ে আসলেন; কিন্তু তারা কিছুই বলতে পারল না।

সাওর গুহার রাত

নব্যুতের তেরো বছর অতিক্রম হওয়ার পর দুই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৬২২ ইসায়ির বিশ সেপ্টেম্বরের ঐতিহাসিক রাত। রাসুল্লাহ সাদ্দাম্লাহু আলাইহি ওয়া সাদ্দাম ও আবু বকর রা. অত্যন্ত সন্তর্পণে সাওর পর্বতের মুখে দাঁড়ালেন। আবু বকর রা. আরজ করলেন—হে আদ্রাহর রাসুল, আপনি সামান্য সময় গুহার বাইরে অবস্থান করুন।

নবিজি বাইরে দাঁড়ালে আবু বকর গুহার ভেতরে ঢুকে পরিস্কার করেন এবং গর্তগুলো বন্ধ করেন; যেন বিষাক্ত কোনো বিষ নবিজিকে দংশন করতে না পারে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এভাবেই তারা নিজের জীবনের চাইতে নবিজিকে প্রাধান্য দিতেন। নবিজি সাদ্দাম্লাহু আলাইহি ওয়া সাদ্দাম তিন দিন সাওর গুহার অবস্থান করেন।

এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর সারাদিন তাঁদের দুজনের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র করা হতো, তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তারপর যখন রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসত, তখন সংবাদ নিয়ে তাঁদের কাছে যেতেন। আসমা বিনতে আবু বকর



সম্মানার্থে খাবার নিয়ে আসতেন। আবু বকর রা.-এর গোলাম আমির ইবনে ফুহাইরাহ তাঁদের কাছেই দুখালো বকরির পাল চরিয়ে বেড়াত। রাতের কিছু সময় চলে গেলে, এরপর সে বকরির পাল নিয়ে তাঁদের নিকটে যেত এবং তাঁরা দুজন দুখ পান করে আরামে রাত্রি যাপন করতেন। তাঁরা বকরির দুখ দোহন করে সাথে সাথেই পান করতেন। তারপর প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর গুহা থেকে বের হতেন। আমির ইবনে ফুহাইরা তার পিছু পিছু বকরির পাল নিয়ে বের হতেন; যেন পায়ের ছাপ (ট্র্যাক) অবশিষ্ট না থাকে।

গুহামুখে কুরাইশরা

এদিকে ভোররাতে কাকিররা নবিজির হিজরত সম্বন্ধে অবগত হলো। সাথে সাথে নবিজির তালাশে চতুর্দিকে লোক পাঠিয়ে দিলো। একদল লোক গারে সাওরের মুখ অবধি এসে পৌঁছল। তাদের পায়ের আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। নবিজির নিরাপত্তা-চিন্তায় আবু বকর অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাদের কোনো একজন যদি নিজেদের পায়ের দিকে দৃষ্টি দেয়, তাহলেই আমাদের দেখে ফেলবে।

নবিজি বললেন—আবু বকর, আমাদের দুজনের সাথে তৃতীয়জন হিসেবে আল্লাহ তায়ালা কি নেই?

আল্লাহ তায়ালা কাকিরদের চোখে পর্দা এঁটে দিলেন। তারা একবারের জন্যও গর্তের ভেতরে দৃষ্টি দিলো না। কাকিররা ব্যর্থ হয়ে নিজেদের আস্তানায় চলে গেল। তারা চলে যাওয়ার পরপরই আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিত দুটি উট নিয়ে আগমন করল। সে মুশরিক ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মদিনায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে ভাড়া করা হয়েছিল। নিরাপত্তার স্বার্থে সে পরিচিত রাস্তায় না গিয়ে সমুদ্রের উপকূল ধরে মদিনা অভিমুখে চলতে থাকল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রা. তার দেখানো পথ ধরেই উটের ওপর আরোহণ করে পথ চলতে থাকলেন।

নবিজিকে সুরাকার পঁচাত্তর

ওদিকে কাকিররা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রা.-কে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তারা ঘোষণা দিলো—যারা এই দুজনকে ধরে আনতে পারবে, প্রত্যেকের জন্য একশত করে মোট দুইশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে। সুরাকা ইবনে জুসুম মুদলিস গোত্রের এক মজলিসে বসে ছিল। এই অবস্থায়



এক ব্যক্তি হস্তদন্ত হয়ে এসে বলল—হে সুরাকা, আমি এই কেবল উপকূল ধরে ছোট্ট কাফেলা যেতে দেখলাম। আমার ধারণা, এরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সহযাত্রী হবেন।

সুরাকা বুঝতে পারল—এরাই কাকিত কাফেলা। সুরাকা পুরস্কারের লোভে মানুষকে খোঁকা দেওয়ার জন্য বলল—এরা তারা নয়, বরং তুমি অমুক অমুককে দেখছ। এরা এইমাত্র আমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। সুরাকা অল্প কিছুক্ষণ পর বাড়িতে এসে নবিজির তালাশে ঘোড়া নিয়ে বের হয়ে গেল। সুরাকা নবিজির কাছাকাছি পৌঁছার পর ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। তারপর সে শুনরায় ঘোড়ায় উঠে নবিজির এতটুকু কাছে পৌঁছে গেল যে, সে নবিজির কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছিল। আবু বকর রা. বারবার সুরাকাকে দেখছিলেন; কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবারের জন্যও তার প্রতি দ্রুক্ষেপ করেননি। এমন সময় হঠাৎ সুরাকার ঘোড়ার সামনের পা দুটি হাঁটু পর্বন্ত মাটিতে গেড়ে গেল এবং সে ঘোড়ার ওপর থেকে ছিটকে পড়ল।

সুরাকা ঘোড়াটিকে ধমক দিলো। অনেক কষ্টের পর যখন ঘোড়ার পা সোজা হয়ে দাঁড়াল, সে তখন সামনের পা দুটি যেখানে গেড়ে ছিল সেখান থেকে ধোঁয়ার মতো ধূলি আকাশের দিকে উঠতে দেখল। এ ঘটনার পর সুরাকার হৃদয় ভয়ে কম্পিত হলো। সে নবিজিকে আহ্বান করল। তিনি সুরাকার আহ্বানে সাড়া দিলেন। সুরাকা তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করল। তারপর সে নবিজির কাছে সফরের কিছু উপটোকন পেশ করল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে বললেন—আমাদের হাদিয়ার প্রয়োজন নেই; বরং তুমি শুধু আমাদের এতটুকু উপকার করো যে, আমাদের সংবাদ কারও কাছে বলো না।”

সুরাকা সেই ফিরতি পথে বাড়িতে যাওয়ার সময় অসংখ্য মানুষ তার কাছে নবিজির হাদিস জানতে চায়। সুরাকা তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কৌশলে কেটে পড়ে। যে ব্যক্তি সকালবেলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার মতো জঘন্য ইচ্ছায় বের হয়েছিল, সেই ব্যক্তি বিকেলবেলায় নবিজির নিরাপত্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

* * *



কুবায় আগমন

কুবায় প্রথম মসজিদ

কয়েক দিনের অনবরত সফর শেষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবায় পৌঁছলেন। কুবায় উপস্থিত মুসলিমরা হৃদয়ের দুয়ার খুলে নবিজিকে অভিনন্দন জানাল। আনন্দের আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল তাদের চোখে-মুখে। এই নিয়ামত অপার্থিব। পৃথিবীতে এই নিয়ামতের বিকল্প কিছু নেই। নবিজি কুবায় কুলসুম উম্মে হাদাম্মের ঘরে কয়েক দিন অবস্থান করলেন। এই কয়েক দিনে মক্কার কাকিরদের কাছে আমানত বুঝিয়ে দিয়ে আল্লা রা. নবিজির সাথে কুবায় মিলিত হলেন। সে সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদ সম্বন্ধে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُتِيَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ
فِيهِ فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿٥٧﴾

যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর,
সেটিই আপনার সালাতের জন্য বেশি উপযুক্ত।”

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার দিকে যাত্রা করেন। রবিউল
আউয়্যাল মাসের বারো তারিখ তিনি মদিনায় পৌঁছেন।”

নবিজি সাদ্লাম্‌হু আলাইহি ওয়া সাদ্লামের আগমনে মদিনায় সাজ্জ সাজ্জ রব পড়ে যায়। আবালবৃদ্ধবনিতা ঘর থেকে বের হয়ে আসে। সকলের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে আনন্দধ্বনি। মদিনাবাসী উটের লাগাম ধরার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করল। নবিজি বললেন—

তোমরা উটের লাগাম ছেড়ে দাও। এটি সেই স্থানে বসবে, যেখানে
আব্বাহ তায়লা তাঁকে বসতে আদেশ করেছেন।

উট মদিনার অসংখ্য গলি অতিক্রম করে চলতে থাকল। পেছনে কৌতূহলী মানুষের মিছিল। সকলের উৎসুক চোখ অপেক্ষায় আছে সেই মাহেক্ষণের, কার বাড়িতে মেহমান হবেন বিশ্বনবি সাদ্লাম্‌হু আলাইহি ওয়া সাদ্লাম।

অবশেষে বনু নাজ্জারের দুজন এতিম ছেলের খোলা মাঠে আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর বাড়ির সামনে উটটি বসে পড়ে। আবু আইয়ুব নবিজিকে ইসতিকবাল জানান। নবিজির সামান্যতর সযত্নে ঘরে নিয়ে রাখেন। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, নবিজির আগমনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বনু নাজ্জারের শিশুরা ঘর থেকে বের হয়ে আসে। তখন খুশিতে তারা কবিতা পাঠ করছিল—

আমরা বনু নাজ্জারের অন্তর্গত সন্তান, কী সৌভাগ্য! আমাদের প্রতিবেশী
হয়েছেন মুহাম্মাদ সাদ্লাম্‌হু আলাইহি ওয়া সাদ্লাম।

নবিজি সাদ্লাম্‌হু আলাইহি ওয়া সাদ্লাম তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা বলো তো,
তোমরা কি আমাকে ভালোবাসো?

সকলেই সমকণ্ঠে জবাব দিলো—জি, অবশ্যই।

নবিজি সাদ্লাম্‌হু আলাইহি ওয়া সাদ্লাম তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন—আব্বাহ তায়লা
জানেন, আমার অন্তরেও তোমাদের জন্য ভালোবাসা রয়েছে।

* * *





আবু আইয়ুব আনসারির ঘরে

নিচতলা নাকি ওপরতলা

সৌভাগ্যের চাঁদ আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর ঘরে উদ্ভিত হলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দোতলাবিশিষ্ট ঘরের নিচতলায় অবস্থান করাকে পছন্দ করলেন। তারপর যে মধুর বিড়ম্বনা তৈরি হয়েছিল, সেই দৃশ্য আবু বকর ইবনে আবু শাইবা, ইবনে ইসহাক এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুমুল্লাহসহ উল্লেখযোগ্য মুহাজ্জিসের জ্বানে বর্ণিত হয়েছে। আবু আইয়ুব আনসারি নবিজির কাছে আবেদন করলেন—

প্রিয়নবি, আপনার ওপর আমার মা-বাবা কুরবান হোক! আমার কাছে এই বিষয়টি খুবই অপছন্দনীয় যে, আমি আপনার ওপরতলায় অবস্থান করব। মেহেরবানি করে আপনি ওপরতলায় অবস্থান করলে ভালো হয়।

নবিজি তাকে বললেন—আমার জন্য এবং সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্য নিচতলাই উত্তম। ঘটনা এখানে খেমে থাকল না।

মধুর বিড়ম্বনা

এরপর একদিনের ঘটনা। আবু আইয়ুব আনসারি রা. বলেন—

আমরা দোতলায় থাকা অবস্থায় একদিন পানিভর্তি কলস ভেঙে গেল। আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে তড়িঘড়ি করে আমাদের একমাত্র লেপ দিয়ে সেই পানি শুষিয়ে ঘর শুকানোর কাজে লেগে গেলাম। আমরা খুবই ইতঃস্তত বোধ করছিলাম যে, পানি নিচতলায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি



ওয়া সাল্লামের ওপর পতিত হয় কি না! এই অবস্থায় আমি নিচে গিয়ে নবিজির কাছে পুনর্বীর ওপরতলায় অবস্থানের আবেদন করলাম, তখন নবিজির সানন্দে রাজি হয়ে দোতলায় তাশরিফ নিলেন।

আরেক দিনের ঘটনা—

আমরা নবিজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য রাতের খাবার পাঠাতাম। কোনো সময় খাবার বেঁচে গেলে তা ফেরত আসত। আমি এবং উম্মে আইউব খুব আত্নাহ সহকারে সেই খাবার খেতাম। খাবার সময় আমরা নবিজির হাত খাবারের যে অংশ স্পর্শ করেছে, খুঁজে খুঁজে সেখান থেকে শুরু করতাম। একদিন পৈয়াজ-রসুন দিয়ে খাবার পাকিয়ে নবিজির দরবারে পাঠানো হলো। তিনি খাবার ফেরত পাঠালেন। আমরা অনুসন্ধিসু দৃষ্টিতে নবিজির হাতের স্পর্শ খুঁজতে লাগলাম; কিন্তু দেখতে পেলাম—নবিজির খাবারে হাত স্পর্শ করেননি। আমরা চিন্তায় জড়োসড়ো হয়ে গেলাম। আমি নবিজির কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার ওপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত! আপনি আজকে খাবার পাঠিয়ে দেওয়ার পর মনে হলো, খাবার স্পর্শ করেননি। কারণ, খাবার ফেরত যাওয়ার পর আমি এবং উম্মে আইয়ুব আপনার হাতের স্পর্শ খুঁজে সেখান থেকে খাওয়া শুরু করি; কিন্তু আজকে আপনার পবিত্র হাতের স্পর্শ দেখতে পাইনি।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—আমি এই খাবারে পৈয়াজ-রসুনের গন্ধ পেয়েছি; ফেরেশতাদের কাছে এগুলোর গন্ধ কষ্টকর ও অপছন্দনীয়। ওহি নাযিল হওয়ার সময় আমাকে কানে কানে এই বিষয়ে বলে দেওয়া হয়েছে। এজন্য আমি খাবার ফিরিয়ে দিয়েছি। তবে তোমরা এই খাবার খেতে পারো।

আবু আইয়ুব আনসারি রা. বলেন—এরপর থেকে কখনো আমরা খাবারে পৈয়াজ ও রসুন দিইনি।”

* * *

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

পূর্বে (মুসলিমদের হাবশা হিজরত-সম্পর্কীয় আলোচনা) আমরা ইসলামের হিজরত নিয়ে কিছু কথা বলেছি। সেখানে মূলকথা যা ছিল—

‘আল্লাহর তায়ালা দীন ও আকিদার নিরাপত্তা, পবিত্রতাকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে রেখেছেন। যখন ইসলামি আকায়িদ এবং দ্বীনের শাআয়িরগুলো (ধর্মীয় নিদর্শন ও আসার) অস্তিত্ব সংকট ভুগবে, তখন দেশ-ভূমি-সম্পদ-প্রভাব-দাপটের কোনো মূল্য নেই। ইসলাম ও আকিদা রক্ষায় এসব কিছু বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজন হলে বিসর্জন দিতে হবে।’

সেখানে আরও বলেছিলাম—আল্লাহ তায়ালার শাস্ত বিধান এই যে, ভেতরগত শক্তি (যা সত্য দীন ও বিশুদ্ধ আকিদায় প্রতিভাত হয়) সেটা বাহ্যিক শক্তির (বহুগত শক্তি) নিরস্তা ও রক্ষক হয়ে থাকে। সুতরাং উম্মাহর অভ্যন্তরীণ শক্তি যখন সুদৃঢ় ও মজবুত হবে (অর্থাৎ, বিশুদ্ধ দীনকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরবে, নৈতিকতার ওপর আটল থাকবে), তখন তাদের বাহ্যিক শক্তিও (দেশ-দশ, ধনসম্পদ, শক্তি-দাপট) বাড়তে থাকবে, বাহ্যিক শক্তি সুদৃঢ় হতে থাকবে; কিন্তু যখন বিপরীত হবে (অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ শক্তি স্বল্প, দুর্বল ও নড়বড়ে হবে), তখন বাহ্যিক শক্তিও পতনোন্মুখ হবে। ইতিহাস যার বড়ো সাক্ষী। (ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত প্রচুর।)

এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দীন ও আকিদা রক্ষার প্রয়োজনে জান-মাল-দেশ-ভূমি—সবকিছু বিসর্জনের নিয়ম রেখেছেন। যেই বিসর্জনের মাধ্যমে পরিশেষে মুসলিমদের বাহ্যিক শক্তি—দেশ, ভূমি, ধনসম্পদ ও জীবনের সুরক্ষার নিশ্চয়তা লাভ হয়।



দলিল হিসেবে এখানে নবিজির হিজরতের ব্যাপারটাই যথেষ্ট। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেটা ছিল নিজের দেশ ও ভিটেমাটি হাতছাড়া হওয়া, মাতৃভূমি বিসর্জন দেওয়া; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা ‘বিসর্জন ও হাতছাড়া হওয়া’ ছিল না; বরং তা ছিল নিজেদের দেশ ও ভূমিতে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের কর্মপন্থা। (অনেক ব্যাপারই এমন থাকে, যার সুরক্ষার বাহ্যিক রূপ হচ্ছে, বিসর্জন দেওয়া।)

হিজরতের কয়েক বছর পরেই তিনি দুর্দান্ত শক্তিতে, অনন্যরূপ—বিরুদ্ধবাদীরা যার সামনে হাল ধরে রাখতে পারছিল না—নিয়ে একদা হাতছাড়া হওয়া মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন। যাক, এবার আমরা ফিরে আসি মূল কথায়। এখানে নবিজির হিজরতে আমাদের যেসব পাঠ রয়েছে, তা উল্লেখ করব—

০১.

এখানে যে বিষয়টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, নবিজি অন্য যে কাউকে বাদ দিয়ে সফরসজ্জী হিসেবে কেবল আবু বকরকেই নিয়েছেন। এখান থেকে আলিমসম্মণ বলেন—আবু বকরের প্রতি নবিজির গভীর ভালোবাসা ছিল, আবু বকর নবিজির বিশেষ নৈকট্য পেয়েছেন এবং নবিজির পর খিলাফতের ব্যাপারে তিনিই অধিক হকদার। এ বিষয়ে (আবু বকরের প্রতি নবিজির বিশেষ ভালোবাসা এবং খিলাফতের ব্যাপারে আবু বকরের অধিক উপযুক্ত হওয়া) আরও প্রচুর দলিল রয়েছে। যেমন—

❖ এক. নবিজি সাদ্লাম্মাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুকালীন অসুস্থতায় অন্য সব সাহাবিকে বাদ দিয়ে কেবল তাকেই ইমামতির দায়িত্ব দিয়েছেন।

❖ দুই. নবিজি আবু বকরের ব্যাপারে বলেছিলেন—

لو كنت متخذا خليلا لا اتخذت أبا بكر خليلا

‘আমি যদি কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম।’^{১০০}



এসব বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও আবু বকর রা ছিলেন, নবিজির নিরেট নির্ভেজাল সজ্জী; বরং তিনি ছিলেন তাঁর জন্য উৎসর্গপরায়ণ। তিনি নবিজির জন্য নিজেকে কতটা উৎসর্গ করেছেন! আমরা জেনেছি—হেরা গুহায়, যেখানে সাপ-বিচ্ছুর উপদ্রবসহ নানা বিপদের অশনিসংকেত ছিল, কীভাবে তিনি আগে ঢুকে নিজেকে উৎসর্গ করতে চেয়েছেন। আমরা আরও দেখেছি, হিজরতের কণ্টকময় সফরে নবিজির সাহায্যার্থে নিজের ধনসম্পদ, ছেলেমেয়ে, গোলাম-রাখাল সবকিছু কীভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। দ্বীনের শপথ করে বলছি—নবিজিকে আবু বকর রা. যেমন ভালোবেসেছেন, নবিজির প্রতি প্রত্যেক মুসলিমেরই সে রকম ভালোবাসা থাকতে হবে। দ্বীনের প্রপ্লে এটা খুব জরুরি। এই কারণেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين^১

‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, তার সম্বানসম্পত্তি এবং সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হবো।’^২

০২.

একটি প্রশ্ন : কেউ কেউ আবার নবিজির হিজরত ও উমর রা.-এর হিজরত—এ দুটোর মাঝে মুকারানা (ভুলনা) করে ভুল করতে বসে। তাদের প্রশ্ন—উমর রা. যখন হিজরতে করেছেন, তখন তিনি কোনো ভয়-শঙ্কা ছাড়াই প্রকাশ্যে, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে হিজরত করেছেন; কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করেছেন লুকিয়ে লুকিয়ে, নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করে! তাহলে কি উমর রা. নবিজির চেয়ে বেশি সাহসী ছিলেন!...

উত্তর : উমর রা.-সহ অন্য যেকোনো মুসলিমের তাসারবুফ (আচরণ ও কার্যাবলি) নিতান্তই ব্যক্তিগত; যা শরিয়তের কোনো দলিল নয়। অন্যদের ব্যাপারটা যেহেতু নিতান্তই ব্যক্তিগত, তাই ব্যক্তি তার মতো করে সেক্ষেত্রে উপযোগী বিভিন্ন ওয়াসাইল-মাধ্যম, শৈলী ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু

নবিজির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি হচ্ছেন ‘মুশাররি’ (শরিয়তের বিধানপ্রণেতা)। অর্থাৎ ধীনের সাথে সম্পৃক্ত তাঁর সব তাসারুফাত (আচরণ ও কাজ) আমাদের জন্য ‘তামারি’ (প্রণীত বিধান)। এ কারণেই তো নবিজির সুন্নাহ; এটি ইসলামের মূল দ্বিতীয় উৎস। হিজরতের ক্ষেত্রে নবিজিও যদি উমরের মতো প্রকাশ্যে করতে যেতেন, তাহলে অনেকেই ভাবত, সেটা ওয়াজিব বা আবশ্যিক। তাই হিজরতের ক্ষেত্রে (ভয়ের ব্যাপার নিশ্চিত হলেও) কোনো কৌশল, কোনো সতর্কতা অবলম্বন জায়িজ নেই। সময়ের ভাষা ও সময়ের উপযোগী কর্মপন্থায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর শরিয়তের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা রেখেছেন।

এ কারণেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকুগত প্রত্যেক (সময়ের ভাষা ও কর্মপন্থা উপযোগী) আসবাব ও মাধ্যম গ্রহণ করেছেন। হাতের কাছে পাওয়া সবগুলো মাধ্যমই তিনি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট ছিলেন। হিজরতের সময় আলি রা.-কে নিজ চাদরে ঢেকে বিছানায় রেখে যান। আমিন (নিরাপত্তার ধারক) নিযুক্ত হওয়ার পর একজন মুশরিককে পথপ্রদর্শক বানিয়েছেন; যে তাকে সাহায্য করবে, নিরাপদ পথে চালনা করবে, শত্রুদের বিপৎসংকুত শাখাপথ দিয়ে তাঁকে নিয়ে যাবে। হেরা গুহায় তিন দিন আত্মগোপন করে থাকেন। এর মানে আসবাব গ্রহণ ও সতর্কতা অবলম্বনের কোনো কিছুই তিনি বাদ রাখেননি। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান বকুগত আসবাবকে (উপায় উপকরণ ও মাধ্যমকে) গ্রহণ করতে মানা করে না।

তবে হিজরতের সময় নবিজির এই আসবাবগ্রহণ ব্যক্তিগত ভয়ের কারণে নয়, অথবা তিনি মুশরিকদের হাতে আটকে যাবেন, এই শঙ্কার কারণেও নয়। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ, নবিজি যখন বকুগত সব আসবাব গ্রহণ করে ফেলেছেন, মুশরিকরা নবিজির গুহার একদম নিকটে—এতটাই নিকটে যে, শত্রুদের কেউ পায়ে দিকে তাকালে নবিজি ও আবু বকরকে তারা দেখে ফেলত—এম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এমন নিদারুণ মুহূর্তে নবিজি একদম নিশ্চিন্ত হয়ে আবু বকর রা.-কে অভয় দিয়ে বলছিলেন—

يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما ۝

আবু বকর, যে দুজনের সাথে তৃতীজন হিসেবে আল্লাহ আছেন,
তাঁদের আবার ভয় কীসের?



খিকহুস সিরাহ

বাহাদুর্গিতে তাঁর এই আসবাব গ্রহণের অর্থ ছিল, এই বিপৎসংকুল মহূর্ত্তে তিনি ভড়কে যাবেন; কিন্তু না, তিনি ভড়কে যাননি।

আরেকটা বিষয় এখানে লক্ষণীয়—নবিজির সতর্কতা অবলম্বন ও আসবাব গ্রহণের সবগুলো পর্যায় শেষ হয়ে এলে নিরোট আল্লাহর ওপর ভরসা রাখেন।

এখানে আমাদের শেখার যা, প্রত্যেক কাজেই কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করা উচিত। তবে এটা সবব গ্রহণ করতে মানা করে না। নবিজি আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ ভরসা করেছেন, কিন্তু তা সব আসবাব গ্রহণের পর।

এক্কেত্রে আরও সুস্পষ্ট দলিল হলো—অশুভ ইচ্ছায় কাফির সুরাকা যখন নবিজির একদম নিকটবর্তী হয়েছিল, তখন এই ভয়াল পরিস্থিতিতে নবিজির কিছু হলেও ভয় পাওয়া, ভড়কে যাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু না, তিনি ভয় পান নি; তিনি বরং তিলাওয়াতুল কুরআনে এবং মোনাজাতে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি ভালো করেই জানতেন, যেই আল্লাহ তাঁকে হিজরতের আদেশ দিয়েছেন, তিনিই তাঁকে কাফিদের চক্রান্ত থেকে হিফাজত (যেমনটা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন) করবেন।

০৩.

নবিজি কর্তৃক আলি রা.-কে ওদিয়েতের মাল (গচ্ছিত সম্পদ বা আমানত) আদায় করার জন্য রেখে যাওয়া;—এ থেকে আশ্চর্য ধরনের বিপরীত একটা বিষয় প্রকাশ পায়। যেই কাফির-মুশরিকরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত, তাঁর সাথে প্রতারণা করত, তাঁকে জাদুকর বলেত, তারাই আবার তাঁকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও উত্তম জেবে তাঁর কাছে ওদিয়েত রাখত! তাঁকে নিরাপদ ভেবে তাঁর কাছে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখত। এখান থেকে বোঝা যায়—তাদের কুফরিটা সত্যের ব্যাপারে তাদের সন্দেহের কারণে নয়; বরং তা তাদের অহংকার, বড়োত্ব ও বড়াইয়ের কারণে। নেতৃত্ব ও প্রভুত্ব খতম হয়ে যাওয়ার ভয়ের কারণে।

০৪.

এখানে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকরের উদ্যম লক্ষণীয়। আবদুল্লাহ মক্কা ও হেরা গুহায় আসা-যাওয়া করতেন। নবিজি ও পিতার কাছে কাফিরদের হালচাল সম্পর্কে সংবাদ দিতেন। আর তার বোন আসমা রা.—যে তার বাবা ও নবিজির

সফরের প্রস্তুতির জন্য বিরাট শ্রম করেছেন—তার অবদান কোনো অংশেই কম নয়।

এখানে মুসলিমদের (পুরুষ হোক বা নারী) জন্য ইসলামের শাখত আদর্শ বাস্তবায়ন, ইসলামি সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে বিশাল শিক্ষা রয়েছে। নিজের চেষ্টা-পরিশ্রম শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। শুধু নিজেকে নিয়ে থাকা, নিজের ইবাদতে নিমগ্ন থাকা চলবে না।

ইসলামের পথে নিজের উদ্যম ও সামর্থ্যের সবটুকুই ব্যয় করবে। প্রত্যেক কালে প্রত্যেক যুগেই এটাই মুসলিম যুবকদের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। আপনি যখন নবিজির দাওয়াতি কার্যক্রম ও জিহাদ ইত্যাদিতে নবিজির পাশে থাকা লোকজনকে নিয়ে ভাবতে যাবেন, তখন দেখবেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন টগবগে যুবক—যারা তাদের যৌবন বয়সের প্রথম পর্বও পাড়ি দেননি। তারা ইসলাম ও ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চেষ্টায় কোনো কসুর করেননি।

০৫.

এখানে সুরাকা তার সুরাকার বোড়ার যেই ঘটনা, এটা নবিজির অনন্য মুজিজা। মুহাদ্দিসগণের সবাই—যারা তার সমর্থন করেছেন, অনেকে বর্ণনা এনেছেন, এবং তার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। (এ ছাড়া নবিজির অন্যান্য মুজিজা তো আছেই।)

০৬.

নবিজির হিজরত পর্বে সবচেয়ে বড়ো মুজিজা হলো—অবিখ্যাস্য রকমে নবিজির সুরক্ষা। নবিজিকে হত্যার জন্য মূশরিকরা যখন চারদিক থেকে বেটন করে রেখেছিল, তখন হঠাৎ তাদের চোখে ধুম চাপিয়ে দেওয়া হলো। নবিজি এই ফাঁকে বের হয়ে চলে গেলেন, তারা একটু টেরও পেল না। তাদের ষড়যন্ত্রে তারা শুধু ব্যর্থ হয়েছে তা-ই নয়; সেই সঙ্গে তারা লজ্জাও উপহার পেয়েছে। নবিজি বের হওয়ার সময় মাটি নিক্ষেপ করলে তা তাদের ধুলোমলিন করে দেয়। নবিজি যখন তাদের থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি এই আয়াত পড়তেছিলেন—

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا



আর আমি তাদের সামনে এক অস্ত্রাল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি এবং পেছনেও এক অস্ত্রাল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি; আর এভাবে তাদের সব দিক থেকে ঢেকে দিয়েছি। ফলে তারা কোনো কিছুই দেখতে পায় না।”

নবিজির এই মুজিজা প্রত্যেক যুগের মুশরিক ও অন্যান্যদের জন্য স্পষ্ট পয়গাম—নবিজি ও তাঁর অনুসারীরা অল্প কিছু কাল যেই পরাজয় ও নানান শাস্তিতে ভোগেন—এর মানে এটা নয় যে, আল্লাহ তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, বিজয় তাদের থেকে বহুদূরে। ওইসব মুশরিক এবং ইসলামের শত্রুরা—যারা ইসলামের পরাজয়ে দারুণ খুশি হয়—তারা যেন এ কথা ভুলে না যায় যে, আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। বিজয়ের সব উপকরণ যেকোনো মুহূর্তেই কার্যকর হতো পারে।

০৭.

এখানে আমরা নবিজির প্রতি মদিনার নারী, পুরুষ, শিশুনির্বিশেষে সকলের উপচে পড়া ভালোবাসা ও উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পেরেছি। তারা প্রতিদিন মদিনার বাইরে এসে নবিজির জন্য অপেক্ষা করতেন। অপেক্ষার পালা শেষ হওয়ার পর নবিজি যখন তাদের কাছে পৌঁছলেন, তখন তারা নবিজিকে উপচে পড়া ভালোবাসায় সিক্ত করছিলেন। নবি আগমনের আনন্দের আতিশয্যে তারা বিভিন্ন কবিতা, প্রশংসাগাথা উচ্চারণ করছিলেন। নবিজিও তাদের সাথে ভালোবাসা বিনিময় করছিলেন। তিনি বনু নাজ্জারের ছোটো ছোটো মেয়েদের—যারা তাঁর প্রশংসায় গান গেয়ে আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল—দিকে তাকিয়ে বললেন—

أحبينني؟ والله إن قلبي ليحبكن

তোমরা কি আমাকে ভালোবাসো? আল্লাহর শপথ! আমার হৃদয় তোমাদের ভালোবাসে।

এইসব থেকে আমরা বুঝতে পারি—নবিজির ভালোবাসা হৃদয়ের গহিনের প্রকৃত ভালোবাসা আর এটাই তাঁর অনুসরণের মূলভিত্তি। কারণ, হৃদয়ের প্রকৃত ভালোবাসাটাই। কোনো কিছুর অনুসরণের প্রেরণাদায়ক।

কারণ অনুসরণ—এটা কোনো একটি মানদণ্ডের কারণেই হয়। আর সেই মানদণ্ডটা হবে হৃদয়ের প্রকৃত ভালোবাসা। এ কারণেই নবিজি তাঁর প্রতি (প্রকৃত) ভালোবাসা রাখাকে—যেই ভালোবাসা সন্তান পিতার ভালোবাসাকেও হার মানাবে—ইমানের মানদণ্ড বানিয়েছেন। এখান থেকে বোঝা গেল, নবিজির ভালোবাসা এটা বাবা-সন্তানের ভালোবাসার প্রকারভূত। অর্থাৎ উভয়টিরই উৎস হচ্ছে হৃদয়ের গহিন থেকে প্রকৃত ভালোবাসা।

০৮.

আবু আইয়ুব আনসারির ঘরে নবিজির অবস্থান গ্রহণ—এটাও নবিজির প্রতি সাহাবিদের ভালোবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত। এখানে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা বিষয় হলো—আবু আইয়ুব আনসারির ঘরে খাবারের পর নবিজি যখন অতিরিক্ত অংশ ফিরিয়ে দিলেন, তখন আবু আইয়ুব ও তার স্ত্রী পাত্র লাগা নবিজির আঙলের ছোঁয়া থেকে বরকত নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

এখান থেকে বোঝা গেল, নবিজির আসারের (বিভিন্ন নিদর্শন ও স্মারক) মাধ্যমে বরকত নেওয়া স্বীকৃত ও মাপ্য তথা শরিয়তসম্মত বিষয়। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম এ ব্যাপারে ভিন্ন বর্ণনা এনেছেন। সাহাবায়ে কেয়াম নবিজির বিভিন্ন আসারের বরকতের উসিলায় রোগমুক্তি, সাহায্য ইত্যাদি কামনা করতেন।

ইমাম বুখারি ‘কিতাবুল লিবাসে’ (পোশাক পরিচ্ছদের অধ্যায়) উন্মে সালামা রা. থেকে বর্ণনা এনেছেন—উন্মে সালামা রা. নিজের পাত্রবিশেষে নবিজির চুল সংরক্ষণ করে রাখতেন। সাহাবায়ে কিরামের কারণে চোখের পীড়া হলে বা অন্য কোনো অসুখ হলে তারা উন্মে সালামার নিকট পানিভরা পাত্র পাঠাতেন। উন্মে সালামা নবিজির চুলগুলো সেই পাত্রের পানিতে রাখতেন। এরপর তারা রোগ থেকে নিরাময়ের জন্য এই বরকতপূর্ণ পানির ওসিলা নিতেন।

ইমাম মুসলিম ‘কিতাবুল ফাজায়িল’ (ফজিলতের অধ্যায়)—এ একটি বর্ণনা এনেছেন। নবিজি সাম্রাজ্যে আল্লাহি ওয়া সাম্রাজ্য উন্মে সুলাইমের ঘরে ঢুকতেন। এরপর তার বিছানায় ঘুমাতে। উন্মে সুলাইম তখন ঘরে থাকতেন না। (সেই ধারাবাহিকতায়) নবিজি একদিন তার ঘরে এসে তার বিছানায় ঘুমালেন। হঠাৎ উন্মে সুলাইম ঘরে এলেন। নবিজির শরীর থেকে তখন ঘাম বরছিল। এরপর উন্মে সুলাইম তার ‘আতিদ’ (নারীসামগ্রী রাখার বস্ত্র বিশেষ) খুলে (তা থেকে



কিছু বের করে সেটা দিয়ে) ঘাম মুছে তা বোতলে সংরক্ষণ করছিলেন। নবিজি হঠাৎ টের পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—উম্মে সুলাইম, তুমি এ কী করছ? তিনি বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, শিশুদের জন্য আপনার (ঘামের) বরকত নেওয়ার আশা করছি। তখন নবিজি বললেন—তুমি ঠিক করোহ।”

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম-এর বর্ণনা : নবিজির অঙ্গুর পর থাকা অবশিষ্ট পানি নেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরামে প্রতিযোগিতা করতেন।” এ ছাড়াও নবিজির জামা, পাত্র ইত্যাদি থেকে সাহাবায়ে কিরামের বরকত নেওয়ার প্রচুর বর্ণনা রয়েছে।

এখানে তাওয়াসসুলকে (ওসিলা গ্রহণ) তাবাররুকের (বরকত নেওয়া) ওপর কিয়াস (প্রয়োগ) করা হচ্ছে—এটা ভাববেন না। কিয়াসের কোনো দখল নেই এখানে। কারণ, তাওসসুল এবং তাবাররুক দুটি ভিন্ন শব্দ। যদিও দুটি একই অর্থ—মুতাওয়াসসাল বিহির (যাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়) বরাতে কল্যাণ ও বরকত লাভ করা বোঝায়। আল্লাহর নিকট থাকা নবিজির মহিমা, নবিজির বিভিন্ন আছার—কাপড়, নবিজির ব্যবহৃত কিছু মাধ্যমে ওসিলা গ্রহণ করা ‘ফরদি ও জুজ্বয়ি’ (অংশবিশেষ) বিষয়। যোগুলো সহিহ হাদিসে প্রমাণিত মুতলাক (মূল) তাওয়াসসুলের আওতাভুক্ত। কারণ, প্রত্যেক জুজ্বয়ি বিষয়ই

২৪৪ সহিহ মুসলিম, বক : ১, পৃষ্ঠা : ৮৩

২৪৫ শাইখ আলবানি মনে করেন, এ যুগে এ ধরনের হাদিসের কোনো কারণ নেই। উসতাদ মুহাম্মাদ আল মুনতানির আল কাভানি কর্তৃক কুজিরাতুশ শারিয়্যার (শরিয় অনুবদ) ছাত্রদের জন্য নির্বাচিত হাদিসের সমালোচনায় এ কথা উল্লেখ করেছেন।

আমি মনে করি এ ধরনের কথাবার্তা ভয়ানক। একজন মুসলিমের পক্ষে বলে বেড়ানো কখনোই উচিত নয়। (শরিয়তের ব্যাপারে) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব কথা, সব কাজ, সব স্বীকারোক্তিই ‘তাশরি’ (শরিয়তভূত)। কিতাবুন্নাহ বা সুন্নাহ নসখ না করলে তাশরির এ বিষয়টা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান। আর এসব সহিহ ও প্রমাণিত হাদিসকে এগুলোর সমমানের কিতাব বা সুন্নাহর কোনো কিছু নসখ করেনি। সুতরাং এর ব্যাপারটা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। অর্থাৎ নবিজির বিভিন্ন আসারের মাধ্যমে ওসিলা ও বরকত গ্রহণে কোনো বাধা নেই। এই ‘মাসনু’ এটা সবকালোই সমানভাবে চলমান। সুতরাং কীভাবে কল্যাণ সন্তব হলো—‘এ যুগে এর কোনো কারণ নেই?’

আমার খুব খারশা হচ্ছে, এটা যেহেতু তাওয়াসসুলের ক্ষেত্রে তার মাফক্বের বিরুদ্ধে যায়, তাই আমি এটাকে অস্বীকার করেছি...

এখানে একটা বিপরীতমুখী লক্ষ্য করার মতো, এইসব বহুসংখ্যক আসারের মাধ্যমেই যদি ওসিলা নেওয়া যায় অর্থাৎ এগুলোকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা যায়, তাহলে নবিজির মর্যাদা ও মহৎ অবস্থান (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)—এর মাধ্যমে ওসিলা আরও অলোভ্যতাই নেওয়া যাবে।



উসুলবিদদের নিকট প্রচলিত ‘তানকিহুল মানাত’-এর নিয়ম অনুসারে নসের (মূলপাঠ) ব্যাপকতার মধ্য দাখিল (অন্তর্ভুক্ত)।

হিজরতের পাঠ সম্পর্কীয় আলোচনার ইতি এখানেই টানছি। সামনে আরও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা—নবিজি কর্তৃক মদিনায় নতুন রাষ্ট্রগঠন ও নতুন সমাজ বিনির্মাণ—শুরু করতে হবে।

* * *





চতুর্থ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মদিনায় নবিজির হিজরতের পর থেকে গাজওয়ায়ে বদরের আগপর্যন্ত সময়ের ঘটনাগুলো। অধ্যায়টি মোটামুটি সংক্ষিপ্তই বলা যায়। সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে যা আলোচনার এসেছে, তা এমন—

- নবিজির হিজরতপরবর্তী কর্মকাণ্ডে ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্ভব-ইজতিহাদ, একটি নতুন ইসলামি সমাজের বুনியাদ তৈরি, মসজিদ নির্মাণ, ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজে মসজিদের গুরুত্ব কী।
- আনসারদের সাথে মুহাজির সাহাবিদের ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি, মুসলিম পরিচয়ই আত্মীয়তার পরিচয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং এগুলো নিয়ে বিভিন্ন শরয়ি আলোচনা।
- মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে চুক্তিপত্র প্রণয়ন, মদিনা সনদের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো, ইসলাম কি শুধু ব্যক্তিজীবনের ধর্ম নাকি সামগ্রিক জীবনের, এই সকল বিষয়ের নাতিদীর্ঘ আলোচনা।



প্রথম বুনিয়াদ : মসজিদ নির্মাণ

ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্ভব-ইঙ্গিত

নবিজি সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদিনার হিজরত—এটি ওই সময় পৃথিবীর বুকে প্রথম ‘দানুল ইসলাম’ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। তা এই কথার ঘোষণা ছিল যে, প্রথম স্থাপতি মুহাম্মাদ সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে প্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের উদয় হতে যাচ্ছে।

এ লক্ষ্যে রাসূল সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাথমিক যে কাজগুলো করেছেন, তা হলো—রাষ্ট্রের মূলভিত্তিগুলো স্থাপন করেছেন। ভিত্তিগুলো প্রস্তুতিত হয় নিম্নোক্ত তিনটি পয়েন্টে—

- ০১. মসজিদ নির্মাণ;
- ০২. ব্যাপকভাবে মুসলিমদের মাঝে এবং বিশেষভাবে মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের মাঝে ভাতৃত্ব-বন্ধন সৃষ্টি করা;
- ০৩. একটি সংবিধান প্রণয়ন করা—যা মুসলিমদের নিজেদের ভেতর পারস্পরিক আচরণবিধি, ব্যাপকভাবে সকল মানুষের সাথে এবং বিশেষত ইহুদিদের সাথে তাদের কর্মপন্থা কী হবে, তা নির্ধারণ করে দেয়।

মসজিদ নির্মাণ

আমরা প্রথমে মসজিদ নির্মাণের পয়েন্টেই আলোচনা শুরু করব। ইতঃপূর্বে হিজরতের ঘটনায় আমরা আলোকপাত করেছি—রাসূল সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটনী আনসারি দুজন এতিম বালকের জমিতে হাঁটু গেড়ে বসে যায়।



বিক্রম সিরাহ

অন্যদিকে আসআদ ইবনে জুরার রা. রাসুলের হিজরতের পূর্বেই ওই জমিতে অন্য সাহাবিদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই জমিতে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন এবং বালক দুটিকে ডেকে পাঠালেন। তখন তারা আসআদ ইবনে জুরারার তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে জমি নিয়ে দরাদরি করলেন। তারা বলল—‘আমরা বরং তা আপনার জন্য দান করে দিলাম।’ কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে অবশেষে দশ দিনার মূল্যে তাদের থেকে জমিটা ক্রয় করে নিলেন।^{২৪৬}

সেই জমিতে কিছু গারকাদ গাছ, কয়েকটা খেজুরগাছ এবং মুশরিকদের প্রাচীন কিছু কবর ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরগুলো খনন করা ও গাছগুলো কেটে ফেলার আদেশ দিলেন এবং মসজিদের কিবলার দিকে সারিবদ্ধ করে রেখে দিলেন। মসজিদের দৈর্ঘ্য ছিল একশত গজ, প্রস্থও ছিল এমনই বা কিছুটা কম।

এরপর তারা কাঁচা ইট বানালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের সাথে সশরীরে নির্মাণকাজে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ হাতে পাথর স্থানান্তর করেন।

মসজিদের কিবলা নির্ধারণ করা হয়েছিল বাইতুল মাকদিসের দিকে। খেজুরগাছের খুঁটির ওপর খেজুর পাতা ও শাখা দিয়ে ছাদ নির্মাণ করা হয়েছিল। তখন কেউ কেউ বলেছিল—আমরা কি মজবুত ছাদ বানাতে পারি না?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, মুসা আ.-এর ছাউনির মতোই রেখে দাও, যা কিছু লাকড়ি ও সাধারণ পত্রেপত্রে দ্বারা তৈরি হয়েছিল; এর মর্যাদা অনেক বেশি।^{২৪৭} আর তার মেঝেতে বালু ও কঙ্কর বিছানো ছিল।

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত—

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মসজিদ নির্মাণের আগে) যেখানেই সালাতের সময় হতো, সেখানেই সালাত আদায় করে নিতেন; এমনকি ভেড়ার পালের মধ্যেও সালাত আদায় করতেন। এরপর তিনি মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। তাই বনু নাজ্জারের নেতাদের কাছে লোক পাঠান।

২৪৬ সহিহ বুখারি, বঙ্ক : ৪, পৃষ্ঠা : ২৫৮; তাবাকাতু ইবনি সাদ, বঙ্ক : ৩, পৃষ্ঠা : ৪; ইলামুল সাল্লিন : ২২৩

২৪৭ তাবাকাতু ইবনি সাদ, বঙ্ক : ২, পৃষ্ঠা : ৫

তারা এসে উপস্থিত হলে তিনি তাদের অনুরোধ করে বলেন—হে বনু নাজ্জার, তোমাদের এই জমিটুকু আমাকে মূল্যের বিনিময়ে দিয়ে দাও।

তারা বললেন—না, আল্লাহর শপথ! আমরা এর বিনিময় শুধু আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে নেব।

আনাস ইবনে মালিক বলেন—মুশরিকদের কিছু কবর, খানাখন্দ এবং কিছু খেজুরগাছ ছিল। রাসূল সাদ্লাম্মাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরগুলো খনন করার, গর্তগুলো সমান করার এবং গাছগুলো কেটে ফেলার আদেশ দিলেন।

আদেশ বাস্তবায়ন করা হলো এবং গাছগুলো মসজিদের কিবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে রেখে দেওয়া হলো। দুই দিক দিয়ে পাথর অঙ্কিত করে দেওয়া হলো। সাহাবায়ে কিরাম ‘রজয’ ছন্দে কবিতা পড়তে পড়তে পাথর টানতে লাগলেন; তাদের সঙ্গে রাসূল সাদ্লাম্মাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও, শরিক ছিলেন। তারা বলছিলেন—

হে আল্লাহ আখিরাতের সুখ ছাড়া কোনো সুখ নেই; আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দেন।—

এই মসজিদ আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর খিলাফত পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন ও মেরামতহীন আপন অবস্থায় অটুট ছিল। উমর রা. এসে কিছুটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। তবে রাসূলের গঠনের মতোই তার খুঁটি ও ছাদ গাছের পাতা ও শাখা দিয়ে দেন। অতঃপর উসমান রা. এসে তাতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন। মসজিদের কলেবর বৃদ্ধি করেন এবং পাথর ও চুনা দিয়ে তার দেওয়াল অঙ্কিত করেন।—

* * *



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষা ও নির্দেশনাগুলো অর্জন করতে পারি—

এক. ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজে মসজিদের গুরুত্ব

রাসূল সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমন করে খিটু হওয়ার পরপরই একটি সংহত ও সুদৃঢ় ইসলামি সমাজ গঠনে প্রবৃত্ত হন; মদিনায় সমবেত আনসার ও মুহাজিরদের মাধ্যমে যা অস্তিত্বশীল হবে। এ লক্ষ্যে একেবারে প্রথম যে পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন, তা হলো মসজিদ নির্মাণ।

এতে আশ্চর্য বা বিস্ময়ের কিছু নেই। অবশ্যই ইসলামি সমাজ গঠনের জন্য প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো মসজিদ নির্মাণ করা। কেননা, ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র সংহতি ও দৃঢ়তার গুণ অর্জন করতে পারবে তখনই, যখন তা ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস, নিয়মকানুন এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরবে। আর এসব কিছুর ঝরনাথারা তো মসজিদ ও তার ঐশী চেতনা থেকেই প্রবাহিত হয়।

ইসলামের একটি নীতি ও নিয়াম হলো—মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বতের বন্ধন তৈরি করে দেওয়া। এই নীতি বিস্তৃত করা মসজিদ ব্যতীত সম্ভবপর নয়। কেননা, মুসলিমগণ অর্থসম্পদ ও ক্ষমতায় বিভিন্ন স্তরে বিভাজিত, তাই দৈনিক কয়েকবার যদি আল্লাহ তায়ালায় কোনো ঘরে একত্র না হয়, তাহলে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও সহানুভূতিশীলতা তৈরি হবে না।

ইসলামের আরও একটি নীতি ও নিয়াম হলো—মুসলিমদের মাঝে সমস্ত পরিস্থিতি ও স্থানে ইনসায়ফ ও সমতার চেতনা প্রদীপিত করা। কিন্তু এই চেতনা তাদের মাঝে



ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তারা নিত্যদিন একই মাটিতে তাদের রবের সামনে তাঁর গোলামি স্বীকার করে, তাঁর সাথে সকলের অন্তর সংযুক্ত করে একই কাতারে দাঁড়িয়ে পরস্পর সাক্ষাৎ করবে। অন্যথায় মুসলিমরা এই সমাবেশ ও অংশগ্রহণ ছাড়া যতদিন তাদের ঘরে ঘরে একা একা ইবাদত করবে, ততদিন সমাচ্ছে স্বার্থপরতা, আত্মসত্তারিতা ও অহমিকার ওপর সমতা ও ইনসাকের চেতনা বিজয় লাভ করবে না।

ইসলামের অন্যতম নীতি ও নিয়াম হলো—আল্লাহ তায়ালার রশি তথা শরিয়ত ও আদেশের সামনে সুসংহত ঐক্যবন্ধভাবে এক পায়ে সকল মুসলিমদের কিংলিত হওয়া; কিছু যতদিন পর্যন্ত সমাচ্ছে আনাচে-কানাচে মুসলিমদের ধীন ও শরিয়তের দীক্ষা লাভ করার জন্য মসজিদ তৈরি না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের ঐক্য বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হবে; প্রবৃষ্টি ও কামনার তাড়নায় খুব দ্রুতই তারা বিভক্তির বেড়াঙ্কালে আবদ্ধ হয়ে যাবে।

এ সমস্ত চেতনা মুসলিমদের মাঝে প্রচ্ছলিত ও বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমেই মসজিদ নির্মাণের প্রতি তৎপর হয়েছেন।

দুই. নাবালক শিশু ও এতিমদের সাথে ব্যবহার নীতি

হানাফি মাজহাবের উলামায়ে কিরাম উক্ত হাদিস দ্বারা নাবালকের হস্তক্ষেপ শূন্য হওয়ার দলিল দিয়েছেন। তারা বলেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে জমিটুকু এতিমদ্বয় থেকে দরদাম করে ক্রয় করেছেন। অতএব, যদি তাদের হস্তক্ষেপ শূন্য না হতো, তাহলে তিনি তাদের থেকে তা ক্রয় করতেন না।

অন্যদিকে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম তাদের হস্তক্ষেপ শূন্য না হওয়ার ব্যাপারে মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের দলিল হলো, আল্লাহ তায়ালার এই বাণী—

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ

বালক হওয়ার আগে ন্যায়সম্মত ব্যতিরেকে তোমরা এতিমদের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না।

আর জমি কেনার হাদিসের ব্যাপারে তারা দুটি উত্তর প্রদান করেন—

- ০১. ইবনে উয়াইনাহ'র একটি বর্ণনায় আছে—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অভিভাবক চাচার সাথে কথা বলেছেন এবং তার মাধ্যমে তাদের থেকে ক্রয় করেছেন।^১ এমন হলে তো হানাকি উলামায়ে কিরামের এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা সহিহ হবে না।
- ০২. এ ধরনের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্তৃত্ব আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মুসলিমের সাধারণ অভিভাবক হিসেবে এই লেনদেন করেছেন; মুসলিমদের অন্তর্গত একজন হিসেবে নয়।

প্রাচীন কবরে মসজিদ নির্মাণ : একটি মাসয়লা

প্রাচীন কবর খনন করার অনুমতি এবং তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সেখানে মসজিদ বানানোর তথ্যের এই হাদিসের টিকায় ইমাম নববি রহ. বলেন—

উক্ত হাদিসে প্রাচীন কবর খনন করার অনুমোদন পাওয়া যায়। পাশাপাশি তাদের রক্ত-পুঙ্খমিশ্রিত মাটি আলাদা করে সেখানে সালাত আদায় করা এবং সে জমি পবিত্র হয়ে গেলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার অনুমোদনও পাওয়া যায়।

অধিকন্তু হাদিসের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে জমিতে লাশ দাফন করা হয়েছে এবং তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তা যদি ওয়াকফূত না হয়, তাহলে তার মালিকের মালিকানায় অবশিষ্ট রয়ে গেছে এবং তা বিক্রি করা জাযিজ; তার উত্তরাধিকাররা সে জমির অধিকারী হবে।^২

অন্যদিকে ইতিহাসবিদ উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করেছেন—

এই জমিতে যে কবরগুলো ছিল, তা ছিল অনেক প্রাচীন এবং নিশ্চিহ্ন। সে হিসেবে এখানে রক্ত ও পুঙ্খের কল্লানাও আসে না। তথাপি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা খনন করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ধ্বংসাবশেষ বের করে ফেলার আদেশ দিয়েছেন।

স্মরণ্য যে, প্রাচীন কবর খনন করা এবং তার স্থলে মসজিদ বানানো—এই হুকুম ওই জমির ব্যাপারে, যা ওয়াকফকৃত নয়। অন্যথায় যে কাজের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে, তা ছাড়া অন্য কাজে পরিবর্তন করা জারিজ নেই।

তিন. মসজিদ নির্মাণ, মসজিদে নকশা ও কারুকার্যের বিধান

‘তাশয়িদ’ বলা হয় পাথর প্রভৃতি—যা দ্বারা স্তম্ভ, দেওয়াল ও ছাদ সুদৃঢ় হয়। এগুলো দিয়ে মসজিদের ইমারত বানানো। আর নকশা ও কারুকার্য হলো, মূল অবকাঠামোর ওপর যে সাজসজ্জা করা হয়।

তাশয়িদের হুকুম : সমস্ত উলামায়ে কিরাম এটাকে জারিজ বলেছেন এবং উত্তম বলে গণ্য করেছেন। উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদ পুনর্নির্মাণ—এটা তাদের দলিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও নিজে এ কাজ করেননি, কিছু তাঁর না করা বিপরীত অর্থ, অর্থাৎ তাশয়িদ ও সুগঠিতকরণ নিষেধ বোঝায় না। কেননা, এর সাথে মসজিদ নির্মাণের মৌলিক কোনো দর্শনের বিরোধিতা তৈরি হয় না। উপরন্তু এর দ্বারা আল্লাহর নির্দর্শনাবলির প্রতি মনোযোগ ও যত্ন বৃদ্ধি পায়। তাই তাকে নিষেধ করার কোনো সুযোগ নেই।

উলামায়ে কিরাম এর পক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও দলিল দেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন—

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

আল্লাহর মসজিদ তরাই বিনির্মাণ করে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখে ৷

উক্ত আয়াতে ‘ইমারত’ শব্দমূল ব্যবহার করা হয়েছে; আর তার অর্থ তখনই বাস্তবায়ন হয়, যখন তাশয়িদ ইত্যাদি দ্বারা সুগঠিত করে তার যত্ন নেওয়া হয়।

নকশা ও কারুকার্যের হুকুম

উলামায়ে কিরাম সকলেই একমত যে, নকশা ও কারুকার্য মাকরুহ তথা অপছন্দনীয়। অতঃপর তারা হারাম ও মাকরুহ নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। তবে উভয়পক্ষ একটি



বিষয়ে একরৈখিক। তা হলো—মসজিদের ইমারতের জন্য ওয়াকফকৃত সম্পদ নকশা ও কারুকর্মে ব্যয় করা হারাম।

আর যদি সেখানে ব্যয়িত সম্পদ নির্মাতার হয়, তাহলে আবার পুরাতন মতানৈক্য ফিরে আসবে। ইমাম জারকানি ইমাম বাগাবি থেকে বর্ণনা করে বলেন—

ওয়াকফের সম্পদ থেকে মসজিদের নকশা করা জাযিজ নেই। যদি করে, তাহলে মুতাওয়াল্লি ক্ষতিপূরণ দেবে। আর যদি অন্য কেউ নিজের সম্পদ দ্বারা করে, তাহলেও তা মাকসুহ হবে; কেননা, তা মুসল্লিদের অন্তর আকৃষ্ট করে নেয়। (এটি ফিকহে শাফিয়ির ইমামদের মত। তবে ফিকহে হানাফির ইমামগণ প্রয়োজনের ভিত্তিতে একে জাযিজ বলে থাকেন।)

সাধারণ তাশয়িদ এবং নকশা ও কারুকর্মের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট। কেননা, প্রথমটার কারণে মসজিদ নির্মাণের কোনো চেতনা কিংবা দর্শন স্কল হয় না; কিছু নকশা ও কারুকর্মের কারণে হয়। কেননা, এর দ্বারা মুসল্লিদের অন্তর একাত্মতা ও খুশখুজু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং দুনিয়ার চাকচিক্যে হারিয়ে যায়; অথচ মসজিদে আসার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো—দুনিয়াবি কল্পনা থেকে অন্তরকে মুক্ত করা এবং তার চাকচিক্য ও জাঁকজমক থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করা।

উমর রা. এ ব্যাপারে অনেক আগেই সতর্ক করে গেছেন। সহিহ বুখারিতে বর্ণিত আছে, তিনি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন এবং এও বলে দিলেন যে—

মানুষ যেন বৃষ্টি থেকে নিরাপদ থাকে, সেভাবে বানাবে; লাল কিংবা হলুদ রং ব্যবহার করবে না, এতে মানুষের অন্তর আকৃষ্ট হয়ে পড়বে।

মসজিদে কিবলার দিকে কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ করা—তা নিষিদ্ধ কারুকর্মের অন্তর্ভুক্ত কি না, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম মতবিরোধ করেছেন। ইমাম জারকানি তার কিতাব ই'লামুস সাজিদ-এ লিখেছেন—

মসজিদের কিবলায় কুরআনের আয়াত বা কিয়দংশ লেখা মাকরুহ। ইমাম মালিক বলেন, কিছু কিছু উলামায়ে কিরাম তাকে জাযিজ সাব্যস্ত করে বলেছেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, উসমান রা. রাসুলের মসজিদে তা করেছিলেন; কিন্তু কেউ তার অস্বীকৃতি জানায়নি।



পূর্বোন্মেষিত আলোচনা থেকে বর্তমানে যারা মসজিদ নির্মাণকাজ পরিচালনা করে, তাদের অনেকের শ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা, তারা তাদের সমুদয় প্রচেষ্টা মসজিদ নকশা করা, জাঁকজমক এবং বাহ্যিক আড়ম্বরের পেছনে ব্যয় করে। অবস্থা এমন হয় যে, সেখানে প্রবেশ করলে কেউ আল্লাহর দাসত্বের নমনীয়তা ও স্বাদ অনুভব করে না; বরং তার বাহ্যিক অবস্থার অভিব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মাঝে শৈল্পিক কানুকার্য ও বিচিত্র জাঁকজমকের গর্ববোধ সৃষ্টি হয়।

সাধারণ মুসলিমদের ক্ষেত্রে এই শয়তানি ছলনার একটি শোচনীয় ফলাফল হলো, দরিদ্র ও গরিব মুসলিমরা কোনো স্থানেই দুনিয়ার ঠাকঠমকের প্ররোচনা থেকে নিবৃত্তি পায় না।

মসজিদগুলো ছিল এমন, যা গরিবকে তার অসহায়ত্বের ওপর সাধুনা দিত, তাদের দুনিয়ার চাকচিক্য ও আবহ থেকে বের করে আশিরাত ও তার নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিত; কিন্তু এখন এই মসজিদের জাঁকজমক থেকেই তাদের অপ্রাপ্ত দুনিয়ার কথা স্মরণ হয়ে যায় এবং দারিদ্র্যের দুর্দশা ও হতভাগ্যের উপলব্ধি জাগরুক হয়।

হায় আল্লাহ! মুসলিমদের কি শোচনীয় অবস্থা! তারা তাদের ইসলামের মৌলিক বিষয় ছেড়ে মিথ্যা জাঁকজমকের পেছনে ছুটছে; বাহ্যত যা দেখলে মনে হয় ধীন, কিন্তু তার ভেতরটা দুনিয়া, প্রবৃত্তি ও কামনায় ভরপুর! আপনি আমাদের রক্ষা করেন, মালিক!

* * *





দ্বিতীয় বুনিয়াদ : মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা

মুসলিম পরিচর্যই আত্মীয়তা

মদিনায় আগমনের পর গুরুত্বের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে বন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন; এমনকি মৃত্যুর পর তাদের মাঝে উত্তরাধিকারও বণ্টন হবে। এর নেপথ্য ছিল, তাদের মাঝে যেন আত্মীয়তার বন্ধনের চেয়ে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রভাব বেশি শক্তিশালী হয়।

সে পরিপ্রেক্ষিতে জাফর ইবনে আবু তালিব এবং মুআজ্জ ইবনে জাবাল, হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং জারিদ ইবনে হারিসা, আবু বকর সিদ্দিক এবং খারিজা ইবনে জুহাইর, উমর ইবনুল খাত্তাব এবং উতবান ইবনে মালিক, আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং সাদ ইবনে রবি—এভাবে দুজন দুজনকে ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছেন।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল সাহাবির মাঝে এই সম্পর্ককে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। সামনে এর আলোচনা আসবে।

ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধন অনেকাংশে বন্ধুগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মিরাসের সম্পদে ভাগ পাওয়া—বন্ধুগত ভিত্তিরই একটি বাহ্যিক দৃষ্টান্ত। এই সম্পর্কের



অধিকার আত্মীয়তার সম্পর্কের অধিকারের ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ছিল বদর যুদ্ধের আগপর্যন্ত। তার পরপরই এই আয়াত নাজিল হয়—

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٠﴾

আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আত্মীয়রা একে অন্যের বেশি হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে সম্যক অবগত। ৩০

এই আয়াত শ্রাব্যের ওই রীতিকে রহিত করে দেয় এবং মিরাসের মধ্যে তার অধিকারকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এর দ্বারা সমস্ত মানুষ তার বংশ ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং মুসলিমরা সকলে ব্যাপকভাবে ভাই ভাই হয়ে যায়।

ইমাম বুখারি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করে বলেন—

মুহাজ্জির সাহাবিগণ মদিনায় আগমন করার পর আনসারদের আত্মীয়স্বজনের স্থলে তারাই আনসারদের উত্তরাধিকারী হতেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে যে শ্রাব্যের বন্টন তৈরি করে দিয়েছিলেন তার ভিত্তিতে। অতঃপর এই আয়াত নাজিল হয়ে তা রহিত করে দিলো—প্রত্যেকের জন্যই আমি বানিয়ে দিয়েছি আত্মীয়তার বন্টন।

এরপর আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন—আর ঋদের সাথে তোমাদের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ৩১ অর্থাৎ, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও কল্যাণ করো। এর মাধ্যমে মিরাসের বুনিন্যাদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ৩২

* * *

২৫৬ সূরা আনকাল, আয়াত : ৭৫

২৫৭ সূরা নিসা, আয়াত : ৩৩

২৫৮ সহিহ বুখারি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৮৭



কবির সিরাহ

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণের পথে এটা হলো দ্বিতীয় ভিত্তি, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থাপন করেছেন। এই ভিত্তির প্রয়োজনীয়তা উদ্ভাসিত হবে নিম্নোক্ত আলোচনায়—

এক.

কোনো রাষ্ট্রই জাতির ঐক্য ও সংহতি ব্যতীত উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে পারে না। আবার ঐক্য ও সংহতি দ্বাত্ত বন্ধন ও পারস্পরিক সহানুভূতি ছাড়া গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বন্ধুত্ব যে জাতির মধ্যে নিখাদ ভালোবাসা ও দ্বাত্ত বন্ধন অনুপস্থিত থাকবে, তারা কোনো বিষয়েই সমান্তরালে আসতে পারবে না। আর ঐক্য ও সংহতি না থাকলে কোনো রাষ্ট্র গড়ে তোলাও সম্ভব নয়।

উপরন্তু বন্ধন ও ভালোবাসা একটি আকিদা-বিশ্বাসনির্ভর হতে হয়, যার ওপর সকলের বিশ্বাস থাকে এবং তার ওপর ভিত্তি করেই পারস্পরিক সাক্ষাৎ হয়। তাই দুজন মানুষের মাঝে দ্বাত্ত বন্ধন সৃষ্টি হওয়া—তাদের মাঝে বিরোধপূর্ণ মতাদর্শ, বিশ্বাস, চিন্তা ও চেতনা থেকে নিরাপত্তার দাবি রাখে। বিশেষত যদি ওই মতাদর্শ ও বিশ্বাস এমন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়, যা ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পন্থায় জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ সাহাবীগণের মাঝে এই দ্বাত্তের বন্ধন স্থাপন করেছেন, যার ওপর তাদের সকলের অন্তর সমবেত হয়েছে। আর তার ভিত্তি ছিল, আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে আগত ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস, যা সকল মানুষকে কোনো পার্থক্য ছাড়া আল্লাহর খাঁটি দাসত্বের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়। যেখানে পার্থক্যের ভিত্তি হয় শুধু তাকওয়া ও আমলে সালেহা। কেননা,



মানুষের বিশ্বাস, চিন্তাধারা ভিন্ন ভিন্ন হবে, আর তাদের মাঝে প্রবৃত্তি, অহমিকা ও আত্মশ্রুতির স্থলে ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা ও নিঃস্বার্থতার কতৃৎ প্রতিষ্ঠা হবে—এটা আকাশকুসুম কল্পনা বৈ কিছু নয়।

দুই.

যেকোনো সমাজে মানুষ যতই বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন হোক, তা একটি নীতিতে একত্রিত হবে। তা হলো—এই সমাজের মানুষদের মাঝে, তাদের জীবনের সমস্ত অজ্ঞান ও অনুরোধ, সহযোগিতা ও সহানুভূতিশীলতার ভিত্তি স্থাপন করা। যদি এই সহযোগিতা ও সহানুভূতির ভিত্তি ইনসাফ ও সমতার আদলে গঠিত হয়, তাহলে সে সমাজ নিরাপদ ও ন্যায্য সমাজ। আর যদি তা জুলুম ও অত্যাচারের আদলে গঠিত হয়, তাহলে সে সমাজ অত্যাচারী ও বক্র সমাজ।

অতএব, নিরাপদ সমাজের ভিত্তি যেহেতু জীবনযাপন ও জীবিকায় ন্যায়ের ওপর গঠিত, তাহলে এখন প্রশ্ন হলো—এই ন্যায়কে কে অক্ষুণ্ণ রাখবে? তাকে উত্তমভাবে বাস্তবায়ন করার নিশ্চয়তা কে দেবে?

এর জন্য সৃষ্টিগত এবং প্রাকৃতিক জামানত হলো, সহযোগিতা ও সহানুভূতি, অতঃপর রাষ্ট্র ও সংবিধানের পৃষ্ঠপোষকতা। কোনো রাষ্ট্র জনগণের মাঝে ইনসাফের নীতি কয়েম করার যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাদের মাঝে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করা ব্যতীত তা সম্ভব নয়। অধিকন্তু এ সমস্ত নীতি উলটো মানুষের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ প্রসারের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। আর হিংসা-বিদ্বেষের একটি গুণ হলো, সে তার ভেতরে জুলুম-অত্যাচার ও অবাধ্যতার বীজ অত্যন্ত ভয়ংকর ও বীভৎসভাবে লালন করে।

এ কারণেই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভ্রাতৃত্বের উপাদান গ্রহণ করেছেন এবং তা সাহাবায়ে কিরামের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করেছেন; যা ছিল মূলত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ন্যায়নিষ্ঠ সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণের বুনোদ্রব্য।

পরবর্তী সময়ে অবশ্য শরিয়তের হুকুম-আহকাম ও আইনকানূনের রূপ ধরে ইনসাফের নীতিতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তথাপি তার সমগ্রই প্রথম নীতির ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে। আর তা হলো, ইসলামি ভ্রাতৃত্ব; ওই গৌরবময় ভ্রাতৃত্ব, যা ইসলামি আকিদার মূলে তার ভূমিকা স্থাপন করেছে। তা যদি না থাকত, ইসলামি সমাজের ভিত্তি মজবুত করা এবং তার অস্তিত্বকে সুগঠিত করার



ক্ষেত্রে ওই সমস্ত আইনকানুন ও নীতি কোনো কার্যকর ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারত না।

তিন.

‘ব্রাহ্ম’ স্লেগানের ব্যাঙ্গাত্মক অর্থ : রাসুল সাদ্দাম্‌দাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের মাঝে যে ব্রাহ্মত্বের বন্ধন তৈরি করে দিয়েছিলেন, তা নিছক মৌখিক কোনো স্লেগান ছিল না; বরং তা বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত এবং আনসার ও মুহাজিরদের যাবতীয় কাজে, সম্পর্কে বাস্তবিক কার্যে পরিশ্রমিত হয়েছিল।

এজন্যই রাসুল সাদ্দাম্‌দাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ব্রাহ্মত্বকে সাহাবিদের মাঝে একটি বাস্তব দায়িত্ব হিসেবে অর্পণ করেছিলেন এবং তারা উদ্ভমভাবে এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দৃষ্টান্তের জন্য সাদ ইবনে রাবি রা.-এর ঘটনাই যথেষ্ট—

রাসুল সাদ্দাম্‌দাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাঝে ও আবদুর রহমান ইবনে আউফের মাঝে ব্রাহ্মত্ব বন্ধন করে দেওয়ার পরপরই সাদ ইবনে রাবি তার সম্পদ পরিবার-পরিজন ও স্ত্রীসমূহ অর্ধেক অর্ধেক করে আবদুর রহমান ইবনে আউফের সামনে পেশ করে দিলেন; কিন্তু আবদুর রহমান ইবনে আউফ তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বাজারের পথ দেখিয়ে দিতে বললেন, যেন সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সচ্ছল হতে পারেন।

তবে এ ধারণা করা যাবে না যে, সাদ ইবনে রাবিই এ ভূমিকায় অনন্য ছিলেন; বরং সমস্ত আনসার সাহাবিরই পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতায় একই অবস্থা ছিল। বিশেষত হিজরতপরবর্তী সময়ে এবং রাসুল সাদ্দাম্‌দাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাদের মাঝে বন্ধন তৈরি করে দেওয়ার পর। এজন্যই আদ্রাহ তায়লা তখন উত্তরাধিকারের ভিত্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক না করে ব্রাহ্মত্বের বন্ধনকে স্থির করেছিলেন।

এই বিধানের একটি রহস্য এই ছিল, যেন মুসলিমদের করোটিতে এই ব্রাহ্মত্বের বাস্তবতার উপলব্ধি হয়; যেন তারা অনুধাবন করে যে, মুসলিমদের এই ব্রাহ্মত্ব ও সহযোগিতার বন্ধন নিছক একটি মৌখিক স্লেগান নয়; বরং তার রয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সামাজিক নিরৈক্য বাস্তবতা—যা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি মূল স্তম্ভ।



আত্মত্যাগী রহিত করার কথা

তবে পরবর্তী সময়ে আত্মত্যাগীত্বের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারনীতি রহিত করার পেছনেও রয়েছে একটি রহস্য। তা হলো—এই নীতি রহিত করার পরও ব্যাপকভাবে তা মুসলিমদের মাঝে কার্যকর হয়ে গেছে। তাইতো ভিন্ন ধর্মের দুজন পরস্পর উত্তরাধিকারী হয় না। তা ছাড়া হিজরতের পর প্রাথমিক সময়টুকুতে আনসার ও মুহাজির সকলের ওপর সহযোগিতা সহমর্মিতা ও ভালোবাসার বিশেষ একটি দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। কেননা, মুহাজিরগণ মকায় তাদের পরিবার-পরিজন সর্বস্ব রেখে মদিনায় এসে আনসারদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাদের দুঃখ লাঘবের জন্য রাসূল সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে আত্মত্যাগীতার দায়িত্ব আরোপ করেছিলেন। আর সে কারণেই এই আত্মত্যাগীত্ব চাহিদা ছিল, শুধু আত্মীয়তার সম্পর্কের চেয়েও তা বাস্তবে শক্তিশালী এবং প্রভাবী হওয়া।

অতঃপর যখন মুহাজিরগণ মদিনায় সম্মিলিত হয়ে গেলেন, ইসলাম হয়ে উঠল শক্তিশালী এবং মদিনার নতুন সমাজের প্রকৃতি ও রস্মে রস্মে ছড়িয়ে পড়ল ইসলামি চেতনা, তখন মদিনায় আগমনের পরপরই আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে যে কখন তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল, তার কাঠামোকে দূর করা মুনাসিব হয়ে গেল। কেননা, ইসলামি আত্মত্যাগীত্বের ব্যাপক নীতি এবং তার ওপর আরোপিত দায়িত্ববোধ সুদৃঢ় হওয়ার পর এই সমাজে আর কখনো বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধের কোনো আশঙ্কা অবশিষ্ট নেই। তাই এখন মুসলিমদের মাঝে ইসলামি মূল্যবোধের পাশাপাশি বর্ধিত হিসেবে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রভাব কিয়ে আসাতে কোনো সমস্যা নেই।

নবিত্ব করার মুসলিমদের আত্মত্যাগীত্ব স্থাপন করেছেন

রাসূল সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে যে আত্মত্যাগীত্ব কখন তৈরি করে দিয়েছিলেন, তা এই প্রথমবার ছিল না; বরং এর পূর্বে মকাত্তেও তিনি মুহাজিরদের মাঝে আত্মত্যাগীত্ব কখন তৈরি করে দিয়েছিলেন। ইবনে আবদুল বার বলেন—

আত্মত্যাগীত্ব কখন দুইবার হয়েছিল; একবার মকায় শুধু মুহাজিরদের মাঝে।

আরেকবার মদিনায় আনসার ও মুহাজির সকলের মাঝে।—



এতে প্রতীয়মান হয় যে, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন একটি ইসলামিক যোগসূত্র। তবে তা নবায়ন ও ছোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, মুহাজির ও আনসারদের এক ভূমিতে সমবেত হওয়া এবং হিজরতপরবর্তী পরিস্থিতির কারণে। ইসলামের যোগসূত্র ও আকিদার ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে গঠিত ভ্রাতৃত্বের চেয়ে তা কোনো নতুন জিনিস নয়; বরং বাস্তবায়নের দিক থেকে তার নতুন একটি চিত্র মাত্র।

* * *





তৃতীয় বুনিয়াদ : মুসলিম ও অন্যদের মাঝে চুক্তিপত্র প্রণয়ন

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ

এটা ছিল নতুন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক মূল্যবোধ-সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বুনিয়াদ—যা রাসূল সাদ্দালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পাদন করেন। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন—

রাসূল সাদ্দালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমনের কিছুদিনের মধ্যেই সেখানকার সমস্ত আরব অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল; এমনকি আনসারদের আউস গোত্রের কিছু লোক বাদে এমন কোনো ঘর বাকি থাকল না, যেখানে কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি।

তখন রাসূল সাদ্দালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে একটি চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করলেন এবং ইহুদিদেরও সেখানে शामिल করে তাদের সাথেও চুক্তিবদ্ধ হলেন। তাদের আপন ধর্মের ওপর বহাল রাখলেন, তাদের সম্পদ তাদের মালিকানাতেই রাখলেন এবং তাদের ওপর কিছু শর্ত আরোপ করলেন।^{১০০}

চুক্তিপত্রটি অনেক দীর্ঘ, তাই আমরা পুরোটা উল্লেখ করতে পারব না। তবে আমরা রাসূল সাদ্দালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো

২৬০ ইবনে ইসহাক ওই চুক্তিপত্রটি সূত্র ব্যতীত উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ইবনে খাইসামা সূত্রসহ উল্লেখ করেছেন। *উনুসুল আসার*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৮; অনুবৃণ ইমাম আব্বাদ তার *মুসনাফে* সূত্র সহকারে বর্ণনা করেছেন। *শরহুল বন্না*, খণ্ড : ২১, পৃষ্ঠা : ১০



এখানে উল্লেখ করব। তাহলে আমরা মদিনায় গঠিত ইসলামি সমাজ ও নতুন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক মূল্যায়ন উপলব্ধি করতে পারব।

চুক্তিপত্রের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী কিছু ধারা উল্লেখ করা হলো—

- ০১. কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মুসলিমগণ এবং যারা তাদের অনুসরণ করবে, তাদের সাথে যুক্ত হবে এবং এক হয়ে লড়াই করবে—এরা সকলেই এক জাতি।
- ০২. গোত্রীয় ভিন্নতার উর্ধ্বে সমস্ত মুসলিম পরস্পরের রক্তপণ আদায় করবে, ন্যায়সংগতভাবে বন্দিদের মুক্তিপণ দেবে এবং মুমিনদের মাঝে ইনসাক রক্ষা করবে।
- ০৩. মুমিনরা নিজেদের মধ্যে কাউকে ঋণগ্রস্ত রেখে দেবে না, বরং তার ঋণ আদায় করবে এবং থাকে মুক্ত করবে।
- ০৪. মুমিনদের কেউ যদি জুলুম-অত্যাচার, পাপাচার ও নিজেদের মাঝে শত্রুতা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করে, তাহলে সে যদি তাদের কারও সম্মান ও হয়, তবুও সমস্ত মুসলিম তার বিরুদ্ধে একমত হয়ে যাবে।
- ০৫. কোনো মুমিন কোনো কাফিরের জন্য অন্য কোনো মুমিনকে হত্যা করবে না এবং কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে কোনো কাফিরকে সাহায্য করবে না।
- ০৬. মুমিনদের সকলের সশি সমান। যুদ্ধক্ষেত্রে যেকোনো মুসলিম কোনো সশি করলে, ন্যায়সংগতভাবে তা সকলের রক্ষা করতে হবে।
- ০৭. আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তা অভিন্ন। নিম্ন পর্যায়ের মুমিনও নিরাপত্তা দিতে পারবে। আর মুমিনগণ পরস্পর পরস্পরের মিত্র।
- ০৮. যে সমস্ত মুসলিম এ পত্রের লিখিত চুক্তিগুলো মেনে নিয়েছে এবং আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের জন্য কোনো ফিতনাবাজকে সাহায্য করা কিংবা আশ্রয় দেওয়া হালাল হবে না। আর যে তাকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দেবে, তার ওপর আল্লাহ তায়ালার গজব ও অভিশাপ নেমে আসবে, যুগপৎ



কিয়ামতের দিন তার ছোটো-বড়ো কোনো আমলই গ্রহণ করা হবে না।

- ০৯. ইহুদিরা যতদিন যুদ্ধরত থাকবে, ততদিন তারা ইহুদিদের সাথে খরচ বহন করবে।
- ১০. বনি আউকের ইহুদিরা মুসলিমদের একটি জাতি। তারা তাদের ধর্ম পালন করবে, মুসলিমরা নিজেদের ধীন পালন করবে; কিন্তু যে অত্যাচার কিংবা অনাচার করবে, সে শুধু নিজেকে ও তার পরিবারকে ধ্বংস করবে।
- ১১. ইহুদিরা তাদের খরচ বহন করবে। অনুগ্রহ মুসলিমরা নিজেদের খরচ বহন করবে। এই চুক্তির অন্তর্গত লোকদের ওপর যারা আক্রমণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে বাকি সকলেই সহযোগিতা করবে।
- ১২. এই চুক্তি অনুমোদনদাতাদের মাঝে যদি কোনো বিশৃঙ্খলা কিংবা কলহ দেখা দেয়, তাহলে তার ফয়সালা একমাত্র আল্লাহ তায়াল্লা ও তাঁর রাসুলের অধিকারে থাকবে।
- ১৩. যে মদিনার বাইরে থাকবে সেও নিরাপদ। আর যে মদিনায় ভেতরে থাকবে, সেও নিরাপদ। তবে অত্যাচারী বা পাপাচারী ব্যতিক্রম।
- ১৪. আল্লাহ তায়াল্লা সর্বাত্মে এই চুক্তিপত্র সত্যায়ন করেছেন এবং তা পূরণ করেছেন। যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং সংকাজ করবে, আল্লাহ তায়াল্লা তাদের সাহায্যকারী।

* * *

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

এই চুক্তিপত্রে ইসলামি সমাজের বিভিন্ন বিধিবিধানসংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে —

এক.

বর্তমান যুগের পরিভাষা অনুযায়ী এই চুক্তিপত্রের সবচেয়ে সমীচীন নাম হলো ‘সংবিধান’। যদি তাকে ঘোষিত সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা বর্তমান যুগের যেকোনো সংবিধানকে—যা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সর্বদিকে স্পষ্ট পরিকল্পনার প্রতি যত্নশীল, পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করবে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের ভেতরে পরস্পরের আচরণবিধি এবং রাষ্ট্রের বাইরে অন্যদের সাথে সম্পর্ক নীতি কেমন হবে, তা পরিপূর্ণ রূপে বর্ণনা করে দিয়েছে।

যে সংবিধান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহির মাধ্যমে প্রণয়ন করেছেন এবং তাঁর সাহাবিদের দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন, অতঃপর তাকে মুসলিম ও প্রতিবেশী ইহুদিদের একমতো বিধানের রূপ দিয়েছেন, সে সংবিধানই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমাদের গর্বের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইসলামি সমাজ সূচনা থেকেই একটি পরিপূর্ণ সংবিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত; ইসলামি রাষ্ট্র প্রথম সূর্যোদয় থেকেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক উপাদানসমূহে পূর্ণ ছিল।

আরও স্পষ্ট কথা হলো—এ সমস্ত উপাদান ছিল ভিত্তিস্বরূপ। ইসলামি সমাজে শরিয়তের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করার জন্য তা ছিল অপরিহার্য। কেননা, তা সামষ্টিকভাবে মুসলিম জাতির ঐক্যের ওপর সম্পাদিত; প্রশাসনিক অন্যান্য ধারা তো আছেই। এমন কোনো ভূমি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রণীত সংবিধান ব্যতীত ইসলামি বিধিবিধান ও শরিয়ত বাস্তবায়ন



করা সম্ভব হয়েছে। উপরন্তু, এ সংবিধান ও ধারাগুলো তো ইসলামি শরিয়তেরই অংশ।

ইসলাম কি শুধু ব্যক্তিব্যবহারের জন্য

এখানে এসেই ওই সমস্ত ব্যক্তিদের দাবি ভুলুঠিত হয়ে যায়, যারা উপর্যুক্ত সহজ বাস্তবতা থেকে নিজেদের চর্মচর্চা ও অন্তর্দৃষ্টি বন্ধ করে ফেলে এবং দাবি করে যে, ইসলাম ব্যক্তি ও তার চরিত্রের মাঝে সংযোগের একটি ধর্মমাত্র; তার কোনো রাষ্ট্রীয় উপাদান ও সাংবিধানিক নীতি নেই।

বস্তুত এটি একটি প্রাচীন ফাঁদ; উপনিবেশবাদের গোলাম এবং সাংস্কৃতিক চেতনা বিকৃতকারীরা এর মাধ্যমে নিজেদের অ্যাড্লেডা বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট। আর তা হলো, ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা, যেন সে ইসলামি সমাজ এবং অন্যান্য ব্রষ্ট্র ভ্রাত্ত্র সমাজে নিজের কাজ আঞ্জাম না দিতে পারে এবং কোনো কর্তৃত্ত্র অর্জন না করতে পারে। আর তার একমাত্র পক্ষা হলো এ কথা প্রচার করা যে, ইসলাম নিছক একটি ধর্মমাত্র, রাষ্ট্র নয়; কিছু ইবাদত উপাসনামাত্র, কোনো সংবিধান বা জীবনবিধান নয়। এমনকি বাস্তবেও যদি ইসলাম কোনো জীবনবিধান ও রাষ্ট্র হয়ে থাকে, তবুও যেন তাদের মিথ্যা প্রচারণার দ্বারা সে পরিবর্তিত হয়ে তার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

তবে ওই সমস্ত বিকৃতকারীদের দুর্ভাগ্য যে, তাদের এই ফাঁদ খুব স্বল্প সময়েই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তাদের দাবিগুলো হয়ে গেছে অনর্থক কথাবার্তা এবং স্পষ্ট হিংসা-বিদ্বেষ প্রসারের প্রমাণবহ; কিছু যাহোক, আমরা যেহেতু এ সমস্ত ধারা নিয়ে আলোচনা করছি, তাই বলব—

ইসলামি সমাজের জন্ম হয়েছিল একটি রাষ্ট্রের সংহত অবকাঠামোর অধীনে। এবং পরবর্তী সময়ে তার বিধিবিধান অবতীর্ণ হয়েছে চতুর্দিক থেকে সুগঠিত একটি সমাজের অবকাঠামোর অধীনে। এই চুক্তিপত্রই তার সবচেয়ে বড়ো সাক্ষী।

তা ছাড়া মূলগতভাবে শরিয়তের বিধিবিধানের মূল্যের বিষয়টা তো আছেই। এটা তো তার একটা অংশমাত্র। যখন তা অন্যান্য বিধিবিধানের সঙ্গে সমন্বিত হবে, তখন তা একটি পূর্ণাঙ্গা সংবিধান ও বিশাল প্রশাসনিক নীতিতে পরিণত হবে।

দুই.



শিকহস সিরাহ

এই চুক্তিপত্রে ইহুদিদের সাথে রাসুলের ব্যবহারের মাধ্যমে ইনসানের চূড়ান্ত সীমা প্রদর্শিত হয়েছে। আর মুসলিম ও ইহুদিদের মাঝে এই ইনসানের উজ্জ্বল ফলাফল আসারও সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু ইহুদিদের প্রকৃতিতেই রয়েছে ষড়যন্ত্র, ধোঁকা ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যগ্রতা। তাই অল্প কিছুদিন পরেই তারা এই ধারার সিংহাসনগুলো বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়ল এবং রাসুল ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফন্দি ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গেল। এর আলোচনা উপযুক্ত স্থানে আসবে, ইনশাআল্লাহ। ফলে মুসলিমরাও তাদের কার্যকলাপের বিপরীত সমাধান গ্রহণ করেছিল।

তিন.

এই চুক্তিপত্র ইসলামি শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিধিবিধান উন্মোচিত করেছে।
তন্মধ্যে কিছু আমরা উল্লেখ করছি—

● এক. প্রথম ধারা থেকে আমরা এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি যে, ইসলামই একমাত্র শক্তি—যা মুসলিমদের মাঝে ঐক্য তৈরি করতে পারে এবং তাদের এক জাতিতে পরিণত করতে পারে। পাশাপাশি তাদের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় ভেদাভেদ ও বৈশিষ্ট্য দূরীভূত ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এই সর্বজনীন ঐক্যের অধীনে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত ভাষ্য থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়—

‘কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মুসলিমগণ এবং যারা তাদের অনুসরণ করবে, তাদের সাথে যুক্ত হবে এবং এক হয়ে লড়াই করবে; এরা সকলেই এক জাতি।’

এটাই হলো একটি সুসংহত ও শান্তিপূর্ণ ইসলামি সমাজ গড়ে তোলার প্রধান ভিত্তি।

● দুই. দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারা থেকে আমাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ইসলামি সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হলো—মুসলিমদের মাঝে পূর্ণাঙ্গরূপে ঐক্য ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। তাই তারা সকলেই দুনিয়া ও আখিরাতে অন্যদের প্রতি নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তা ছাড়া ইসলামি শরিয়তের অনেক বিধিবিধান এই দায়িত্ববোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলিমদের মাঝে সহযোগিতা ও সংহতি বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারিত।



● তিন. সাত নম্বর ধারা মুসলিমদের মাঝে সমতার বখাৰ্খতা বিস্তারিত করে দেয়। তা শুধু মুখরোচক সুসজ্জিত প্রদৰ্শনীয় কোনো স্লোগান নয়; বরং তা ইসলামি সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক স্তম্ভ, যা পরিপূর্ণ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক।

মুসলিমদের মাঝে সমতা নিশ্চিত করার বাহ্যিক রূপ দেখার জন্য রাসুল সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাদ্লামের গৃহীত এই সিদ্ধান্তই যথেষ্ট—

আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তা সমান, নিম্নমানের মুসলিমও কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারবে।

এর অর্থ হলো—মুসলিমের নিরাপত্তা, সে যে-ই হোক, সম্মানিত। তার আশ্রয় সুরক্ষিত, তার ওপর হাত প্রসারিত করার অধিকার কারও নেই। তাই কোনো মুসলিম যদি কাউকে আশ্রয় দেয়, তাহলে তার আশ্রয়ের সম্মান ক্ষুণ্ণ করার অধিকার কোনো শাসক বা প্রজার নেই। এক্ষেত্রে মুসলিম নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো বিভেদ নেই। তাই কোনো নারীও যদি কাউকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে তার আশ্রয়ের সম্মান ক্ষুণ্ণ করার অধিকার কারও নেই, সে যত বড়ো পদেরই হোক না কেন, যত উচ্চমর্যাদাশীল হোক না কেন। সমস্ত মাজহাবের উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত। তবে ইসলামি আইনবিদগণ এক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। যেমন : মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকর, যেমন—গোয়েন্দা বা এমন কাউকে নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না। অনুবৃশ নির্দিষ্ট সংখ্যা ও সময়, তথা চার মাস, এর বেশি কাউকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না ইত্যাদি।

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম-সহ অনেকে বর্ণনা করেছেন—

মক্কা বিজয়ের দিন উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব রাসুলের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসুলামাহ, আমার ভাই আলি বলছে যে, আমি যে লোককে (ফুলান ইবনে বুহাইরা) আশ্রয় দিয়েছি, সে তাকে হত্যা করবে। রাসুল সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাদ্লাম বললেন— উম্মে হানি, তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।



আপনি এই হাদিসটি নিয়ে চিন্তা করলে উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ইসলামের ছায়াতলে নারীরা কী পরিমাণ উচ্চ স্তর অধিকার করে আছে। পুরুষের মতো সমানে সমান মানবিক ও সামাজিক সমস্ত অধিকার সে পেয়েছে। যার কোনো নজির পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির মধ্যে নেই। তবে ইসলামি শরিয়ত প্রদত্ত এই উজ্জ্বল মানবীয় সমতা এবং আধুনিক সভ্যতাপ্রেমীদের গতানুগতিক সমতার মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট করে জানা থাকা আবশ্যিক।

ইসলামি শরিয়তের সমতা নির্মিত মানুষের সৃষ্টিগত মৌলিক ফিতরাতের ওপর, যা নারী-পুরুষ, ব্যক্তি ও সমাজ—সকলের কল্যাণ বয়ে আনে। পক্ষান্তরে তাদের মিশন হলো মূলত একটি পাশবিক প্রবৃত্তি, যা ভালো-মন্দ বিচার ছাড়াই পর্দার আড়ালে নারীকে যথাসম্ভব পুরুষের ভোগ ও বিনোদনের বস্তুতে পরিণত করে।

চরম.

বারোতম ধারা আমাদের শিক্ষা দেয়—মুসলিমদের যাবতীয় মোকদ্দমা, বিরোধ ও বিষয়াদি একমাত্র যে ন্যায়বিচারকের কাছে উপস্থাপন করতে হবে, তা হলো—আল্লাহ তায়ালার শরিয়ত ও বিধিমালা। আর তা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া অন্য কোনো বিচারকের ধরনা দেওয়ার অনুমতি নেই। এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো পন্থায় তারা তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজে বেড়ালে, তারা অব্যাহত সাব্যস্ত হবে এবং দুনিয়ায় নিজেদের দুর্ভাগ্য ও আশ্বিরাতে আজাবের সম্মুখীন করবে।

এই হলো চারটি ধারা—যার ওপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ইসলামি রীতি কায়ম করেছেন। মুসলিমদের নতুন সমাজে তা অবশ্যপালনীয় পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তবে এখানে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়ে গেছে, চিন্তাভাবনা করলে তা অস্পষ্ট থাকবে না।

এই সংবিধান বাস্তবায়িত হওয়া, তার নির্দেশনা মেনে চলা এবং তার বিধিবিধান আঁকড়ে ধরার ফলস্বরূপ তা একটি মজবুত ও সংহত-সুদৃঢ় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। অতঃপর বিশ্বব্যাপী, পূর্ব-পশ্চিম সমস্ত প্রান্তে, শক্তিশালী সুশ্রুতিষ্ঠিতরূপে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিশ্ববাসীকে অনুপম মানবিক সঠিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি উপহার দিয়েছিল।





পঞ্চম অধ্যায়

হিজরতের পর নবিজির প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো ছিল একটি নিরাপদ আবাস তৈরিকেন্দ্রিক এবং আশেপাশের গোত্রগুলোর সাথে একটি সমঝোতাচুক্তি সম্পন্ন করার পর নবিজি মূলত কিছু যুদ্ধের সম্মুখীন হন। এই অধ্যায়ে হিজরতের পর থেকে নবিজি সফলভাবে যে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধগুলো মোকাবিলা করেছেন, তারই আলোচনা আসবে। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে—

- প্রতিরোধ-যুদ্ধের পূর্বকথা, গাজওয়াতু বাদরিল কুবরা, বনু কাইনুকার ইহুদিদের মুসলিমদের সাথে করা প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা, উহুদ যুদ্ধ ও উহুদের শিক্ষা, ইয়াওমুর রাজি ও বিরে মাউনা, বনু নাজিরের ইহুদিদের দেশান্তর এবং এর কারণ কী ছিল, সেইসব বিষয়ে আলোচনা।
- গাজওয়া জাতির রিকা, গাজওয়ায়ে বনু মুস্তালিক—এই দুটি যুদ্ধের প্রেক্ষাপট কী ছিল, কেন হয়েছিল, সেই বিষয়ের আলোচনা। এই দুটি যুদ্ধ থেকে মুসলিমদের জন্য প্রাপ্ত শিক্ষা—সেইসব আলোচনা।
- গাজওয়ায়ে খন্দক ও গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজারে কারণ, যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং এই দুটি যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও উপদেশ কী, সেই শিক্ষা।



প্রতিরোধ-যুদ্ধের পূর্বকথা

প্রতিরোধ-যুদ্ধ—এ শিরোনামের অধীনে যেসব যুদ্ধের কথা তুলে আনব, বাস্তবিক অর্থেই সেসব যুদ্ধ ছিল প্রতিরক্ষামূলক। মুশরিকদের বড়যন্ত্র, শত্রুতা, সীমালঙ্ঘন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড রুখতে এসব যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল। প্রতিরক্ষার এসব যুদ্ধ নবযুগের ইসলামি দাওয়াতেরই একটা ধাপের প্রতিনিধিত্ব করে। জিহাদ যেই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধগুলো মূলত তার রূপ বহন করে না; বরং এসব যুদ্ধ ছিল দাওয়াতের অন্য অনেক স্তর, যেমন—প্রথমে গোপনে দাওয়াত, তারপর প্রকাশ্যে দাওয়াতের মতো একটা স্তর। আর এর শেষ স্তরের রূপ আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধির পরবর্তী ঘটনাগুলোতে বুঝতে পারব। বনু কুরাইজার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিকে ইশারাও করেছিলেন—‘আমরা এখন যুদ্ধ করি, তারা যুদ্ধ করে না।’^১

আমরা এবার ইসলামি দাওয়াতের এই স্তর তথা প্রতিরোধ-যুদ্ধের কিছুটা বিবরণ তুলে আনব এবং এসব বিবরণ থেকে পাওয়া চিন্তা। এসব বিবরণে আমাদের যেসব পাঠ রয়েছে, তাও সংক্ষেপে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব। এজন্য তার আগে অন্য কোনো বিশদ আলোচনায় ঢুকে অপেক্ষাকে দীর্ঘ করতে যাব না।

জিহাদ বিধিবন্ধ হওয়ার সময়

পূর্বেও আমরা বলে এসেছি, বিশুদ্ধ হাদিস ও আছারের আলোকে বোঝা যায়—হিজ্রতের পরই ইসলামে প্রথম জিহাদ বিধিবন্ধ হয়েছে। হিজ্রতের বারো মাসের মাথায় সফর মাসে তা কার্যকরভাবে শুরু হয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম



প্রথমবারের মতো যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তথা কুরাইশ ও বনু হামজা অভিযুগে অভিযানে
বের হন। যাকে গাছওয়ায়ে ওয়াদান (ওয়াদানের যুদ্ধ) বলা হয়; কিন্তু এখানে
কোনো কিতাল (হত্যাযজ্ঞ) সংঘটিত হয়নি। বনু হামজা নবিজির সাথে সন্ধি করে।
নবিজি ও সাহাবায়ে কিরাম এরপর মদিনায় ফিরে আসেন।

* * *

.





গাজওয়াতু বাদরিল কুবরা

আবু সুফিয়ান বাগিচ্চা কাফেলা নিয়ে শাম থেকে মকায় ফিরছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর জানতে পেরে মুসলিমদের একটি দল অভিযানে পাঠালেন। হিজরতের সময় মকায় তাদের রেখে আসা ধনসম্পদে কাকিররা যে অন্যান্য ভোগদখল বসিয়েছিল, এর বদলা নেবেন এই কাফেলা। মুসলিমদের এ দলটি তখনও যুদ্ধের কথা ভাবতে পারেননি। তাই ব্যাপারটা কারও কাছে স্বাভাবিক মনে হলো, আবার কারও কাছে বেশ ভয়ানক।

আবু সুফিয়ান পথমধ্যে মুসলিমদের বাগিচ্চা কাফেলা প্রতিরোধের প্রত্নতি সম্পর্কে জানতে পেরে জমজম গিফারি নামের এক দূত মারফত মকায় সাহায্য চেয়ে পাঠাল। সেই দূতের মাধ্যমে কাফেলা উম্মারের জন্য খবর পাঠাল সে। কুরাইশদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তারা ব্যাপক প্রত্নতি নিল। প্রায় এক হাজারের মতো সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলো। এ বাহিনীতে কুরাইশ সর্দারদের কেউই বাদ পড়েনি; সকলেই অংশগ্রহণ করল।

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সুফিয়ানের সাহায্যে কুরাইশদের বিরাট প্রত্নতি ও তাকে উম্মারের জন্য কুরাইশ বাহিনী বের হওয়ার খবর শুনলেন। খবর শুনে তিনি সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শে বসলেন। মুহাজির সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে চমৎকার কথা বলছিলেন। মিকদাদ ইবনে আমর বললেন—

আপনাকে আল্লাহ তায়ালা যেমন আদেশ করেছেন, তেমনি পালন করুন।

আমরা আপনার সঙ্গে আছি।

কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের উত্তর শোনার অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বললেন—



হে লোকসকল, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।

তাঁর এ মনোভাব বুঝতে পেরে আনসারি সাহাবি সাদ ইবনে মুআজ্জ রা. দাঁড়িয়ে বললেন—ইয়া রাসূলাদ্ধাহ, সন্তবত আপনি আমাদের উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

নবিজি বললেন—হ্যাঁ।

এরপর সাদ রা. বললেন—

আমরা আপনার ব্যাপারে ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্যায়ন করেছি, আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি—আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য। এর ভিত্তিতে আমরা আপনার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আপনার যেমন ইচ্ছে কাজ করে যান, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। যেই সন্তা আপনাকে সত্যের বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমাদের সামনে যদি সমুদ্র পড়ে, আর আপনি তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাহলে আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব।’

নবিজির সান্নাভ্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উৎসর্গ হওয়ার এ বক্তব্যে বেশ খুশি হলেন। তিনি বললেন—

চলো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো, আদ্লাহ তায়ালা দুই দলের একদলকে (মুসলিম বাহিনী) (বিজয়ের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন...

আদ্লাহর শপথ, এখনই আমি যেন ওই জাতির (কাফির) ধ্বংসস্থপ দেখতে পাচ্ছি।

যুদ্ধ শুরু হলো। নবিজির অংশগ্রহণে প্রথম যুদ্ধ। দ্বিতীয় হিজরির রামাদানের কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নবিজি সান্নাভ্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের এক জামাত নিয়ে বাগিছা কাফেলা অভিযানে বের হন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী, সে বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৩১৪ জন। সঙ্গে বাহন হিসেবে সাতটি উট। যাত্রাপথে এসব উটে তারা পালাক্রমে দুজন বা তিনজন করে উঠতেন। ওই দিকে আবু সুফিয়ান তার বাগিছা কাফেলা নিয়ে সমুদ্রের তীর ধরে নিরাপদে দ্রুত চলল।

এরপর নবিজি সান্নাভ্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোয়েন্দা মারফত কুরাইশদের অভিযানের গোটা ব্যাপারটা জানতে পারলেন। তাদের সংখ্যা নয়শত থেকে এক হাজারের ভেতরে। এ বাহিনীতে কুরাইশ নেতৃবর্গের সবাই অংশ নিয়েছে।



মৃত্যু বাক্যে টানে...

বাণিজ্যিক কাফেলা যেহেতু এখন নিরাপদ, তাই আবু সুফিয়ান এ কাফেলাকে মক্কায় ফিরে যেতে বলল; কিন্তু আবু জাহল নাছোড়বান্দা। সে বদরে যাবেই। সে বলল—

আল্লাহর শপথ, আমরা বদরে না গিয়ে ফিরব না। বদরে গিয়ে তিন দিন অবস্থান করব, সেখানে উট জবাই করে আমরা খাব, মদের আসর হবে, বান্দ্যসুর বাজানো হবে। আমাদের এ জড়ো হওয়া, বদরে দিকে আমাদের এ যুদ্ধাভিযান চালানোর মাধ্যমে আরবদের মাঝে আমাদের বিরাট সুনাম হবে, আরবরা সব সময় আমাদের ভয় করে চলবে।

একপনর কুরাইশরা সামনের পথে চলল। তারা গিয়ে উপত্যকার ভালো, বেশি সুবিধাজনক উঁচু স্থানটি বেছে নিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর-কূপের নিকটে নামলেন। হুবাব ইবনুল মুনজির জিজ্ঞেস করলেন—

ইয়া রাসূলুল্লাহ, এ জায়গাটি কি এমন নাকি যে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এখানে নামার নির্দেশ দিয়েছেন? এখানেই আমাদের থাকতে হবে? নাকি এটাকে যুদ্ধ কৌশল হিসেবে এমনিতেই বেছে নেওয়া?

নবিজি বললেন—যুদ্ধকৌশল হিসেবে বেছে নেওয়া।

তিনি বললেন—

তাহলে এটা উপযোগী জায়গা নয়। লোকজনকে জাগিয়ে আমরা সামনে চলি। তাদের (প্রতিপক্ষ) ওখান থেকে পানির ব্যবস্থা করে হাউজ বানিয়ে পানি ভরে রাখব। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব, পানি পান করব, তারা পান করতে পারবে না।’

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসাহ নিয়ে হুবাব রা.-এর কথামতো সেই স্থানে গেলেন। হুবাব যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা মেনে নিলেন।

সাদ ইবনে মুআজ রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একটা নিরাপত্তা ছাউনি বানানোর প্রস্তাব করলেন। নবিজির নিরাপত্তা জাতীয় জীবনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

২৬৩ ইবনে হিশাম তার সিরাতের কিতাবে হুবাব ইবনুল মুনজির রা.-এর এ হাদিসটি ইবনে ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিশাম যে সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাতে কিছুটা সমস্যা আছে। তবে ইবনে হাজার এ হাদিসটিই *আল ইসাবা* যে সনদে নিয়ে এসেছেন, সেটি সঠিক। ইবনে হাজার তার বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য। আরও জনতে দেখুন—*আল ইসাবা*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩০২



মদিনায় নবিজির নিরাপদে ফিরে যাওয়াই কাম্য। তাঁকে হারিয়ে ফেন মুসলিমদের শোকাভূত হতে না হয়।

নবিজি এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। সাহাবারে কিরামকে আল্লাহর নুসরতের (সাহায্যের) বাণী শুনিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদিক-ওদিক ইশারা করে বলছিলেন—

এটা অমুকের (মুশরিক) ধ্বংসস্থল। এটা অমুকের ধ্বংসস্থল। নবিজি যার ব্যাপারে যেখানেই বলছিলেন, সেখানেই তার হত্যার কাছ সমাধা হয়েছে।—

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে (২য় হিজরির ১৭ রমজানের আগের সন্ধ্যা) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করছিলেন। বিনয়ানবত হয়ে আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছিলেন—

اللَّهُمَّ هَذِهِ قَرِيشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ بِخِيْلَائِهَا وَفَخَرَهَا تَحَادُكُ وَ تَكْذِبُ رَسُولَكَ. اللَّهُمَّ فَنَصْرِكَ الَّذِي تَعَانِي، اللَّهُمَّ أَحْنِهِمُ الْغَدَاءَ...

হে আল্লাহ, কুরাইশরা দস্ত-অহংকারের সাথে এসে (আপনার স্বীনের বিরুদ্ধে) চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে। আপনার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। হে আল্লাহ, আপনি আপনার ওয়াদা পূরণ করে আমাদের সাহায্য করেন। হে আল্লাহ, আপনি আগামী ভোরে তাদের নত (পরাস্ত) করে দেন...

নবিজির রোনাকারির এ অবস্থা দেখে আবু বকর রা.-এর অন্তরে দয়দ উথলে উঠল। তিনি নবিজির পেছন থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন—

ইয়া রাসূলুল্লাহ, সুসংবাদ গ্রহণ করুন। ওই সম্ভার লগ্ন, যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ আপনাকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ করবেন।

অন্য মুসলিমরাও কাকুতি-মিনতি করে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করছিলেন।—

২৬৪ সহিব মুসলিম, ৳৬ : ৬, পৃষ্ঠা : ১৭০

২৬৫ কবর খুশে আল্লাহর কাছে নবিজির সাহায্য কামনার হাদিস সহিব মুসলিম ও সহিব মুসলিম দুটি কিতাবেই বর্ণিত আছে। সিরাত ইবনে হিশাম, ৳৬ : ১, পৃষ্ঠা : ২০৫; বায়ুল সালাহ, ৳৬ : ২, পৃষ্ঠা : ৮৭



শুরুবার সকালে মুসলিম-কাফির দু-বাহিনীর মাঝে লড়াই শুরু হলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুষ্টি নুড়ি পাথর বা কঙ্কর নিয়ে কাফিরদের দিকে ছুড়ে মারলেন। ছুড়ে মারার পরই প্রত্যেক কাফিরের চোখেই তার প্রভাব দেখা গেল। আল্লাহ তায়ালা সেদিন ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুসলিমদের সাহায্য করেছেন। তারা মুসলিমদের হয়ে তাদের পাশে থেকে যুদ্ধ করেছেন।”

অবশেষে মুসলিমরা অকল্পনীয় বিজয় লাভ করলেন। কুরাইশদের উল্লেখযোগ্য ৭০ জন মারা গেল এবং ৭০ জন বন্দি হলো। এদিকে মুসলিমদের মাত্র ১৪ জন শহিদ হলেন। মুশরিকদের মৃতদেহগুলো (কাফিরদের নেতৃস্থানীয় সবার দেহও যার অন্তর্ভুক্ত ছিল) কালিবে বদরে (বদরের পরিত্যক্ত একটি কূপ) নিক্ষেপ করা হলো। এরপর কূপের পাশে দাঁড়িয়ে নবিজি তাদের ও তাদের পিতার নাম ধরে ধরে ডাকছিলেন—

হে অমুক, হে অমুকের ছেলে অমুক, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যে করা কি তোমাদের জন্য ভালো ছিল না? আমাদের রব আমাদের যেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা তার সত্যতা পেয়েছি। তোমাদের তোমাদের প্রভু যেই ওয়াদা দিয়েছিলেন, তোমরা কি তার সত্যতা পেয়েছ?

উমর রা. তখন বললেন—ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি প্রাণহীন দেহগুলোর সাথে কীভাবে কথা বলছেন?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

যেই সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ, আমি তাদের যা বলছি, (তাদের চেয়ে) তোমরা তা অধিক শ্রবণকারী নও।”

উমর রা.—এর পরামর্শ

বন্দিদের বিষয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। আবু বকর রা. বললেন—বন্দিদের থেকে ফিদয়া (মুস্তিপণ) নেওয়া হবে। এর মাধ্যমে মুসলিমরা আর্থিকভাবে শক্তিশালী হবেন। ফিদয়া নিয়ে কাফিরদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে, আল্লাহ হয়তো তাদের হিদায়াত দেবেন; কিন্তু উমর রা. পরামর্শে বললেন—তাদের হত্যা করা হোক। এরাই

১৬৬ ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুমিনদের এ সাহায্যের বিষয়ে *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* দুইতেই বর্ণনা আছে।

১৬৭ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৮; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৬৩



কুরাইশদের তৃণমূল নেতা, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ। (এদের এভাবে ছেড়ে দিলে আবারও তারা মুসলিমদের শত্রুতার মন্ত হবে।)

নবিজি সাদ্লামাহু আল্লাইহি ওরা সাদ্লাম আবু বকর রা. নমনীয় কোমল সিংহাস্তটাই গ্রহণ করলেন। ফিদয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। অবশেষে এটাই চূড়ান্ত সিংহাস্ত হিসেবে বিবেচিত হলো; কিন্তু আল্লাহ তায়ালায় ইচ্ছা ছিল এর বিপরীত। উমর রা. এর রায়ের পক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে রায় আসে।^{১০০}

নবিজিকে তিরস্কার করে আয়াত নাখিল হলো—

مَا كَانَ لِتَيْبٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَقٌّ يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۖ تُرِيدُونَ
عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ غَزِيرٌ حَكِيمٌ

নবির পক্ষে উচিত নয় বন্দিদেরকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্শ্বব সম্পদ কামনা করো, অথচ আল্লাহ চান আখিরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যদি একটি বিষয় না হতো, যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ, সেজন্য বিরাট আত্মা এসে পৌঁছত।

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

সুতরাং তোমরা খাও গনিমত হিসেবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।^{১০১}

* * *



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

বদর যুদ্ধে যেভাবে নিষ্ঠাবান, কর্মপরায়ণ, নিজ আদর্শে অবিচল মুমিনদের সাহায্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ হওয়া বিভিন্ন অলৌকিক সাহায্যের ব্যাপার আছে, একইভাবে এতে রয়েছে আমাদের জন্য অনেক জ্ঞানার ও শেখার মতো বিষয়। নিচের পয়েন্টগুলোতে আমরা সেই বিষয়গুলো তুলে ধরছি—

০১.

বদর যুদ্ধে মুসলিমরা মূলত যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হননি। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে শাম থেকে ফিরে আসা বাগিজ্য বহরে অভিযান চালানো; কিন্তু এক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল বিপরীত। অকল্পনীয় বিজয়, গনিমত লাভ এবং মুমিনের জীবনের মূল লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ একটা ইস্যু তৈরি করা। তাই বাগিজ্য বহরকে তাদের নাগালের বাইরে রাখলেন। বিপরীতে তাদের এমন এক বাহিনীর মুখোমুখি করলেন, যার আশা তারা করেনি। এখানে থেকে আমরা দুটো বিষয় বুঝতে পারি—

❖ এক. হারবি (মুসলিমদের সাথে যুদ্ধকারী) কাফিরের মাল, ধনসম্পদ মুসলিমদের বিবেচনায় মূল্যহীন। তাই মুসলিমদের জন্য এসব কাফিরদের মালে আধিপত্য বিস্তার করা এবং সাধ্যানুসারে তা নিজেদের করে নেওয়া বৈধ। ফুকাহায়ে কিরামের এ ব্যাপারে একমত। (সুতরাং কাফেলা অভিযানের ব্যাপারে এখানে প্রবল তোলার সুযোগ নেই।) তবে এক্ষেত্রে মুহাজিরদের ভিন্ন আরেকটা যুক্তি আছে। সেটা হলো—তারা মক্কায যেসব ধনরাজি রেখে এসেছিলেন, কাফিররা সেগুলোতে অনায়াস ভোগদখল বসিয়েছিল। ফলে কাফেলা অভিযানের মাধ্যমে তার প্রতিশোধ গ্রহণে তারা উন্মুখ ছিল।



❖ দুই. আগে যা বলা হয়েছে, সেটি তো আছেই; সবচেয়ে বড়ো কথা হলো—আল্লাহ তায়ালার তার মুমিন বান্দাদের ব্যাপারে এরচেয়ে বড়ো ইচ্ছা করেছেন; যা তাদের সৃষ্টির লক্ষ্যের সাথে বিশেষভাবে সংগতিপূর্ণ। তা হলো, আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকা, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, ই'লাউ কালিমাতিল্লাহ (আল্লাহর পথে জিহাদে বের হওয়া, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বাণী সমুদ্রত করা)—এর লক্ষ্যে নিজের জ্ঞানমাল বিলিয়ে দেওয়ার মুমিনদের মনন তৈরি করা।

এই তারবিয়তে ইলাহি (আল্লাহপ্রদত্ত শিক্ষা) নিচের আয়াতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

وَإِذْ يَعِذُّكَ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ.

আর যখন আল্লাহ দুটি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোনো রকম কাঁটা নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাকিরদের মূল কর্তন করে দিতে।

০২.

কুরাইশদের অত্সসজ্জিত বাহিনীর আগমনের খবর শুনে নবিজি সাহাবায়ে কিরামের সাথে যে পরামর্শ বৈঠক করেছিলেন, এতেও আমরা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো শিক্ষা পাই—

❖ এক. পরামর্শের গুরুত্ব। নবিজি এখানে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ বসেছেন। আমরা নবি-জীবন পাঠ করলে দেখতে পাব, নবিজি শরয়ি (ইসলামি) রাজনীতি, বিভিন্ন বিষয় পরিচালনাসহ নানান বিষয়ে—যেখানে কোনো নস (নির্দেশনা) নেই—পরামর্শ করা ছিল তাঁর নিয়ম। এ কারণে যেসব বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট কোনো নস নেই, সেসব বিষয়



পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে করতে হবে—এটা শরিয়তের একটা মূলনীতি। যা অবহেলা করার সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। তবে যেখানে কুরআন সুন্নাহর প্রমাণিত নস রয়েছে, সেখানে পরামর্শের মূল্য নেই। এরূপ ক্ষেত্রে নিজেদের সিদ্ধান্তের সুযোগ নেই। এখানে নসটাই হবে ধর্তব্য।

❖ দুই. এখানে অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ, চুক্তিসন্ধি ইত্যাদির ব্যাপারে বিশদ শিক্ষা রয়েছে। ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট করি—

শরিয়তে জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়া মৌলিকভাবে এমন অকাটা হুকুম; যাতে নসখ (রহিত হওয়া) বা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। ঠিক একইভাবে শরিয়তে বিধিবদ্ধ সন্ধি চুক্তি ইত্যাদিকেও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সবগুলোই মানতে হবে। তবে এসবের প্রায়োগিক ক্ষেত্র বিভিন্ন হবে। সময়-কাল, মুসলিম-কাফিরদের অবস্থা-আবহ ইত্যাদি ভেদে এর প্রায়োগিক ক্ষেত্র ভিন্ন হবে। এক্ষেত্রে কষ্টপাথর হবেন ন্যায়পরায়ণ ধার্মিক, নিষ্ঠাবান ইসলামি রাজনীতিতে অভিজ্ঞ; বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিমদের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের নিরঙ্কুশ মানসিকতার অধিকারী (ইসলামি) রাষ্ট্রপ্রধান।

শাসক যদি মনে করেন—এখন যুদ্ধ না করাই ভালো এবং তার এই মনে করা বা সিদ্ধান্তটা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে, তাহলে তিনি কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হয় না—এমন পন্থাতিতে প্রতিপক্ষের সাথে সন্ধি করে নিতে পারেন। তবে যদি সন্ধির পর পরিস্থিতি পালটে যায়, যুদ্ধের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়, তখন বিধান ভিন্ন হবে। পক্ষান্তরে শরয়ি সিয়াসতের (ইসলামি রাজনীতি) দৃষ্টিকোণ থেকে যদি যুদ্ধে কোনো কল্যাণ দেখেন, তাহলে জনগণকে জিহাদে বাধ্য করতে পারবেন। এটা ফুকাহায়ে কিরামের সবার মতামত। নবি-জীবনে এর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। তবে কাফিররা যখন মুসলিম দেশ-শহরে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা থাকলে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে তাদের প্রতিরোধ করা প্রয়োজন অনুসারে ব্যাপকভাবে মুসলিম নারী-পুরুষ সবার জন্য আবশ্যিক।

পরামর্শ ‘করা’ আবশ্যিক নাকি ‘গ্রহণ করা’ আবশ্যিক

তবে এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে—এককটু পূর্বে যেই ‘পরামর্শ’র কথা বলা হয়েছে, এটা মাশরু তথা শরিয়তসম্মত, তবে আবশ্যিক নয়। ফুকাহায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত। অর্থাৎ একজন মুসলিম শাসক বিভিন্ন সিংহাস্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পরামর্শের মাধ্যমে আলো নিতে পারেন; কিন্তু তার জন্য শ্রেফ সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ের (মতামত) ভিত্তিতে নিজের ভালো মনে করা সিংহাস্তের বিপরীত সিংহাস্ত আবশ্যিক নয়...ইমাম কুরতুবি এ ব্যাপারে বলেছেন—

المستشير ينظر في اختلاف الآراء، وينظر أقربها إلى الكتاب
والسنه إن أمكنه، فإذا أُرشدَه الله تعالى إلى ما شاء منها عزم
عليه، وأنفذه متوكلاً عليه

পরামর্শ গ্রহীতা (শাসক) বিভিন্ন রায়ের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে চিন্তা করে দেখবে, কোনটা কুরআন-সুন্নাহর বেশি নিকটবর্তী। আল্লাহ তাকে এটা বোঝার তাওফিক দিলে, সে তাতেই দৃঢ়তা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে।^{১৩}

০৩.

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—নবিজি যখন পরামর্শ করছিলেন, তখন আবু বকর উমর রা.-এর কথায় কেন নবিজি পরিতুষ্ট হননি? কেন নবিজি অন্যদের তথা আনসারদের জবাবের অপেক্ষা করছিলেন? এরপর আনসারি সাহাবি সাদ ইবনে মুআজ্জ ভাষণ দিলে তাঁর মন পরিতৃপ্ত হয় কেন?

এই প্রশ্নের সাধারণ যে উত্তর আমরা দেবো, তা হলো—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের রায় জানতে চাওয়ার ভিন্ন কারণ আছে। নবিজি ও আনসারদের মাঝে যেই চুক্তি হয়েছিল তা হলো—তারা মদিনার ভেতরে নবিজির প্রতিরক্ষা করবে, এখানে থেকে যুগ্ম করবে। তো, নবিজি দেখতে চাইলেন, তারা সেই নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলেই থাকছে? নাকি তারা আল্লাহর সাথে করা এরচেয়েও বড়ো চুক্তিতে সক্রিয় থাকার আগ্রহ প্রকাশ করছে?



সাদ ইবনে মুআজ্জের বক্তব্যে চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন—হিজরতের পূর্বে মকায় আনসাররা নবিজির হাতে যে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, সেটা মূলত আল্লাহর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করাই ছিল। এটা শুধু নবিজির প্রতিরক্ষার বাইয়াত ছিল না, ছিল ধর্মের প্রতিরক্ষার বাইয়াতও।

তারা শুধু নবিজির প্রতিরক্ষা করবেন, ধর্মের প্রতিরক্ষা করবেন না—তাদের এ রকম মানসিকতার কথা ভাবা যায় না। তাদের প্রতিরক্ষার বিষয়টা সামগ্রিক। মূলত তারা এ আয়াতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন—

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۖ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِنَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.﴾

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলিমদের থেকে তাদের জ্ঞান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে; অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতিরক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের ওপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য।”

এ কারণেই সাদ রা. জবাব দিয়েছেন এভাবে—‘আমরা আপনার ব্যাপারে ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্যায়ন করেছি, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি—আপনি যা (সত্যের যেই দাওয়াত) নিয়ে এসেছেন তা সত্য...’

অর্থাৎ আমরা বাইয়াতে আকাবায় যে চুক্তি করেছিলাম, সেই চুক্তির চেয়েও আরও বড়ো চুক্তি অনুসারে আমরা আপনার সাথে চলছি।

০৪.

ইমামের (শাসক) জিহাদসহ বিভিন্ন কাজে মুসলিমদের সতর্কতা, প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা সাজাতে গোয়েন্দা বা গুপ্তচরের সাহায্য নিতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি



যেকোনো পশ্চিতিই অবলম্বন করতে পারেন। চাই তা একধরনের ধোঁকা-ছলনা-কৌশল যা-ই হোক। মুসলিমদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে, মুসলিমদের কল্যাণে যেকোনো পশ্চিতিই অবলম্বন করা যেতে পারে। তবে এখানে মনে রাখতে হবে যা, তা হলো—কল্যাণের আয়োজন করতে গিয়ে কোনো অবস্থাতেই তা যেন আবার ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

সিরাতের বিভিন্ন বইয়ে পাওয়া যায়—বদরের নিকটে পৌঁছেলে নবিজিসহ একজন সাহাবি বাহনে চড়ে এক বৃক্ষ লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কুরাইশ মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। বৃক্ষ লোকটি বলল, তোমরা দুজন কে? এ পরিচয় দেওয়ার পূর্বে আমি বলব না। নবিজি বললেন, আপনি সংবাদ দিলে আমরাও আমাদের ব্যাপারে আপনাকে জানাব। সে বলল, এমনই হবে? নবিজি বললেন—হ্যাঁ।

এরপর বৃক্ষ লোকটা কুরাইশ কাফিরদের ব্যাপারে যতটুকু জানত, মুহাম্মাদের ব্যাপারে যতটুকু শুনছিল, সব বলে দিলো। বৃক্ষের কথা শেষ হলে ‘আমরা পানিময় স্থান থেকে এসেছি’—এ কথা বলেই নবিজি কেটে পড়লেন। তখন বৃক্ষ চিন্তায় পড়ে গেল—কোন পানিময় স্থান থেকে? ইরাকের পানিময় স্থান থেকে? (এখানে যে নবিজি বদরের পানিময় স্থানের কথা বলেছেন, তা সে বুঝতে পারেনি।)

০৫.

হুবাব রা. ও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে যে কথোপকথন হয়েছিল (আমার মতে, হাদিসের সনদ সহিহ)—এ থেকে বোঝা যায়—নবিজির সব কাজ সিদ্ধান্ত তালিমি (শরিয়তের অবশ্যপালনীয় আইন) হিসেবে ছিল না, অনেক সময়ই তিনি সমাজের একজন চিন্তাশীল মান্যগণ্য ব্যক্তি হিসেবে কোনো একটা কাজ করতেন। সিদ্ধান্ত দিতেন। পরিচালনা করতেন।

এ জাতীয় ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ আমাদের জন্য আবশ্যিক না। যুশ্বের আগে নবিজির জায়গা গ্রহণের ব্যাপারটা এরই অন্তর্ভুক্ত। এখানে নবিজি একটা জায়গা গ্রহণের পরও হুবাব রা. অন্য জায়গায় অবস্থানের পরামর্শ দেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হুবাব রা. অনেকটা নিশ্চিত ছিলেন—এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি (প্রত্যাদেশ) নয়। তাই নবিজির এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের চেষ্টা করা করা যেতে পারে।

এভাবে শরিয় সিয়াসাতের বিভিন্ন ব্যাপারে নবিজির তাসারবুফ (হস্তক্ষেপ-সিদ্ধান্ত-পরিচালনা) ছিল একজন ইমাম ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে, রাসুল হিসেবে নয়।



শিকহস সিরাহ

একইভাবে তিনি বিভিন্ন সামরিক কার্যক্রমে তাসাররুফ করেন। সেটাও রাসুল হিসেবে নয়। ফুকাহায়ে কিরাম (ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞ) এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই।

০৬.

(আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি, সাহায্য তলব করতে হবে) আমরা আগেও জেনেছি, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে বিজয়ের বাণী শুনিয়ে সান্ত্বনা দিতেন। বিজয়ের ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস ছিল সুদৃঢ়। তিনি এক্ষেত্রে এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি বিজয়ের আগেই মুসলিমদের সামনে বিজয়ের ছবি তুলে ধরতে পেরেছিলেন। কাকিররা পরাজিত হয়ে কে কোথায় মারা যাবে, সেটা সুনির্দিষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন। এত নিশ্চয়তার পরও তিনি আল্লাহর সাহায্য কামনা থেকে অমুখাপেক্ষী হননি।

আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করেছেন। তাঁর এই মিনতি দেখে আবু বকর অবশেষে তাঁকে সান্ত্বনা ও ভরসা দিতে গিয়ে বলেছেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে (বিজয়ের) যেই ওয়াদা দিয়েছেন, তা পূরণ করবেন।

‘আমি যেন তাদের ধ্বংস স্থল দেখতে পাচ্ছি’—এতটা নিশ্চয়তা লাভ করার পরও কেন নবিজির এই কাকুতি-মিনতি?

বিজয়ের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা লাভের মাধ্যমে নবিজি আল্লাহর ওয়াদাকে সত্যায়ন করেছেন। আর আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি, আকাশের দিকে হাত তুলে দুআ—এটা বান্দার উবুদিয়াতের (দাসত্ব) বহিঃপ্রকাশ। যেজন্য বান্দার মূলত সৃষ্টি। এই উবুদিয়াত প্রকাশ বিজয়ের অন্যতম উপাদান। সর্বকালে, সর্বযুগে, সব অবস্থায়। উপায়-উপকরণ যতই বেশি হোক, আল্লাহর তাওফিক ছাড়া বিজয় আসতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা চান, আমরা স্বেচ্ছায় তাঁর বান্দা হই, উবুদিয়াতই সবচেয়ে বেশি বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। উবুদিয়াত প্রকাশে বান্দা যতটুকু আল্লাহর সাড়া পায়, অন্য কোনো মাধ্যমে তা পায় না।

মানুষের জীবনে যত বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত আসে, সবগুলোই বান্দাকে উবুদিয়াত প্রকাশে সতর্ক করে। দিন খারাপের সময়ে বান্দা আল্লাহর কাছে ছুটে যাবে, তাঁর কাছে বিনীত হবে, নিজের দুর্বলতা ও উবুদিয়াত প্রকাশ করবে, বালামুসিবতে আল্লাহর কাছেই আশ্রয় নেবে—এটাই আমাদের কাছে চান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। বান্দা যখন তাঁর জীবনে এ বাস্তবতাকে সামনে রাখবে,



যেকোনো প্রয়োজনে আল্লাহর কাছে ছুটে যাবে, যেকোনো বিপদে তাঁর আশ্রয় নেবে, সেই সঙ্গে আল্লাহর আনুগত্যের রঙে রঙিন হবে, তখন সে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

এই যে নবিজির উবুদিয়াতের প্রকাশ, আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি—এটা বদরে বিজয় আসার অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহর কাছে মুসলিমদের বিনত্র মিনতির কারণে তাদের ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার বিষয়টি কুরআন এভাবে বর্ণনা করেছে—

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ ۝

তোমরা যখন ফরিয়াদ (যাচনা) করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদিগারের (প্রতিপালক) নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরি দান করলেন যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে।”

আপনি নবিজির এই উবুদিয়াত প্রকাশ ও তার চমৎকার ফল, অন্যদিকে আবু জাহেলসহ কাফিরদের ঔশ্বত্যা প্রকাশ ও তার ভয়াবহ পরিণাম—দুটোকেই ভাবেন। উবুদিয়াত ও বিনয়ের ফলাফল ছিল শুভ ও সম্মানজনক; যার সামনে সারা দুনিয়া নত হয়েছিল। আর ঔশ্বত্যা ও অহংকারের ফলাফল ছিল লাশুনা, নর্দমায় নিষ্ক্ষেপণ। বিনয়ী ও অহংকারীদের ক্ষেত্রে এটাই এটাই আল্লাহর শাস্তি বিধান।

০৭.

(বদরে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে) মুসলিমদের সাহায্যে বদরে যেই মুজিহা প্রকাশ পেয়েছিল, তা মুজিহাসমূহের অন্যতম। আল্লাহ তায়ালার সরাসরি ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুসলিমদের সাহায্য করেন। কুরআন-সুন্নাহর সুপষ্টভাবে তা প্রমাণিত। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন—

নবিজি সাদ্দালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁবুর ভেতরে ভয়ানক অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ বলে ওঠেন—আবু বকর, সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহর



সাহায্য আসছে। এই তো, জিবরাইল তার ঘোড়ার লাগাম ধরে
নিম্নভূমিতে তাকে পরিচালনা করেছেন।”

অনেকে মনে করে থাকেন—আয়াতে যে ফেরেশতার সংখ্যার কথা বলা হয়েছে, তা
মুসলিমদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য। আমি এটাকে এভাবে দেখি না। আল্লাহ
তায়াল্লা বলেন—

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ
مُرْدِفِينَ ۝

তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদিগারের
নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরি দান করলেন যে, আমি
তোমাদের সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার
মাধ্যমে।

এ আয়াতে ফেরেশতাদের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন, এক হাজার। সংখ্যার ধারণাটা
ধর-ছোঁয়া যায়—এমন জিনিসের ক্ষেত্রেই করা যায়। আর এখানে ফেরেশতাদের
ব্যাপারটা এমন না। তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে। সুতরাং মানসিক শক্তির জন্য সংখ্যার
উল্লেখ এটা বলা যায় না।

আয়াতে সংখ্যার উল্লেখের উদ্দেশ্য তাদের মনে প্রশান্তি জাগানো। তারা জীবনের
প্রথম এ রকম যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছেন। শত্রুসংখ্যা তাদের তিন গুণ। সাহায্যের
ভীষণ প্রয়োজন। তাই সংখ্যা উল্লেখ করে তাদের মানসিক প্রশান্তি দেওয়া। অন্যথায়
আল্লাহ একাই তাদের সাহায্য করেছেন। ফেরেশতাদের এখানে হাত নেই।
কুরআনের বক্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ণ—

وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِن
عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আল্লাহ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত
হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারও পক্ষ

২৭৪ সহিহ বুখারি বর্ণনাও কাহ্যকাহি : ‘এই তো জিবরাইল তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আসছেন। তার গায়ে বুখারি
জড়ানো।’ দেখুন—সহিহ বুখারি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৪



থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তির অধিকারী,
প্রজ্ঞাবান।”

০৮.

হায়াতে বারজাখ (কিয়ামতের আগপর্যন্ত মৃত্যুপরবর্তী জীবন) কালিবে বদরে দাঁড়িয়ে নবিজির নাম ধরে ধরে ডাকা—এ থেকে বোঝা যায়, মৃতদের বিশেষ ব্রহ্ম, বিশেষ জীবন রয়েছে; কিন্তু তার বাস্তব রূপ আমাদের জানা নেই। মৃতদের ব্রহ্ম তাদের দেহের আশপাশে ঘোরাকেরা করে।

এখান থেকে কবরের আচ্ছাবের প্রামাণ্যতা বোঝা যায়। তবে মনে রাখতে হবে, বারজাখ বা মৃত্যুপরবর্তী বিষয়াবলি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এ দুনিয়াতে বসে এসব ঠিক বোঝার সামর্থ্য আমাদের নেই। এসব বিষয়ের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো—যার প্রামাণ্যতা কিশূন্য হবে, সেটা নির্দিষ্টায় আমাদের মনে নেওয়া।

০৯.

(বন্দিদের সাথে আচরণ কেমন হবে?) নবিজির পরামর্শ, ফিদয়ার সিংহাস্ত, এরপর ফিদয়ার সিংহাস্ত নেওয়াতে নবিজি ও সাহাবায়ের কিরামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিরস্কার আয়াত নাজিল হওয়া—এসব থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি—

❖ এক. (বন্দি ও নবিজির ইজতিহাদের ব্যাপারে) উসুলবিদ আলিমদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে একমত যে, নবিজি (শরিয়তের কোনো বিষয়ে) ইজতিহাদ করতে পারবেন। তারা বদর যুদ্ধের বন্দিদের বিষয়ে নবিজির করা ইজতিহাদ দিয়ে দলিল দেন। নবিজি যেহেতু ইজতিহাদ করতে পারবেন, তাই এখান থেকে আরেকটা বিষয় এমনিতেই বেরিয়ে আসে, তা হলো—তার ইজতিহাদ সঠিক-ভুল দুটোরই সম্ভাবনা রাখবে। তবে তাঁর এ ভুলের স্থায়িত্ব হবে না। কারণ, কুরআনের আয়াত নাজিল হয়ে তা শূন্যে দেবে। আয়াত নাজিল না হলে বুঝতে হবে—তাঁর ইজতিহাদ ঠিক এবং এক্ষেত্রে অর্থাৎ নবিজির ইজতেহাদের পর যেই সিংহাস্ত আসবে, তা মানা আবশ্যিক।

আবু ইসহাক সিরাজির *আল লাম* কিতাবে ব্যাখ্যাকার বলেন—



وقد كان الخطأ عليه جائزاً، إلا أنه لا يقرر عليه، بل ينبه عليه سريعاً
 ‘وقال أبو إسحاق الشيرازي‘ ومن أصحابنا من قال: ما كان يجوز عليه
 الخطأ، وهذا خطأ، لقوله تعالى { عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لَهُمْ } فیدل
 علي أنه أخطأ

(ইজতিহাদের ক্ষেত্রে নবিজির ভুল হতে পারে; কিন্তু এর স্থায়িত্ব হবে না।
 তৎক্ষণাৎ তা শুধরে দেওয়া হবে। আবু ইসহাক সিরাজি বলেন—যারা
 বলেন, (ইজতিহাদে) নবিজির ভুল হতে পারে না তাদের এ কথা ভুল।
 এর প্রমাণ নিচের আয়াত—

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ
 الْكَذِبِينَ

আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে
 পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিস্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে
 নিতেন মিথ্যাবাদীদের। ১৩

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, তাঁরও ভুল হতে পারে। ১৩

আসনাওয়ি তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন—

আ-মাদি এবং ইবনে হাজিবের মত হলো, নবিজির ভুল হতে পারে।
 তবে তিনি এ ভুলের ওপর অটল থাকবেন না। এই বর্ণনাটি আমাদের
 মাজহাব ও হাম্বলি ফিকহের অধিকাংশ ইমামসহ একদল মুহাদ্দিস থেকে
 আসানয়ি বর্ণনা করেছেন। ১৩

ইমাম বাইজাবি—

مَا كَانَ لِيَنْبَغِيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثَخِّنَ فِي الْأَرْضِ ۖ تُرِيدُونَ
 عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

২৭৬ সূরা তাওবা, : ৪৩

(شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي : ৮২৬)

২৭৮ (০৩৭/১ المنهاج علي الأسنوي)



নবির পক্ষে উচিত নয় বন্দিদের নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটেবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো, অথচ আল্লাহ চান আখিরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হিকমতওয়ালা। ”

এ আয়াতের তাকসিরে বলেন—

والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجتهدون ، وأنه قد يكون الخطأ ولكن لا يقرون عليه

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, নবিগণ ইজতিহাদ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁদের ভুলও হতে পারে। তবে সে ভুলে তাঁদের অটল রাখা হবে না।

অনেকে ‘ইজতিহাদে নবিজির ভুল হতে পারে’—এ কথাকে বিশাল অপরাধ মনে করে। তাদের ধারণা, ইজতিহাদে ভুল হওয়াটা গুনাহের বিষয় অথবা বিকৃতি বা ইসমতে আশ্বিয়ার (নবিদের গুনাহমুক্ত থাকা) ক্ষেত্রে অস্তুরায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মূল ব্যাপারটা এমন না। নবিজির ক্ষেত্রে ইজতিহাদে ভুল হওয়ার মানে হলো, নবিজির ইজতিহাদটি আল্লাহ তায়ালার ঠিক যেভাবে চেয়েছিলেন, সাথে সংগতিপূর্ণ না হওয়া। এটা ইসমতের সাথে সাংঘর্ষিক না। এরূপ ভুলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিদান রয়েছে।

এখানে বিবেচনার বিষয় দুটি—

- এক. মানুষের বিবেচনা,
- দুই. আল্লাহর বিবেচনা।

♣ এক. মানুষের বিবেচনায় ধরলে নবিজির ইজতিহাদ (বাহ্যদৃষ্টিতে ভুল হলেও) কখনোই তা ভুল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ, ভুল হওয়ার ব্যাপারে মানুষের নিশ্চিত জ্ঞান নেই। আর আমাদের যেহেতু ভুল-সঠিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তাই সব অবস্থাতেই তাঁর অনুসরণ করতে হবে। এটা আমাদের জন্য আবশ্যিক।



কিন্তু আল্লাহর বিবেচনায় ধরলে তা ভুল-ঠিক দুটোরই সম্ভাবনা রাখে। আল্লাহ ঠিক যেমন চেয়েছেন, এর সাথে সংগতিপূর্ণ হতে পারে, তাহলে ঠিক। আবার সংগতিপূর্ণ নাও হতে পারে, তখন তা সঠিক হবে না।

নবিজি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ। আমাদের মতো তাঁর ত্রুটি ছিল না। এ সত্ত্বেও

কোনো বিষয়ে খটকা লাগলে ত্রুটি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি ইস্তেগফার করতেন। আমরা যেমন আমরা যেমন গুনাহ হলে ইস্তেগফার করে থাকি। তিনি বলেন—...আমি দিনে-রাতে সত্তরবার ইস্তেগফার করি।

● দুই শত দুর্বলতা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সাহাবায়ে কিরামের আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হওয়া এবং নিজেদের বিলিয়ে দেওয়ার এ যেমন প্রথম অভিজ্ঞতা, তেমনি দারিদ্র্যের করাল গ্রাসের দুর্বন্ধায় যুশ্বের পর গনিমত লাভও তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা।

হিকমতে ইলাহির (আল্লাহর প্রজ্ঞা) কামনা ছিল, দুর্বলতার মাঝ দিয়েই তারা যুশ্বের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। এরপর অকল্পনীয় সাহায্যের মাধ্যমে তাদের অন্তর সুদৃঢ় করে দেবেন, তারা মনে প্রশান্তি পাবে। এরপর তারা সূক্ষ্ম দীক্ষার মাঝ দিয়ে গনিমতের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। যুশ্বপরবর্তী দুটি ঘটনার মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরাম দীক্ষা পেয়েছেন—

প্রথম ঘটনা : মুশরিকরা পরাজিত হয়ে ফিরে যাওয়ার সময় অনেক সম্পদ ফেলে দিয়েছিল। কিছু মুসলিম দ্রুত সেখানে গনিমতের মালের কাছে ছুটে গেলেন; কিছু গনিমত বন্টনের বিধান এখনও নাজিল হয়নি। গনিমতের অধিকার বন্টন নিয়ে তাদের মাঝে ঝগড়ার মতো বেধে গেল। তারা নবিজির কাছে এর সমাধান চাইলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাজিল করেন—

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۚ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনিমতের হুকুম। বলে দেন, গনিমতের সম্পদ হলো আল্লাহর এবং রাসুলের। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হুকুম মান্য করো, যদি ঈমানদার হয়ে থাকো।



إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তখন
ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয়
তাঁর (নাযিলকৃত কুরআনের) আয়াতসমূহ, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়
এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে। ১

এখানে চিন্তা করলে দেখা যাবে—আয়াতে সরাসরি তাদের জিজ্ঞাসার জবাব
আসেনি। মূল বিষয় থেকে সরে জবাব দেওয়া হয়েছে। আয়াতে কলা হয়েছে,
আনকাল (ফুজুলখ সম্পদ) তোমাদের কারও নয়; বরং তা আল্লাহ ও তাঁর
রাসুলের। তাদের কর্তব্য, নিজেদের সৃষ্ট সমস্যা থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহর
আদেশ-নিষেধ মানা। এটা তাদের মূল দায়িত্ব ও কাজ। মাল ও দুনিয়ার পেছনে
নিমগ্ন হয়ে থাকবে না। মাল ও দুনিয়ার প্রসঙ্গে তারা আল্লাহর ফয়সালার ওপর ভরসা
করে থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম আয়াত থেকে শিক্ষা নিলেন।

এ আয়াতের শিক্ষা নিয়ে তারা যখন অন্য মানুষ হয়ে উঠলেন, বগড়া সৃষ্টিকারী
ব্যাপার (গনিমতের মাল-সম্পদ) থেকে বিমুখ হয়ে পড়লেন, তখন অন্য আয়াত
নাযিল হলো। যেখানে গনিমত বস্টনের বিশদ বিবরণ রয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ
তায়ালার তাদের সূক্ষ্ম তরবিয়ত (শিক্ষা ও দীক্ষা) দিয়েছেন।

দ্বিতীয় ঘটনা : নবিজি সাহাবায়ে কিরামের সাথে বন্দীদের বিষয়ে পরামর্শে বসার পর
কিদ্ম্বা নেওয়ার ওপরই পরিশেষে সিদ্ধান্ত স্থির হয়। এর মাধ্যমে বন্দীদের সাথে
কোমল ও নমনীয়তার আচরণ করা হয়। অবশ্য বন্দীদের ব্যাপারে দয়া কোমলতার
এ পথে যাওয়াটাও ছিল সংগত। এর মাধ্যমে হয়তো তারা ঈমানও আনতে পারে।
এবং মকায় তাদের ফেলে আসা মালে কাফিররা যে অন্যায় ভোগদখল বসিয়েছিল,
তারও একটা প্রতিবিধান হয়ে যাবে। যা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার পথ তথা অর্থনৈতিক
সমৃদ্ধি আনয়ন করবে।

সাহাবায়ে কিরামের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো—এটা নবিজির তাদের ব্যাপারে
সহানুভূতিশীল হওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করে। নবিজি এ স্নেহ-সহানুভূতির কারণেই



মুহাজির সাহাবায়ে কিরাম যখন যুদ্ধে বের হচ্ছিলেন, তাদের মাঝে দরিদ্রতার নির্ভর ছাপ ফুটে উঠছিল, তখন আকাশপানে হাত উঠিয়ে দুআ করছিলেন—

اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حِفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عَرَاةٌ فَكْسِمْ ، وَإِنَّهُمْ جِيَاعٌ
فَأَشْبِعْهُمْ ۝

হে আল্লাহ, তারা পায়ে হেঁটে যাচ্ছে, তাদের বাহনের ব্যবস্থা করে দিন।
তাদের পোশাক নেই, পোশাকের ব্যবস্থা করে দিন। তারা ক্ষুধার্ত, তাদের
পরিতৃপ্ত করান।”

কিন্তু হিকমতে ইলাহির (আল্লাহর প্রজ্ঞা) কামনা ছিল না, এত বড়ো একটা সিংহাসনের
ক্ষেত্রে আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মুখ্য বা মানদণ্ড করা হবে না। বিপরীতে অনেক
সমস্যা। প্রথমত এ জাতীয় পরিস্থিতিতে এটা যেকোনো কাল ও অবস্থার জন্য
মৌলিক মানদণ্ড। এর প্রভাব সামনের সবকিছুতে পড়বে। এখন প্রথম অভিজ্ঞতার
সময়ই যদি এ দৃষ্টিভঙ্গি লালনকে সমর্থন করা হয়, তাহলে তা পরম্পরায় চলতে
থাকবে। পরিশেষে একটা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির রূপ নেবে। এ রকম বড়ো বড়ো
বিষয়গুলো—যেখানে দুনিয়ার কোনো ব্যাপার থাকা শোভা পায় না—এগুলোতে
এসে সেই বস্তুবাদী দৃষ্টিই প্রতিফলিত হবে।

পরবর্তী সময়ে এ দৃষ্টি থেকে ফিরে আসাও সম্ভব না। যে দৃষ্টি দুনিয়ার সাথে মিশে
যাবে, দুনিয়ার চাকচিক্যে হারিয়ে যাবে, তাকে সেখান থেকে তুলে আনা কঠিন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, ফিদয়ার বিষয়ে সিংহাস্ত হওয়ার পর আমি
নবিজির নিকট গিয়ে দেখলাম, নবিজি ও আবু বকর দুজনই কাঁদছেন। আমি বললাম,
ইয়া রাসূলুল্লাহ, কী জন্য আপনারা কাঁদছেন? আপনারা কাঁদতে পারলে আমিও
কাঁদব। আর না পারলে কাঁদার চেষ্টাটুকু অন্তত করব। রাসূল সাদ্লাম্মাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বললেন—

তোমার সাথিরা ফিদয়ার সিংহাস্ত নিয়ে আমাকে যে (কঠিন) অবস্থায়
ফেলেছে, আমি সেজন্য কাঁদছি। তাদের প্রাপ্য শাস্তি এ গাছের (নবিজির
নিকটবর্তী একটি গাছ) একদম নিকটে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে।



আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ পরিশোধিত আয়াত নাজিল করেছেন—

مَا كَانَ لِتَيْبٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ
تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ.

নবির পক্ষে উচিত নয় বন্দিদের নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো—অথচ আল্লাহ চান আখিরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হিকমতওয়াল।

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

যদি একটি বিষয় না হতো, যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ, সেজন্য বিরাট আজাব (শাস্তি) এসে পৌঁছত।

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ.

সুতরাং তোমরা খাও গনিমত হিসেবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কমাশীল, মেহেরবান।”

* * *





বনু কাইনুকা : ইহুদিদের প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা

যুস্ফের প্রেক্ষাপট

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, বনু কাইনুকা যুস্ফের প্রেক্ষাপট ছিল এ রকম—

নবিজি ইহুদি গোত্র কাইনুকার লোকজনকে কাইনুকা বাজারে সমবেত করে বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরাইশদের যে রকম প্রতিশোধ নিয়েছেন, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে সে রকম প্রতিশোধের ভয় করো। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কারণ, তোমরা জানো, আমি প্রেরিত নবি। এটা তোমরা নিজেদের কিতাবে পেয়েছ। তোমাদের নিকট (আমাকে প্রেরণের ব্যাপারে) আল্লাহর যেই ওয়াদা ছিল, তাতে তোমরা (আমার কথা) জেনেছ।

এ কথা শুনে ইহুদিরা বলল—তুমি কী মনে করছ, আমরা তোমার সম্প্রদায়ের মতো (বোকা)? তুমি এ ধারণা করে ভুল করতে যেয়ো না যে, তুমি এমন জাতির সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছ, যাদের যুস্ফ-বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই; আর এই সুযোগটাকে তুমি কাজে লাগাবে। আল্লাহর শপথ! তুমি আমাদের সাথে যুস্ফ করলে, মনে রেখো আমরাও মানুষ। (অর্থাৎ আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়ে তোমাদের শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করব।)

এভাবেই মূলত ধীরে ধীরে যুস্ফের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। ইবনে হিশাম আবু আওয়ানার সূত্রে বর্ণনা করেন—



আরবের এক নারী কিছু পণ্য নিয়ে এসে বনু কাইনুকার বাজারে বিক্রি করলেন। এরপর সে (নিজের কোনো প্রয়োজনে) এক স্বর্ণকারের কাছে এলেন। তারা (সমবেত দুই লোকেরা) চাইল, ওই নারী তার চেহারা উন্মুক্ত করুক; কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন। এরপর স্বর্ণকার তার অগোচরে কাপড়ে গিঁট দিয়ে রাখল। এরপর ওই নারী যখন দাঁড়ালেন, তখন তার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে গেল। তারা এটা উপভোগ করল। হাসল। এক মুসলিম ব্যক্তি এ অবস্থা দেখে ওই স্বর্ণকারকে হত্যা করে ফেললেন। স্বর্ণকার ছিল ইহুদি। ফলে ইহুদিরা ওই মুসলিম ব্যক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে হত্যা করল। এরপর মুসলিম ব্যক্তির পরিবারের লোকজন অন্য মুসলিমদের (ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য) ডাকল। মুসলিমরা রেগে ছুটে এলেন। এভাবে দু-পক্ষের মাঝে যুদ্ধের আবহ তৈরি হলো। যুদ্ধ বাখল। ইহুদিদের মাঝে এরাই প্রথম মুসলিমদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গা করে।^{১০০}

তবারি ও ওয়াকিদির বর্ণনামতে—

দ্বিতীয় হিজরির শাওয়ালের মাঝামাঝি সময়ে এ ঘটনা ঘটে।^{১০১}

...তাই নবিজি একটা সময় পর্যন্ত তাদের অবরোধ করে রাখেন। পরিশেষে বাধ্য হয়ে তারা নবিজির হুকুমের অধীনে আসে। (অর্থাৎ নবিজি যেই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, তারা সেটা মেনে নেয়)।

এরপর মুনাব্বিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল (সে ইহুদিদের সাথে বশুত রক্ষা করে চলছিল) নবিজির নিকট গিয়ে বলল—

মুহাম্মাদ, আমার মিত্রদের ব্যাপারে একটু ইহসান করো (ভালো ও সুন্দর একটা সিদ্ধান্ত দাও।)

নবিজি তার কথাকে গুরুত্ব দেননি। দ্বিতীয়বার বললেও তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। এরপর উবাই নবিজির বর্মের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলে নবিজি বললেন—

ছেড়ে দাও।

২৮৩ সিরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৭

২৮৪ তারিখুত তাবারি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৮০; তাবাকাতু ইবনি সাআদ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬৭)



নবিজির তখন প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। চেহারা তার ছাপও ফুটে উঠছিল। তারপরও নবিজি আবারও বললেন—তোমার জন্য আফসোস, ছেড়ে দাও!

সে বলল—

না, আল্লাহর শপথ, তুমি আমাদের মিত্রদের ব্যাপারে ইহসান না করা পর্যন্ত ছাড়ব না...

অবশেষে নবিজি বনু কাইনুকাকে মদিনা বের হয়ে যাওয়ার আদেশ করেন। তাদের বলে দিলেন—তারা যেন মদিনার পাশেও না ঘেঁষে। এরপর তারা মদিনা থেকে বের হলো...

মুনাফিক ইবনে উবাইয়ের মতো, ইহুদিদের সাথে সাহাবি উবাদা ইবনে সামিতও মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন; কিন্তু এ ঘটনার পর তিনি আর এর ওপর অটল থাকেননি। ইহুদিদের সাথে করা চুক্তি ভাঙা করেন। তিনি নবিজির কাছে গিয়ে বললেন—

আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই বশুরূপে গ্রহণ করছি। এসব কাফিরদের সঙ্গে আমার যে মৈত্রীচুক্তি ছিল, তা থেকে এখন আমি নিজে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি।

তারা দুজনের ক্ষেত্রে আয়াত নাজিল হলো—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বশু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বশু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বশুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালিমদের পথপ্রদর্শন করেন না।

يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشِي أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ



কতুত যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদের আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে—আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তায়ালা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন। ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে।—

* * *



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

এই ঘটনাটি থেকে মোটাদাগে যে বিষয়টি সামনে আসে তা হলো—চুক্তিভঙ্গা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা জাতীয় বৈশিষ্ট্য শুরু থেকেই ইহুদিদের স্বভাবের অংশ ছিল। এরা যে সম্প্রদায়েরই প্রতিবেশী হয়ে যেখানেই বসবাস করেছে, প্রতিটি সুযোগে তারা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গা এবং প্রতারণার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। নিজেদের সমস্ত সম্পদ এবং উপায়-উপকরণ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন আর প্রতারণার মধ্যে ব্যবহার করতেই পাক্কা এরা। বনু কাইনুকার সাথে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা থেকে যে শিক্ষা ও পাঠ অর্জিত হয়েছে, এখানে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো—

এক. মুসলিম নারীর হিংসা

আমরা দেখেছি, বনু কাইনুকার সাথে বিবাদের ঘটনার আসল কারণ এটি ছিল যে, এক আরব মুসলিম নারী পাশের অঞ্চল থেকে কেনাবেচা করতে বনু কাইনুকার বাজারে এসেছিলেন। তিনি পুরোপুরি পর্দাবৃত্তা ছিলেন। এক ইহুদি সেই নারীর কাপড় টেনে তাকে বেপর্দা করে দেয়। যার প্রতিক্রিয়ায় পরিস্থিতি অবশেষে যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। যুদ্ধের এ কারণটি বর্ণনা করেছেন ইবনে হিশাম।

অন্যদিকে সিরাতের অন্য বিশেষজ্ঞরা এর অন্য কারণ বর্ণনা করেছেন। সেটা হলো—বদর যুদ্ধে যখন মুসলিমরা বিজয় ও সাহায্য লাভে ধন্য হয়, ইহুদিদের পক্ষে সেটা বিশেষ হিংসা ও বিদ্বেষের কারণ হয়ে ওঠে। তারা বলতে আরম্ভ করে—ঈশ্বরের শপথ! আপনি যদি আমাদের সাথে লড়াই করেন, তবে জানতে পারবেন যে, আমরা কোন কিসিমের যুদ্ধবাজ লোক।



এই উভয় কারণের মধ্যে মূলত কোনো তফাত নেই। দুটি কারণ একসাথেই ঘটেছিল এবং প্রতিটি কারণ একে অপরের পক্ষে সম্পূরক হয়েছে। এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছে। বদরের যুদ্ধের পর ইহুদিরা যে নোংরা ভাষা ব্যবহার করছিল, তার ভিত্তিতে রাসুল সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গা করার ব্যাপারটি দূরবর্তী সম্ভাবনা ছিল। পক্ষান্তরে ইহুদিরা চুক্তি ভঙ্গা করার স্পষ্ট কাণ্ডকার্ত্তি প্রদর্শন করে দেখিয়েছিল, যেমনটা বর্ণিত হয়েছে ইবনে হিশামের বয়ানে। ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী, ইহুদিরা যখন এক মুসলিম নারীকে বৈশিষ্ট্য করার ঘটনায় একজন মুসলিমকে শহিদ করেছিল, তখন ইহুদিরা কার্যতভাবেই সেই চুক্তিটি ভঙ্গা করে ফেলে। সুতরাং তখন ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

এই ঘটনাটি থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সামনে এসেছে, তা হলো—ইসলামি শরিয়াহ নারীদের জন্য যে হিজাব বা পর্দা বিধান প্রবর্তন করেছে, তাতে পুরো মুখ ঢেকে দেওয়ারও হুকুম দেওয়া হয়েছে। যদি এই বিধান না থাকত, তবে পুরো মুখটি ঢেকে রাখার দরকার ছিল না। একইভাবে, যদি ইসলামি আইন গুরুত্ব সহকারে এ ব্যাপারে নির্দেশ না দিত, তবে সে নারী তার মুখটি অনাবৃত করেই আসত। ফলত সেই ইহুদির নারীকে চেহারা খোলার কথা বলতে হতো না। সেই নারী যেহেতু ইসলামি শরিয়ার বিধান মেনে আপন চেহারা আবৃত করে এসেছিল, যার ওপর ইহুদি লোকটি তার ধর্মীয় চেতনার ওপর আঘাত করে তাকে ক্রুদ্ধ করার জন্য নিজের ঘৃণা আচরণ প্রদর্শন করছিল!

এখানে বলা যেতে পারে, ইবনে হিশাম বর্ণিত বর্ণনায় তিনি একাই এটি বর্ণনা করেছেন; অন্য কোনো বর্ণনাকারী এটাকে বর্ণনা করেননি। এও বলা যেতে পারে, এ বর্ণনায় কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে; যার ভিত্তিতে এ ধরনের হুকুমে শক্তি তৈরি হয় না; কিন্তু এর উদ্ভব বলা যায়—এ বিষয়ে এই ঘটনাটি ছাড়া আরও এমন অনেক হাদিস রয়েছে এবং যোগুলো সম্পর্কে অভিযোগ করার কোনো কারণ নেই।

এর মধ্যে একটি হলো আয়িশা সিদ্দিকা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস; যা বুখারি শরিফ এর অধ্যায় ‘মা ইয়ালবাসু আল মুহরিম মিনাস সিয়াব’-এ ইমাম বুখারি নকল করেছেন। আয়িশা রা. বলেন—



মুহর্রিম (ইহরাম পরিহিতা) নারী না চেহারা আবৃত করবে, না বোরকা পরিধান করবে, আর না জাফরান রাঙানো পোশাক পরবে ৷

নারীরা কি মুখ খোলা রাখবে নাকি পুরোটাই ঢেকে রাখবে

ইমাম মালিক রহ. তার মুয়াত্তা গ্রন্থে নাকি রা. থেকে বর্ণনা করেছেন—আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, ইহরাম অবস্থায় কোনো নারীকে তার মুখ আবৃত করে রাখবে না!

এই হাদিসগুলোতে হজ্জ চলাকালীন ইহরাম অবস্থায় কোনো নারীকে চেহারা নিকাব করতে এবং বোরকা পরতে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে কেন? এবং এই নিষিদ্ধকরণ পুরুষদের ছাড়া বিশেষভাবে নারীদের জন্যই বা কেন?

ইহরাম অবস্থায় নারীর নিকাব করা, মুখ ঢাকা এবং বোরকা দিয়ে মুখ আবৃত করার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, এ থেকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয় যে, ইহরামের বাইরে সাধারণ পরিস্থিতিতে নারীকে ইসলামি শরীয়া নিকাব করা, মুখ ঢাকা এবং বোরকা দিয়ে চেহারা আবৃত করার নির্দেশ দিয়েছে; যার কারণে হজ্জ অবস্থায় উক্ত হুকুম থেকে বিশেষভাবে পৃথক সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এই বিষয়ে একটি হাদিস ইমাম মুসলিম ও অন্যরাও বর্ণনা করেছেন—

‘যখন ফাতিমা বিনতে কাইসকে তার স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে ইম্দ্তের সময়কাল উম্মে শরিকের ঘরে কাটাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুনরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বার্তা পাঠান যে, যেহেতু উম্মে শরিকের ঘরে সাহাবিদের যাতায়াত হয়ে থাকে, সেহেতু তুমি ইম্দ্তের সময়কাল তোমার চাচার ছেলে ইবনে উম্মে মাকতুমের ঘরে অবস্থান করে অতিক্রম করো। কারণ, ইবনে উম্মে মাকতুম অশ্ব; যদি তুমি সেখানে থাকার সময় কখনো (অতর্কিতে) নিজের চাদর সরিয়েও ফেলো, তবে সে তোমাকে দেখতে পাবে না।’

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ, যা পর্দা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, প্রমাণ করে যে, নারীর পক্ষে পরপুরুষের সামনে নিজের চেহারা ও শরীর আবৃত করাওয়াজিব। একইভাবে



ইসলামি শরিয়ত পরনারীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া পুরুষদের পক্ষে হারাম করেছে। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে অনেক হাদিস।

উদাহরণস্বরূপ, ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযি রহ. বাসিরাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন—

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রা.-কে বলেছেন হে আলি, একবার কোনো নারীর দিকে দৃষ্টি পড়ার পুনরায় দৃষ্টিপাত করবে না। কারণ, প্রথম দৃষ্টিপাতে তোমার জন্য অবকাশ বা ছাড় থাকলেও, দ্বিতীয় দৃষ্টিতে তোমার জন্য অবকাশ নেই।

এ বিষয়ে একটি হাদিস আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে ইমাম বুখারি রহ. বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নহর দিবসে তাঁর সওয়ারির পেছনে বসিয়েছিলেন ফজল ইবনে আব্বাস রা.-কে। ফজল বারবার এক নারীর দিকে তাকাচ্ছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ধুতনি ধরে তার চেহারা ঘুরিয়ে দিয়ে নারীর দিকে তাকাতে বাধা দিলেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে—এই হাদিসগুলোতে দুটি নিষেধাজ্ঞা একত্রিত হয়েছে। একটি হলো, পরপুরুষের সামনে নারীকে তার মুখ খোলা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে, চেহারা আবৃত করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। অন্যটি হলো—পুরুষদেরও পরনারীর চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ এবং স্পষ্ট দলিল যে, পরপুরুষদের পক্ষে নারীদের চেহারা সতর অর্থাৎ আবৃত রাখা আবশ্যিক এবং নারীও পরপুরুষদের সামনে আপন চেহারা আবৃত করতে বাধ্য। তবে কিছু ক্ষেত্রে চেহারা খোলার অনুমোদন রয়েছে। যেমন : চিকিৎসার প্রয়োজনে, জ্ঞান অর্জনে, সাক্ষী দেওয়ার জরুরিতে এবং এ জাতীয় অন্য কোনো প্রয়োজনের পরিশ্রেক্ষিতে।

কতিপয় আয়িন্মায়ে মাজহাবেবের মতে, নারীদের চেহারা এবং উভয় হাতের তালু পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এ অঙ্গাঙ্গ্যের আবৃতিকরণ ওয়াজিব নয়। আর উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ—যা পর্দার পক্ষে বক্তব্য হাজির করে, তারা সেগুলোর বিধানকে মুস্তাহাব পর্যায়ের মনে করেন। অর্থাৎ চেহারা ও হাতের তালুর আবৃতিকরণ তাদের দৃষ্টিতে মুস্তাহাবেবের পর্যায়ভুক্ত, ওয়াজিব নয়।

অবশ্য সকল ফকিহ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, কামনার চোখে কোনো নারীর দেহের কোনো অঙ্গের দিকেই দেখা জায়িজ নয়। তা ছাড়া যখন পাশ্চাত্য



সাধারণ হয়ে যায় এবং বেশির ভাগ লোক—যারা সাধারণত পাপের অভিপ্রায় আর কামনার চোখেই নারীদের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে নারীর পক্ষে এই পরিস্থিতিতে নিজের চেহারা আবৃত করা ওয়াজিব।

বর্তমানে মুসলিমদের অবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায়—পাপাচার, চরিত্রহীনতা, মূল্যবোধের অভাব তাদের মধ্যে এতটাই বেড়েছে যে, এ জাতীয় পরিস্থিতিতে নারীদের চেহারা প্রকাশ করার কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। আমরা আশা যে যুগে বাস করছি, বলাই বাহুল্য যে, তা নেহাত খতরনাক এবং অবক্ষয় আক্রান্ত। কাজেই এর স্বাভাবিক দাবি হলো—নারীরা তাদের নিজস্ব সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য চলাফেরার ক্ষেত্রে আরও বেশি যত্নবান হবে এবং এজন্য যথাযথ উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, যতক্ষণ না মুসলিমরা এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠে এবং নিজেদের সংকট নিজেরা সামাল দিতে সক্ষম হয়।

তো, সারকথা হলো—যারা ধর্মীয় বিষয়ে বুখসত ও সুযোগ-সুবিধার পথ অনুসরণ করেন, তাদের পদক্ষেপ মধ্যপন্থা থেকে পিছলে যায় এবং প্রকৃত ওয়াজিবাত ও ফারায়েজ বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়ে। বস্তুত এটা তখন পর্বস্ত সম্ভবপর নয়, যতক্ষণ না সমাজের মধ্যে সামষ্টিক সেই ধর্মীয় পরিবেশ তৈরি হয়, যা এই বুখসতসমূহকে সাধারণ ইসলামি ধারা অনুপাতে কন্ট্রোল করবে এবং সেগুলোকে শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমাপরিসীমা অতিক্রম করা থেকে নিরাপদ রাখবে।

এটি খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, কিছু লোক—যারা বুখসত এবং সুযোগ-সুবিধার অভিলাষী, তারা এটাকে নিম্নরূপ বর্ণনা করেন—‘সময়ের সাথে সাথে বিমিগুলোও পরিবর্তিত হয়।’ এই লোকেরা এই উসুল থেকে শুধু নমনীয়তা, সুযোগ-সুবিধা এবং ফারায়েজ-ওয়াজিবাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগটাকেই নিয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা যখন এর বিপরীত হয়, তখন তাদের এই বিধির প্রয়োগ-প্রাসঙ্গিকতা বিস্মৃতির শিকার হয়!

আমি এ ধরনের এমন কোনো উদাহরণ পাইনি, যেখানে বলা হয়েছে যে, সময়ের সাথে সাথে নিয়মগুলো পরিবর্তিত হয়। সুতরাং এখন পরিস্থিতির দাবি এবং প্রয়োজনীয়তা হলো—নারী অবশ্যই নিজের চেহারা আবৃত করবে এবং স্থলন ও মন্দের আশঙ্কা বিবেচনায় জরুরি হচ্ছে, নারী চলাফেরার ক্ষেত্রে আরও অত্যধিক যত্নবান হবে এবং প্রতিটি পদক্ষেপ দেখেচুনে রাখবে। যতদিন না আল্লাহ মুসলিমদের জন্য উপযোগী ইসলামি সমাজের সূব্যবস্থা করে দেন।



দুই. ইহুদিরা বিশ্বের লুকিয়ে রেখেছিল কেন

বনু কাইনুকার ইহুদিদের পক্ষ থেকে যে ঘটনা ঘটেছে, তা এই কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, ইহুদিদের অন্তরে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষের বিববাহি ছিল লুকায়িত। তবে প্রশ্ন ওঠে যে, তারা তাদের এই বিদ্বেষভাবাপন্নতাকে কেন প্রায় তিন বছর পর প্রকাশ করল? এবং কেন তারা এই মনোভাবকে নিজেদের ভেতর দাফন করে রাখল? ষড়যন্ত্রকে করে রাখল গোপন?

এর উত্তর হচ্ছে—আল্লাহ রব্বুল আলামিন যখন বদরের ময়দানে মুসলিমদের বিজয় ও সহায়তা দান করেছিলেন, তখন ইহুদিরা এর দ্বারা মুসলিমদের প্রতি আরও বেশি ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং অতঃপর তাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা হিংসা ও হিংসার অনুভূতি পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ, ইহুদিরা মুসলিমদের ব্যাপারে এমন বিজয় ও সাহায্যের আশা করেনি, যা আল্লাহ পরাক্রমশালী তাদের বদরের ময়দানে দান করেছিলেন। তাই এটি দেখে ইহুদিদের অন্তর আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে, তাদের অন্তর্গত সেই হিংসা ও বিদ্বেষের উত্তাপ কার্যতভাবেই উদগিরিত হয়। বরঞ্চ বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের পর থেকেই তাদের কথাবার্তা এবং তাদের মন্তব্যগুলো ঘৃণা ও শত্রুতার তির হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত আঘাত হানতে শুরু করে।

ইবনে জারির আত-তাবারি বর্ণনা করেছেন—বদর যুদ্ধে বিজয়ের পরে মুসলিমরা যখন মদিনায় ফিরেছিলেন, তখন মদিনার এক ইহুদি মালিক ইবনে সাইফ কিছু মুসলিমকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল—তোমরা কুরাইশের ওপর যে বিজয় অর্জন করেছ, সেজন্য তোমরা কি ছুঁল ধারণার শিকার হওয়ার দরকার নেই। কারণ, তারা আসলে কুশ্ব জ্ঞানে না! যদি আমাদের সাথে এ জাতীয় লড়াইয়ের সুযোগ তৈরি হয়, তবে আমরা এর ওপর পাকা প্রত্যয়ী হয়ে এমন লড়াই করব যে, আমাদের সাথে লড়াইয়ে তোমাদের কোনো পান্ডাই থাকবে না!

যদি ইহুদিরা এই চুক্তি এবং অজ্ঞীকারের বখাষথ রেসপেক্ট ও মূল্যায়ন করত—যা তাদের ও মুসলিমরা মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল, তবে তারা মুসলিমদের সাথে খারাপ মন্তব্য করত না। আর না তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রতারণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করত! কিন্তু সত্য হলো, তারা মন্দের পথে পা বাড়িয়েছিল, যার ভোগান্তি তাদের নিজেদেরই পোহাতে হয়েছিল!



তিন. ইসলামে মুনাফিকের সাথে আচরণ

এই ঘটনার পরে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যে কায়দায় ইহুদিদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, এতে তার নিফাকের বিষয়টা আর গোপন থাকে না; বরং তার নিফাক সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। সে একান্তই ভুলভাং লোকদেখানোর জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছে; কিন্তু তার অন্তরের গহিনে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা লালিত ছিল ঠিকই। তবুও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মুসলিমের মতোই তার সাথে আচরণ করেছিলেন। ইহুদিদের বিষয়ে সে যে দায় তুলে নিয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা প্রত্যাখ্যান করেননি। আর না তার সাথে মুশরিক, মুরতাদ কিংবা মুনাফিকের ন্যায় আচরণ করেছেন; বরং তার নেতিবাচক আচরণের বিপরীতে ইতিবাচক জবাব প্রদর্শন করেছেন। উলামায়ে কিরাম ঐকমত্যে পোষণ করেছেন যে, দুনিয়াতে মুসলিমদের তরফ থেকে মুনাফিকের সাথে একজন মুসলিমের মতোই আচরণ করা হবে, এমনকি মুনাফিকের নিফাক যদি সুনিশ্চিতও হয়।

এর কারণ হচ্ছে, ইসলামের বিধিবিধানের সমষ্টিগতভাবে দুটি দিক রয়েছে —

- ০১. দুনিয়াবি
- ০২. পরকালীন

দুনিয়াবি দিক বিচারে মুসলিমরা সেই নির্দেশের অধীন যে, তারা সেই সকল দুনিয়াবি বিষয়বলিকে নিজের এবং সমাজের ওপর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে বাধ্য এবং এই পার্শ্বি বিষয়গুলোর পরিচালক হলেন খলিফা ও রাজ্যপ্রধান, যার তত্ত্বাবধানে ও নেতৃত্বে এই বিষয়গুলি নিষ্পত্তি হবে। পক্ষান্তরে অন্য যে বিষয়গুলো পরকালের সাথে সম্পৃক্ত, তা মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত এবং তিনিই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তকারী।

সুতরাং যে বিষয়সমূহ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত, সে সংক্রান্ত প্রতিটি বিধানের ফয়সালা হবে বাস্তববাদী; অনুভব যোগ্য দলিল-প্রমাণ অনুসারে এবং সেই সাক্ষ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে বিধানবলির ফলাফল সাব্যস্ত হবে। এতে আবেগপূর্ণ ও আনুমানিক সূত্রধারার কোনো প্রভাব থাকবে না। অন্যদিকে আশিরাতের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত অন্তর্গত অনুভূতি এবং নিয়ত ও উদ্দেশ্য অনুসারে হবে। এই নীতির বয়ানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের আমলের বাহ্যগত দিক বিবেচনায় তোমাদের হিসাব নেব।



হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন। একইভাবে শাইখাইন বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

তোমরা আমার কাছে তোমাদের বিতর্কের মীমাংসা করতে আসো, হয়তো তোমাদের মধ্যে কেউ তার প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আপন বুদ্ধি প্রদর্শনে অতিশয় বাকপটু হয়ে থাকে এবং আমি তার পক্ষে রায় দিয়ে দেব। তো যদি আমি কারও হকের পক্ষে তার ভাইয়ের ফয়সালা করি—যা আদতে তার হক ছিল না, তবে সে যেন তা থেকে কিছু না গ্রহণ করে। কারণ, তা তার পক্ষে আগুনের একটা খণ্ডস্বরূপ।

এ নীতির বৈধতার হিকমাহ ও প্রজ্ঞা হলো, জনগণের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং তা জনগণের মধ্যে খেলাধুলা হিসেবে গণ্য হওয়া থেকে নিরাপদ রাখা। কারণ, কিছু বিচারক কেবলমাত্র আবেগপূর্ণ ও অনুমানমূলক সাক্ষীকে পুঞ্জি করে অন্যায় ফয়সালার মাধ্যমে মানুষদের ভোগানোর ওসিলা বানিয়ে নিত।

এই বিধি মোতাবেক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ শরয়ি নিয়ম অনুসারে মুনাফিকদের সাথে বিনা বৈষম্যমূলক, মুসলিমদের সম আচরণ করতেন। অথচ তিনি ওহির মারফত মুনাফিকদের অনেক বিষয়-আশয় এবং তাদের অন্তরের গোপন উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা এই সত্যের বিরোধিতা করে না যে, মুসলিমরা মুনাফিক সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকবে এবং তাদের কাজ-কারবার ও পদক্ষেপ তৎপরতা সম্পর্কে সোচ্চার থাকবে। এটি সব সময় এবং সব জায়গাতেই মুসলিমদের মৌলিক দায়িত্বসমূহের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

চর. অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব

যদি আমরা পূর্বের ঘটনার আইনি ও শরয়ি পরিণতি সম্পর্কে বিবেচনা করি এবং কুরআনের আয়াতসমূহ—যা উক্ত ঘটনার পরিশরিয়শ্রেণিতে নাজিল হয়েছে তা বিবেচনা করি, তাহলে আমরা জানতে পারি—কোনো মুসলিমের পক্ষে অমুসলিমকে তার অভিভাবক এবং বন্ধু বানানো বৈধ নয়। অর্থাৎ, তাকে এরূপ বন্ধু, যা অভিভাবকত্ব এবং উভয়ের মধ্যে সহযোগিতার দায়দায়িত্ব আরোপিত হয়। এটি ইসলামি বিধিগুলোর মধ্যে সেই বিধান, যা নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই।



এই হুকুম সম্পর্কে কুরআনের অনেক স্পষ্ট আয়াত রয়েছে এবং এই নির্দেশের গুরুত্বারোপে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের সংখ্যা মা'নবি তাওয়াতুর (অর্ধগত পারস্পর্য, যা অকাটি) অবধি পৌঁছেছে। সেসব দলিল এখানে উল্লেখ করার মতকা নেই। এগুলো প্রত্যেক গবেষক ও অনুসন্ধানীর কাছে স্পষ্ট এবং সুপরিচিত।

এই উপর্যুক্ত বিধান থেকে স্রেফ একটি অবস্থা ব্যতিক্রম। আর তা হলো—যখন মুসলিমগণ তাদের চরম দুর্বলতার কারণে তাদের সাথে এ ধরনের চুক্তি করতে বাধ্য হয়, সে পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা তাদের বুখসত দিয়েছেন। বলেছেন—

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاءَ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ
وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ ⑤

মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদের অভিভাবক (বা অন্তরঙ্গ বন্ধু)-
রূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে, তার সাথে আল্লাহর কোনো
সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের কাছ থেকে
কোনো ভয় আশঙ্কা করো...^{১০}

এখানে আরও লক্ষণীয় যে, অমুসলিমদের সাথে মুওয়ালাত (সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব)
নিষিদ্ধ করার অর্থ অর্থ এই নয় যে, তাদের ঘৃণা করা হবে। কারণ, একজন
মুসলিমকে যেকোনো মানুষের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এ
ব্যাপারটাও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কারও প্রতি রাগ করা এবং
অকারণে কাউকে ঘৃণা করার মধ্যে বড়ো পার্থক্য রয়েছে।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কারও ওপর রাগ হওয়ার কারণ হলো—একজন অমুসলিম বা
যেকোনো ব্যক্তির মধ্যে এ জাতীয় মন্দ কর্ম রয়েছে, যা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়;
এজন্য সেই মন্দ কাজের কারণে তার ওপর রাগ ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়।
তবে কোনো শরয়ি কারণ ছাড়া, তার কর্ম-তৎপরতা ইত্যাদি বিবেচনা না করেই,
কেবল ব্যক্তিগত কারণে কোনো ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা ও হিংসা পোষণ করা ইসলামে
নিষিদ্ধ।



বস্তুত, আল্লাহ তায়ালায় জন্য কোনো পাপী, অপরাধী বা অবিধাসীর জন্য ক্রুশ হওয়া আসলে তার প্রতি করুণারই ফলশ্রুতি। কারণ, মুমিনের সৌরব হলো, মুমিন নিজের জন্য যা পছন্দ করেন, অন্য সমস্ত লোকের জন্যও তা পছন্দ করেন। একজন মুসলিম তো নিজের জন্য এটাই পছন্দ করেন যে, যেন সে পরকালে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে এবং জাহান্নামের অনন্ত সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। তো যখন একজন মুমিন-মুসলিম আল্লাহ রকুল আমামিনের জন্য কারও প্রতি তার ক্রোধ পোষণ ও রাগ প্রকাশ করে, তখন সেখানে আসল উদ্দেশ্য এই থাকে যে, এই পাপী, অপরাধী বা এই কাকির যেন তার গুনাহ ও পাপাচারকে ত্যাগ করে মহান আল্লাহ তায়ালায় আশ্রয় মেনে চলে, যাতে পরকালে জাহান্নামের আত্মা থেকে নিরাপদ থাকে এবং জাহান্নাম লাভের অধিকারী হয়।

এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহর পক্ষে কারও ওপর ক্রুশ হওয়ায়—যেন সে সঠিক পথে এসে যায়—ব্যক্তিগত শত্রুতা বা বিদ্বেষের কোনো উপাদান মজুদ নেই; বরং পরিণামের বিচারে এটি ভালো বলেই প্রমাণিত হয়।

এটা এমনই, যেমন একজন পিতা, যিনি তার পুত্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কিংবা একজন ভাই নিজের ভাইকে বিপৎগামিতা থেকে বাঁচানোর জন্য কঠোরতা প্রদর্শন করেন, যাতে সে জীবনপথে সফল ও সমৃদ্ধ হতে পারে এবং নিজের স্বল্প বুঝ ও অনভিজ্ঞতার কারণে মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে তার ভাগ্য নষ্ট না করে দেয়। এ কঠোরতাকে কেউ ঘৃণা হিসেবে গণ্য করে না।

একইভাবে, কাকির ও মুশরিকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রকাশ করার বিধান রয়েছে। কারণ, তাদের ওপর আরোপিত এই কঠোরতার ভেতরে আদতে তাদের সংশোধনই নিহিত আছে। এবং নিঃসন্দেহে এটা তাদের প্রতি সমবেদনা ও করুণারই ফলস্বরূপ।
যেমন : জনৈক কবি বলেছেন—

তোমরা কঠোরতা করো, যেন তারা ফিরে আসতে পারে। যে করুণা দেখায়, তার পক্ষে তাদের প্রতি কঠোরতাও দেখানো উচিত, যাদের প্রতি সে করুণা করে।

এখানে এও লক্ষ্য করা উচিত যে, কাকির ও মুশরিকদের সাথে বশুত ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করার অর্থ এই নয় যে, তাদের সাথে কৃত চুক্তিগুলোর সম্মান করা হবে না বা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাদের সাথে কোনো রকম বাড়াবাড়ি বা অপব্যবহার করা হবে; বরং সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যিক—



মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে সিম্বল ও চুক্তি, ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতার ওপর ভিত্তি করেই হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের প্রতি রাগ-গোসসা বা কঠোরতা দেখানোর মর্ম এটা কখনোই নয় যে, ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের দাবিকে উপেক্ষা করা হবে। আল্লাহ বরং সর্বাবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥﴾

হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের ওপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা হও। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করো, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, আল্লাহ তার খবর রাখেন।

এই পুরো আলোচনার উদ্দেশ্য হলো—মুসলিম উম্মাহ অন্যান্য জাতির তুলনায় একটি পৃথক জাতি এবং একটি স্বতন্ত্র উম্মাহ। যেমন, ইতঃপূর্বে মদিনা সংবিধানে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কাজেই মুসলিমদের কথুভ, গভীর সম্পর্ক এবং আত্মীয়তাসমূহ কেবল এবং কেবলই নিজের উম্মাহ ও জাতির মধ্যে হতে হবে। তবে হ্যাঁ, অন্যান্য জাতির সাথে লেনদেন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে এবং তা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার, সমস্ত মানবতার কল্যাণকামিতা, হিদায়াত ও সংশোধনকে ভিত্তি করে হওয়া উচিত।

* * *





গাজওয়ায়ে উহুদ

হুবশি পর্বতের নিচে...

বদর যুদ্ধের পর যেসব কুরাইশ নেতা জীবিত ছিল, তারা সবাই মিলে বদরের প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা করল। নবিজির সাথে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনে আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা থেকে আর্থিক সাহায্য নেবে। কুরাইশরা সবাই এ ব্যাপারে একবাক্য হলো। অন্যরাও তাদের সাথে শরিক হলো (যাদের ‘আহাবিশ’ বা সম্মিলিত দল বলা হয়। এ দলটি কুরাইশ কিনানা, খুজাআ গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত। তারা মকর ‘হুবশি’ পর্বতের নিকট একত্র হয়েছিল। এজন্য তাদের ‘আহাবিশ’ বলা হয়।) সঙ্গে নারীদেরও নিল। মুসলিমদের আক্রমণের কারণে যদি পুরুষরা পলায়ন করতে চায়, তাহলে নারীরা তাদের বাধা দেবে, আটকে রাখবে। তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা থেকে বের হলো।

নবিজি এ সংবাদ শুনে সাহ্যবায়ে কিরামের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত হলে তাদের ঐচ্ছিকভাবে ছেড়ে দিলেন, কেউ ইচ্ছা করলে যুদ্ধে অংশ নিতে পারে, আবার না নিয়ে মদিনায়ও থেকে যেতে পারে। যারা মদিনায় থাকবে, কাকিরদের পক্ষ থেকে মদিনার ভেতরে আক্রমণ হলে তারা তার প্রতিরোধ করবে। বয়স্কদের সিদ্ধান্ত ছিল, মদিনা থেকে বের না হওয়ার। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়েরও এ মত ছিল। তবে যারা বদরে অংশ নিতে পারেননি, তারা মদিনা থেকে বের হয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করার আহ্বান প্রকাশ করলেন। তারা নবিজিকে বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের শত্রুদের নিকট নিয়ে চলুন; তারা আমাদের কাপুরুষতা বা দুর্বলতা কখনোই দেখবে না।...



শিকহস সিরাহ

নবিজি তাদের সাথে একমত হওয়া পর্যন্ত এসব উৎসাহী সাহাবায়ে কিরাম পীড়াপীড়ি করে যেতে থাকলেন। অবশেষে নবিজি ঘরে ঢুকলেন। বর্ম পরিধান করলেন। অস্ত্রে সজ্জিত হলেন। এ সময় যারা নবিজিকে পীড়াপীড়ি করেছিলেন, তাদের কাছে মনে হলো, তারা নবিজির অনিচ্ছাকৃত বিষয়ে তাঁকে বাধ্য করেছেন। ফলে নিজেরা কেমন লজ্জা অনুভব করলেন।

নবিজি তাদের সামনে এলে তারা বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ, আপনাকে আমরা বাধ্য করে ফেললাম! আসলে আমাদের জন্য এটা উচিত হয়নি। এখন আপনি ভালো মনে করলে যদি না বেরোতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

কোনো নবি যখন বর্ম (যুশ্বান্ন) গায়ে জড়িয়ে ফেলেন, তখন যুশ্ব করা পর্যন্ত তাঁর জন্য তা খুলে ফেলা উচিত নয়।^১

হিজরতের বত্রিশ মাসের (৩য় হিজরি) মাথায় শাওয়ালের সাত তারিখের পর শনিবার মদিনা থেকে এক হাজার মুসলিম সৈন্য (যাদের সাথে মুনাফিকরাও ছিল) নিয়ে নিয়ে বের হন।^২

সৈন্যরা যখন মদিনা ও উলুদের মাঝামাঝি, তখন তিনশত সৈন্য নিয়ে ইবনে উবাই ‘তিনি তো আমাদের সিঁচ্ছাস্তের বিপরীত করেছেন। কাঁচা বুন্দির অধিকারী অল্লবয়সিদের কথা কানে নিয়েছেন। কীসের ভিত্তিতে আমরা নিজেদের প্রাণ বিলিয়ে দিতে যাব, জানি না’—এ কথা বলে ফিরতি পথ ধরল। তাদের পেছনে ছুটে আবদুল্লাহ ইবনে হারাম তাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বললেন, তারা যেন তাদের নবিকে ছেড়ে না যায়; কিন্তু তারা তার ডাকে সাড়া দেয়নি। তখন মুনাফিক নেতা উবাই বলল—

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعُنَاكُمْ

২৮৯ ইবনে ইসহাক, ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। তাবারিও কাছাকাছি বর্ণনা এনেছেন। দেখুন—সিরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬২; তারিখুত তাবারি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০০; তারিখুত মুসনাদিল ইমাম আহমাদ, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ৫২

২৯০ তাবাকাতু ইবনি সাআদ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৭; সিরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬২



আমরা যদি জানতাম যে লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম।

ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন—

যারা মুসলিমদের ছেড়ে গিয়েছিল, তাদের ব্যাপারে মুসলিমদের মাঝে ইখতিলাফ শুরু হলো। একদল বললেন, আমরা তাদের হত্যা করব। আরেক দল বললেন—না, হত্যা করার দরকার নেই।

এ পরিশ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত নাজিল হলো—

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَفِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۖ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا.

অতঃপর তোমাদের কী হলো যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু-দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদের ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে! তোমরা কি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতে চাও, যাদের আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোনো পথ পাবে না।

ইহুদি ও মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি ছিল। তাই কোনো কোনো সাহাবি পরামর্শ দিলেন, ইহুদিদের সাহায্য নেওয়া হোক; কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

আমরা আহলুস শিরকের (আল্লাহর সঙ্গে যারা শিরক করে) বিরুদ্ধে আহলুস শিরকের সাহায্য নেব না।

সাহাবায়ে কিরাম (তখন তাদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে সাতশ) উহুদের একটি উপত্যকায় সেনাছাউনি ফেললেন। পেছনে উহুদ, সামনে মদিনা। মুসলিমদের পেছন দিকে উহুদ পাহাড়ের চূড়ায় ৫০ জন তিরন্দাজের একটি বাহিনী রাখলেন। নবিজি

২৯১ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৭

২৯২ সহিহ বুখারি, বক : ৫, পৃষ্ঠা : ৩১

২৯৩ সূরা নিসা, আয়াত : ৮৮

২৯৪ তাবাকাতু ইবনি সাআদ, বক : ৩, পৃষ্ঠা : ৮০; ইবনে ইসহাক ও এ রকমই বর্ণনা করেছেন। সিরাত ইবনে হিশাম, বক : ২, পৃষ্ঠা : ৬৫



সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরকে তাদের আমির নিযুক্ত করে বললেন—

তোমরা তোমাদের এ নির্ধারিত স্থানে থেকে আমাদের পেছনের দিক রক্ষা করবে। (এদিকে প্রতিরোধ করবে)। আমাদের বিজয় হতে দেখলে তোমরা আমাদের সাথে শরিক হতে যাবে না, আর পরাজিত হতে দেখলেও আমাদের সাহায্য করতে যাবে না।^১

পনেরো বছরের দুই বালক। রাফে ইবনে খাদিজ ও সামুরা ইবনে জুনদুব। তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণের আশ্রয় প্রকাশ করলেন। তাদের বয়স অল্প হওয়াতে নবিজি তাদের এ আবেদন নাকচ করে দেন। নবিজিকে বলা হলো—ইয়া রাসূলুল্লাহ, রাফে তো যেতেই চাচ্ছে। নবিজি তাকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তখন সামুরা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তো রাফেকে কুস্তি লড়াইয়ে হারিয়ে দিই। (সুতরাং আমাকেও অনুমতি দেন) নবিজি তাকেও অনুমতি দিলেন।

:♣: নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তলোয়ার হাতে নিয়ে বললেন—কে এই তলোয়ার হাতে নিয়ে তার যথাযথ হক আদায় করবে?

আবু দুজানা তখন সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন—আমি। আমি তা নিয়ে তার হক আদায় করব।

নবিজি তাকে দিলেন। আবু দুজানা এরপর মাথায় লাল পটি বেঁধে—সদর্পে (শত্রুদের) কাতারে হাঁটতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, এ স্থান (যুদ্ধ) ছাড়া অন্য কোনো স্থানে এ রকম সদর্পে হাঁটাকে আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন।^২

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমাইরের হাতে পতাকা দেন। মুশরিকদের ডানে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, বাঁয়ে ইকরিমা ইবনে আবু জাহেল নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

২৯৫ তবাক্বাত ইবনি সাআদ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮০; ইবনে হিশামও এরূপ কাছাকাছি শব্দে বর্ণনা এনেছেন। বুখারি রহ.-ও এ রকম বর্ণনা করেন; সহিহ বুখারি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৯

২৯৬ মুহা পর্বত তিনি যত যুদ্ধ করেছেন, তার অভ্যাস এ রকমই ছিল।

২৯৭ সিরাত ইবনে হিশাম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৩; মুসলিমও হাদ্দাদ ইবনে সালামার মতো এ রকমই বর্ণনা করেন। তবে মুসলিমের বর্ণনায় ‘এ স্থান (যুদ্ধ)...’ এ অংশটি নেই। দেখুন, সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৫



:♣: দুই পক্ষের প্রচণ্ড লড়াই শুরু হলো। রণাঙ্গন সরসরম। মুসলিমরা কাকিরদের কচুকাটা শুরু করলেন। অগ্রনায়কদের মাঝে আছেন আবু দুজানা, হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, মুসআব ইবনে উমাইর।

নবিজির সামনেই মুসআব শহিদ হলেন। পতাকা নিলেন আলি রা.। কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লাহ তায়াল্লা মুসলিমদের বিজয় দান করলেন। মুশরিকরা পরাজিত হয়ে পালাচ্ছিল। মুসলিমরা তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের হত্যা করছিলেন আর গনিমত কুড়াচ্ছিলেন। এ অবস্থা দেখে পাহাড়ের চূড়ায় থাকা সাহাবিগণ এ মুহূর্তে এখানে থাকা না থাকার ব্যাপারে ইখতিলাফ (মতানৈক্য) শুরু করলেন। একদল বললেন, আমাদের এখানে থাকতে হবে। আরেক দল বললেন, এখন আর এখানে থাকা লাগবে না। অধিকাংশই নেমে গেলেন। তারা ভাবলেন, যুদ্ধ তো এখন শেষই। গিয়ে তারাও গনিমত কুড়াতে শুরু করলেন; কিন্তু ইবনে জুবাইর নবিজির কথায় অটল। তিনি বললেন, আমি নবিজির কথার বিপরীত করব না।

ওদিকে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (যিনি তখনও মুসলমান হননি) পাহাড়ের ওপর এ অল্পসংখ্যক মুসলিম দেখে ঘোড়া নিয়ে এদিকে ফিরলেন। ইকরিমা তার সঙ্গী হলো। তারা মুসলিমদের আমিরসহ একে একে সবাইকে হত্যা করল। এরপর তারা পেছনের দিক থেকে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ শুরু করল।^১

:♣: মুসলিমরা এই আকস্মিক আক্রমণে ভড়কে গেলেন। তারা এলোমেলোভাবে যুদ্ধ করতে থাকলেন। মুশরিকরা মুসলিমদের হত্যা করে যাচ্ছিল। এমনকি নবিজি পর্যন্ত এসে এ আক্রমণের রেশ পড়ল। নবিজির ডান দিকে পাথর এসে পড়ল। বুঝারি দাঁতে আঘাত লাগল। চেহারাও আঘাতপ্রাপ্ত হলো। নবিজির চেহারা থেকে তখন রক্ত বেরুচ্ছিল। নবিজি তা মুছছিলেন আর বলছিলেন—ওই সম্প্রদায় কীভাবে সফল হবে, যারা আল্লাহর পথে ডাকার অপরাধে নিজেদের নবির চেহারা রক্তে রঞ্জিত করে?

আলি রা. পানি ঢালছিলেন, আর ফাতিমা রা. রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। এরপর যখন ফাতিমা রা. দেখলেন রক্ত আরও বেশি বেরোচ্ছে, তখন চাটাইয়ের একটি টুকরা জ্বালিয়ে ছাই করে তা নবিজির ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। তখন রক্ত বন্ধ হলো।^২

১৯৮ তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৮৩; বুঝারি, কিতাবুল জিহাদে বারা রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

১৯৯ সহিহ বুঝারি ও সহিহ মুসলিম। দুজনের বর্ণনার শব্দ প্রায় কাছাকাছি।



:♣: এ ভয়াল অবস্থার মাঝে নবিজিকে হত্যা করা হয়েছে—এই সংবাদ রটল। এ ভয়া সংবাদ মুসলিমদের হৃদয় ভাঙচুর করে দেয়। অনেক দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি এতে বেশ প্রভাবিত হন। তারা বলতে লাগলেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হলে আমরা এখানে থেকে কী করব?

তারা পালাতে শুরু করলেন। আনাস ইবনে নজর বলতে লাগলেন—বরং নবিজির পরে তোমাদের বেঁচে থেকে লাভ নেই। এরপর তিনি কোনো কোনো দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি ও মুনাফিকদের দিকে ইশারা করে বললেন—হে আল্লাহ, তারা যা বলছে, আমি এ থেকে মুক্ত। তারা যা বলছে, আমি এজন্য আপনার কাছে ওজর প্রকাশ করছি। এরপর তিনি তলোয়ার নিয়ে মুশরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।”

:♣: উহুদ যুদ্ধের ও ভয়াল অবস্থার মাঝে নবিজির পাশে থাকা সাহাবায়ে কিরাম নবিজির জন্য উৎসর্গের অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। নবিজির ভালোবাসায় তারা নিজেদের প্রাণ বিলিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন—

উহুদ যুদ্ধের দিন মানুষরা (মুসলিমরা) পরাজিত হয়ে যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছেড়ে যাচ্ছিল, তখন আবু তালহা রা. নবিজির সামনে তার একটি ঢাল দিয়ে ঢাল হয়ে প্রতিরোধ করছিলেন। আবু তালহা ছিলেন একজন ভালো তিরন্দাজ, যুদ্ধে ছিলেন খুব পটু। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু উঁচু হয়ে মুসলিমদের অবস্থা দেখছিলেন। আবু তালহা তখন বলেন—আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনি উঁচু হয়ে দেখবেন না। কাফিরদের তির এসে বিশ্ব হবে। আপনার গলা কাটার পরিবর্তে আমার গলাকাটা যাবে (অর্থাৎ আপনার হত্যার পরিবর্তে আমাকে হত্যা করা হবে।)”

আবু দুজানা রা.; তিনি একদম নুয়ে নবিজির সামনে ঢাল হয়ে কাজ করছিলেন। একের পর এক তির তার পিঠে এসে বিশ্ব হচ্ছিল। জিয়াদ ইবনে সাকানও নবিজির সামনে ঢাল হয়ে কাজ করেন। তিনি নিহত হলেন। তার সঙ্গে পাঁচজন নিহত হলো। ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী, তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন উমারা ইবনে ইয়াজিদ ইবনে সাকান। তিনি নবিজির প্রতিরক্ষায় লড়তে লড়তে এক পর্যায়ে আহত হয়ে পড়লেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—তাকে আমার

৩০০ সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

৩০১ সহিহ বুখারি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৩



নিকট নিয়ে আসো। (নবিজির কাছে নিয়ে এলে) নবিজি সান্নায়াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পায়ে তার মাথা রাখলেন। এরপর আহত সাহাবি মারা গেলেন। তখন তার গাল ছিল রাসূল সান্নায়াহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ের ওপর রাখা।

:৬: যুদ্ধ একপর্যায়ে শেষ হয়ে এলো। মুশরিকরা বিজয়ের খুশিতে দস্তভরে ফিরছিল। এদিকে যুদ্ধের ময়দানে আতঙ্ক। এদিক-সেদিকে পড়ে আছে লশ। হামজা, ইয়ামান, আনাস ইবনে নাজার, মুসআব ইবনে উমায়ের ও অন্যান্যরা। নবিজি হামজার হত্যায় সবচেয়ে বেশি ব্যথিত হলেন। তাকে মুসলা (হত্যার পর অজ্ঞপ্রত্যজ্ঞা কেটে বিকৃত) করা হয়েছে। পেট ফাঁড়া হয়েছে, নাক-কান কাটা হয়েছে। নবিজি শহিদদের দুজনকে একটি কাফনে ঢুকিয়ে বলাছিলেন—তাদের মধ্য থেকে কে কুরআনকে বেশি সংরক্ষণকারী (বা কুরআনের ব্যাপারে বেশি আমলকারী)? যার ব্যাপারে বলা হতো, তাকে আগে কবরে রাখতেন। এরপর তিনি বললেন—

আমি কিয়ামতের দিন এদের সাক্ষী হব। রক্তসহই তাদের দাফন করতে আদেশ দিলেন। তাদের গোসলও দেওয়া হয়নি, সালাতও পড়া হয়নি।”

:৬: মুসলিমদের পরাজয়ে ইহুদি ও মুনাফিকরা বেশ খুশি প্রকাশ করল। ইবনে উবাই ও তার সঙ্গীরা মুসলিমদের বলা শুরু করল—তোমরা আমাদের কথা মানলে তোমাদের কেউ নিহত হতো না।

এরপর তারা নবিজির সম্ভাব্য বিজয় নিয়ে কথা বলা শুরু করল। আদ্রাহ তায়ালা মুনাফিকসহ ইহুদিদের ভয় দেখিয়ে আয়াত নাজিল করেন। এখানে আদ্রাহ তায়ালা উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের যা যা ঘটেছে, এর হিকমতও বর্ণনা করেছেন। কুরআনের বর্ণনায় উহুদ যুদ্ধের চিত্র এভাবে ভুলে ধরা হয়েছে—

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকালবেলা বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন, আর আদ্রাহ সব বিষয়েই শোনেন ও জানেন।”



إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشِلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ

যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারানোর উপক্রম হলো, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহর ওপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত।”

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।”

إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا
بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۚ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.

তোমরা যদি আহত হয়ে থাকো, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান, কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহিদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদের ভালোবাসেন না।”

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ

আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদের পাক-সাক করতে চান এবং কাফিরদের ধবংস করে দিতে চান।”

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ
الصَّابِرِينَ.

৩০৪ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১২২

৩০৫ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৯

৩০৬ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪০

৩০৭ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪১

তোমাদের কী ধারণা, তোমরা জাহাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।”

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَاكُمْ مَا نُحْيُونَ ۚ مِّنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

আর আল্লাহ সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে। এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছ ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছ। আর যা তোমরা চাইতে, তা দেখার পর কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করেছ, তাতে তোমাদের কারও কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারওবা কাম্য ছিল আখিরাত। অতঃপর তোমাদের সরিয়ে দিলেন ওদের ওপর থেকে যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন। কষ্টত তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহর মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।”

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرٰكُمْ فَأَنْتُمْ قَائِلَتُمْ غَمًّا يَغَمُّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

আর তোমরা ওপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারও প্রতি, অথচ রাসূল ডাকছিলেন তোমাদেরকে তোমাদের পেছন দিক থেকে। অতঃপর তোমাদের ওপর এলো শোকের ওপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া কষ্টের জন্য দুঃখ না করো এবং যার সম্মুখীন হচ্ছে, সেজন্য বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন।”

৩০৮ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪২

৩০৯ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫২

৩১০ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৩



ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۚ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۚ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۚ يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا ۚ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ .

অতঃপর তোমাদের ওপড়র শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিল তন্ময় মতো। সে তন্ময় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঝিমোচ্ছিল আর কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল। আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মূর্খদের মতো। তারা বলছিল—আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই?

তুমি বলো, সবকিছুই আল্লাহর হাতে। তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে, তোমার নিকট প্রকাশ করে না সেসবও। তারা বলে আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বলো, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে, তবুও তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসত নিজেদের অবস্থান থেকে, যাদের মৃত্যু লিখে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের বুকে যা রয়েছে, তার পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে, তা পরিস্কার করা ছিল তাঁর কাম্য। আল্লাহ মনের গোপন বিষয় জানেন।”

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ .

তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, শয়তান তাদের বিভ্রান্ত করেছিল তাদেরই পাপের দরুন।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا
ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَىٰ لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا
لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ يُخَيِّ وَيُمِيتُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাদের মতো হয়ে না, যারা কাকির হয়েছে
এবং নিজেদের ভাই-বন্ধুরা যখন কোনো অভিযানে বের হয় কিংবা
জিহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে—তারা যদি আমাদের সাথে
থাকত, তাহলে মরতও না আহতও হতো না। যাতে তারা এ ধারণা
সৃষ্টির মাধ্যমে সংজ্ঞাটদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ
আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমাদের সমস্ত কাজই,
তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আল্লাহ সবকিছুই দেখেন।”

أَوَلَمْآ أَصْبَحْتُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۚ قُلْ هُوَ مِن
عِندِ أَنفُسِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

যখন তোমাদের ওপর একটি মুসিবত এসে পৌঁছল, অথচ তোমরা তার
পূর্বেই জিগুণ কষ্টে পৌঁছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে—এটা কোথা
থেকে এলো? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের ওপর পৌঁছেছে
তোমারই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ এতোক বিবরের ওপর
কমতানীল।”

وَمَا أَصْبَحْتُمْ يَوْمَ التَّغَىٰ الْجَمْعَانِ فَيَا ذِٰنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ.

আর যেদিন দুই দল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে; সেদিন তোমাদের ওপর
যা আপতিত হয়েছে, তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে এবং তা এজন্য যে,
তাতে ঈমানদারদের জানা যায়।”

৩১৩ সূরা আল ইমরান, আয়াত : ১৫৬

৩১৪ সূরা আল ইমরান, আয়াত : ১৫৭

৩১৫ সূরা আল ইমরান, আয়াত : ১৬৬



وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فُتِلَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا ۚ
قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعُنَكُمُ ۚ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ
يَقُولُونَ بِأَفْهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ.

এবং তাদের যাতে শনাক্ত করা যায়—যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদের বলা হলো—এসো আল্লাহর রাহে লড়াই করো কিংবা শত্রুদের প্রতিহত করো। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরির কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই, তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে। বন্ধুত্ব আল্লাহ ভালোভাবে জানেন—তারা যা কিছু গোপন করে থাকে।”

الَّذِينَ قَالُوا لِلْإِخْوَانِ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۚ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

ওরা হলো সেসব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে—যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হতো না। তাদের বলে দিন—এবার তোমাদের নিজেদের ওপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।”

:৬: শনিবার সন্ধ্যায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ থেকে ফিরলেন। তিনি ও সাহাবায়ে কিরাম মদিনায় রাত যাপন করলেন। মুসলিমরা আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করলেন। রবিবারে ফজরের সালাত আদায়ের পর বিলালকে আদেশ করলেন, তিনি যেন এ ঘোষণা দেন—‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের শত্রুর অনুসন্ধানের বের হতে আদেশ করেছেন। তবে এবার আমাদের সাথে তারাই থাকবে; যারা গতকাল আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।...’

পতাকা এখনও খুলে রাখা হয়নি। নবিজি পতাকা নিয়ে আসতে বললেন। পতাকা দিলেন আলি রা.-এর হাতে। সাহাবায়ে কিরাম এই ক্ষতবিক্ষত নিশ্চল দেহ নিয়েই বের হলেন। হামরাউল আসাদ (মদিনা থেকে দশ মাইল দূরে একটি স্থান)-এ তারা



সেনাছাউনি ফেললেন। তারা সেখানে বিশাল আগুন জ্বালালেন। অনেক দূরে থেকে যেন এ আগুন দেখা যায়। এবং কাফিররা যেন মনে করে, এখানে অনেক মুসলিম অবস্থান করছেন।

:♠: খুজাআ গোত্রের মাবাদ আল জুহানি (যিনি তখনও মুশরিক ছিলেন)। মুসলিমদের পাশে অতিক্রম করে মুশরিকদের পাশে গেলেন। তারা তখন বিজয়ের খুশিতে ছিল আত্মহারা। তারা মদিনায় এসে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ চালানোরও ফন্দি করছিল; কিন্তু সাকওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ তাদের এ থেকে নিষেধ করছিল। আবু সুফিয়ান মাবাদকে দেখে বললেন—মাবাদ, কী দেখে এলে? সে বলল, তোমাদের জন্য আফসোস, মুহাম্মাদ বিশাল দল নিয়ে তোমাদের ঘোঁড়ে বের হয়েছে। আমি যে ধরনের বড়ো আগুনের কুণ্ডলী জ্বলতে দেখেছি। তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের এ রকম আর দেখিনি। তারা তোমাদের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ। আমি আগে এত ক্ষুব্ধ হতে দেখিনি।...’

এ কথা শোনার পর আব্দাাহ তায়াল্লা মুশরিকদের অন্তরে বিশাল ভয়ের সৃষ্টি করলেন। তারা দ্রুত মকায় ফিরে যেতে মনস্থ করল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামরাউল আসাদে সোম, মঙ্গল ও বুধ তিন দিন অবস্থান করলেন। এরপর মদিনায় ফিরে এলেন।”

* * *



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

প্রতি যুগের মানুষের জন্যই উহুদ

উহুদ যুগের এই পর্বে নবিজির জীবনী থেকে আমাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয়। ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা উহুদ যুগের বর্ণনার ব্যাপারে যে রকম জেনেছি, যুদ্ধটি এ রকম হওয়ার মূল কারণ হলো, শত্রুদের সাথে যুদ্ধে মুসলিমরা কীভাবে বিজয় লাভ করবেন, এ বিষয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া। প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলের সময় কীভাবে সতর্ক থাকতে হবে, সে বিষয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া। এবার তাহলে আমরা সেইসব শিক্ষাগুলো নিয়ে একটু জানার চেষ্টা করি—

এক.

এখানে নবিজির সারাজীবনের অন্যতম আদর্শের প্রকাশ ঘটেছে। তা হলো, পরামর্শের যোগ্য বিষয়ে পরামর্শ; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যাবে, অ্যানপারামর্শের সাথে পূর্বের পরামর্শগুলোর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আমরা দেখেছি, সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের সিংহাস্তে লজ্জিত হওয়ার পরও নবিজি যুদ্ধাঙ্গ গায়ে জড়িয়ে ফেললেন, তখন আর তিনি বের হওয়ার সিংহাস্ত থেকে ফিরে আসেননি। এ ছাড়া পরামর্শের সময় মদিনায় থেকে যাওয়ার প্রতি নবিজির ঝোঁক বা প্রায় একরকম ঝোঁক ছিল। তবুও নবিজি পরামর্শের ভিত্তিতে মদিনার বাইরে বেরোনোর যেই সিংহাস্ত গৃহীত হয়েছে, তা থেকে সরে আসেননি। কেন?

সম্ভবত এর কারণ, পরামর্শের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। নবিজি যুগের পুরো প্রস্তুতি নিয়েছেন, গায়ে যুদ্ধাঙ্গ জড়িয়েছেন, অস্ত্র হাতে তুলেছেন। এরপর তাই গৃহীত সিংহাস্তের বিপরীত যে চিন্তা করা হয়েছে, সেটা নীতির খেলাফ। পরামর্শের আদর্শ হলো—পরামর্শে যা-ই সিংহাস্ত হোক, তাতে সুদৃঢ় থাকা। বিশেষত এ রকম একটা স্পর্শকাতর বিষয়ে তা আরও কাম্য।



এরপর এখানে পরামর্শে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীতে কথা বলার দ্বারা আরেকটা ব্যাপার প্রকাশ পায়। তা হলো, মনের দুর্বলতা। এটা ভয়, শঙ্কা ও নিজেদের গুটিয়ে রাখার পথ ধরেই আসে।

এ কারণেই নবিজি সাম্রাজ্যে আল্লাহি ওয়া সাম্রাম তাদের কথা ও অবস্থার পরিবর্তনের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন—

কোনো নবি অস্ত্রসজ্জিত হয়ে গেলে যুদ্ধ করা পর্যন্ত তাঁর জন্য যুদ্ধান্ত্র খুলে ফেলা উচিত নয়।

দুই.

এ যুদ্ধে প্রথমদিকে মুনাফিকদের বড়ো একটা শ্রেণির অংশগ্রহণ ছিল। এর পেছনেও বড়ো হিকমত রয়েছে। তা হলো, মুসলিমদের সাথে মিশে যাওয়া মুনাফিক গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা। আর এতে মুসলিমদের ভবিষ্যতের পথচলার বিশেষ অভিজ্ঞতার পাঠ রয়েছে।

আমরা দেখেছি, কীভাবে ইবনে উবাই ৩০০ জনকে নিয়ে মাঝপথ থেকে ফিরে যায়। এর বাহ্যিক কারণ বোঝাতে চেয়েছিল, নবিজি কাঁচা বৃষ্টির অধিকারী যুবকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ বয়স্কদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। এটা দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে না। তাই সে ফিরে যাচ্ছে। এটা বাহ্যদৃষ্টিতে চটকদার যুক্তি; কিন্তু বাস্তবতা মোটেও এ রকম ছিল না। সে মূলত যুদ্ধের ইচ্ছাই করেনি। কেন সে নিজেকে বিপদে ফেলতে যাবে? কেন নিজেকে অসুখা শেষ করে দেবে?...

এটা মুনাফিকদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। তারা গনিমতের পেছনে ছুটবে, কিন্তু কোনো কষ্ট স্বীকার করবে না। ইসলামের দুটি বিষয়ের সাথে তাদের সম্পর্ক দু-রকম—

- ০১. গনিমত; যা তারা চায়।
- ০২. বিপদ; যা তারা চায় না।

তিন.

নবিজি এ যুদ্ধে অমুসলিমদের সাহায্য নেননি। অথচ এ সহযোগিতার ভীষণ প্রয়োজন ছিল। মুসলিমের সৈন্যসংখ্যা কম; কিন্তু এরপরও নবিজি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন—



আহলুস শিরকের মোকাবিলা করতে গিয়ে আহলুস শিরকের সাহায্য নেব না।^{৩১৯}

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন—

এক ব্যক্তি বদরের দিন নবিজির সঙ্গে যুদ্ধের জন্য বের হতে চাইছিল।
নবিজি তাকে বললেন—তুমি কি আল্লাহর ব্যাপারে ইমান আনো?

সে বলল—না।

নবিজি বললেন—তাহলে কিরে যাও। আমি কখনো কোনো মুশরিকের
সাহায্য নেব না।

এখানে থেকে জুমহুর আলিমগণ (আলিমদের বড়ো অংশ) বলেন, যুদ্ধের কাকিরদের
সাহায্য নেওয়া জায়িজ নেই। ইমাম শাফিয়ি এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছেন।
তিনি বলেন—

إن رأى الإمام أن الكافر حسن الرأي والأمانة في المسلمين و كانت
الحاجة داعية إلى الاستعانة به جاز وإلا فلا^{৩২০}

ইমাম যদি মনে করেন, কাকিরের উদ্দেশ্য ভালো, সে মুসলিমদের সাথে
আমানত ঠিক রাখবে (বিশ্বাসঘাতকতা করবে না) এবং এ সাহায্যের
প্রয়োজনও হয়, তাহলে জায়িজ আছে; অন্যথায় নয়।^{৩২১}

প্রয়োজনে আহলে কিতাবদের সাহায্য নেওয়া যাবে—বিভিন্ন দলিল থেকে এর
সমর্থন পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে—হুনাইনের যুদ্ধের দিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম সাকুওয়ান ইবনে উমাইয়ার সাহায্য নিয়েছেন। মাসরালাটি মূলত শরয়ি
সিয়্যাসাতের (ইসলামি রাজনীতি) সাথে সম্পৃক্ত। (তাই এখানে এ ব্যাপারে বিশদ
আলোচনা করতে যাচ্ছি না।) বদর ও উহুদে এক রকম এবং হুনাইনে আরেক রকম
সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে বর্ণনা করব।

৩১৯ হাদিসের বর্ণনায় পাওয়া যায়—যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিতে চাইছিল, তারা ইহুদি। আর ইহুদিরা
হয়ে আহলে কিতাব। এবার প্রশ্ন জাগে—নবিজি আহলে কিতাবদের কীভাবে ‘আহলুস শিরক’ বললেন?

এর উত্তরে বলা হবে তাদের ক্ষেত্রে যে শিরকের প্ররোণ করা হয়েছে, এটা মূলত পারিভাষিক ব্যুৎপত্তি থেকে না;
অর্থাৎ, মকর মুশরিকদের ওপর যেই অর্থে এর প্রয়োগ করা হতো, সে অর্থে না। এটা শুধু ‘অর্থের ব্যাপকতার’ দিক
থেকে বলা হয়েছে।

৩২০ বিস্তারিত জানতে দেখুন—^{৬/২২১}مغني المحتاج



চর.

সামুরা ইবনে জুনদুব ও রাফি ইবনে খাদিজ—এ দুজনের ব্যাপারটি আমাদের বেশ ভাবায়। তখন তাদের বয়েস পনেরো বছরও পার হয়নি। কীভাবে তারা নবিজির কাছে এসে যুশ্বের আশ্রয় প্রকাশ করেন! কত ভয়ংকর যুশ্ব! মৃত্যু যেখানে প্রায় নিশ্চিত! যেখানে সংখ্যার কোনো সমতা নেই। কাফিররা তিন হাজারেরও ওপরে। আর মুসলিমরা সর্বসাকুল্যে ৭০০’।

তাদের সাহসিকতার মূল্যায়নে কিছু চিন্তকের চিন্তা দেখে আমি বড়ো আশ্চর্যান্বিত হই। তারা মনে করেন—আরবদের ক্ষেত্রে এটা খুবই স্বাভাবিক। পরিবেশেটাই ছিল এমন যে, তাদের যুশ্বে যুশ্বে বেড়ে উঠতে হতো। এ কারণে যুদ্ধবিগ্রহকে তাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ ছিল না।

কোনো সন্দেহ নেই—এসব চিন্তক বাস্তবতাকে ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। আসলে তাদের এ কথার বাস্তবতা কতটুকু? ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ইবনে উবাই ৩০০ জনকে নিয়ে কেটে পড়ল। গরমের দিনে যারা একসময় মদিনার সুমিষ্ট পানি খেয়ে জীবন বাঁচিয়েছে, যারা মদিনার ছায়ায় বেড়ে উঠেছে, তাদের নবিজি যখন যুশ্বে বের হওয়ার জন্য ডাকলেন, তখন তারা বলল—

لا تنفروا في الحر

তোমরা গরমের দিনে বের হয়ো না।

মুশরিকরা সংখ্যায় বিপুল হওয়ার পরও বদরে চরমভাবে পরাজয় বরণ করল। তারা ভয়ানক হলো। এরাই তো সেইসব লোক—যারা যুশ্বের পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল।

একজন নিরপেক্ষ, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এ বাস্তবতাকে কখনোই অস্বীকার করতে পারে না। এড়াতে পারে না। এই যে বালকদের রণাঙ্গানে ঝাঁপিয়ে পড়ার অদম্য স্পৃহা—এটা তাদের হৃদয়ে বন্ধমূল ঈমানি চেতনার কারণেই সম্ভব হয়েছে। নবিজির অসম্ভব ভালোবাসা থাকলেই তা সম্ভব। যেখানেই এ রকম ঈমানি চেতনা পাওয়া যাবে, যেখানেই এ রকম ভালোবাসা মিলবে। সেখানেই এ রকম বীরত্বের উপাখ্যান তৈরি হবে। আর যেখানে ঈমানের দুর্বলতা থাকবে, যেখানে ভালোবাসার কমতি থাকবে, সেখানে পিছুটান ছাড়া অন্য কিছু দেখা যাবে না।



ফিকহুস সিরাহ

পাঁচ.

একটু চিন্তা করে দেখেন তো, নবিজি সাহাবায়ে কিরামকে সারিবন্দ করছেন। পেছনে নিরাপত্তা বাহিনী রাখছেন। তাদের আদেশ করছেন—‘তোমরা আমার পক্ষ থেকে আদেশ আসা পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই স্থান ত্যাগ করবে না।’ এসব থেকে যে অনস্বীকার্য বাস্তবতাটি আপনার সামনে ফুটে উঠবে, কী সেটি?

নবিজির সমরকৌশল। এক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অনন্য। এটি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দান। আর তাঁর এই অভিজ্ঞতা ও প্রতিভা নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার ভেতর দিয়েই প্রস্ফুটিত হয়েছিল। এর দাবি হলো—তিনি রণকৌশল-সমরকৌশল ইত্যাদি সবকিছুতেই হবেন অনন্য। যেভাবে এটা দাবি করে, তিনি সব ধরনের ইনহিরাফ ও জালালাত থেকে মুক্ত হবেন।”

ব্যাপকভাবে সবাইকে, বিশেষভাবে তিরন্দাজদের নবিজিরে এই সূক্ষ্ম নির্দেশনা দেওয়ার সাথে পরবর্তী কাহিনির পূর্বাভাস রয়েছে। নবিজি সাম্রাজ্যহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দূরদর্শিতা বা ওহির আলোকে বুঝতে পেরেছিলেন, পরবর্তী সময়ে কী ঘটবে। তাই সে অনুযায়ী তিনি আগাম নির্দেশনা দেন। নবিজি এখানে তাদের অন্যতম শত্রু তথা প্রবৃত্তি, সম্পদের প্রতি লোভের মোকাবিলার অন্যতম পরিকল্পনা নিয়েছেন। এটা ভালো পরিকল্পনা। আর একটি ভালো পরিকল্পনা প্রায়ই ভালো ফলাফল বয়ে আনে।

এখানে যদিও নেতিবাচক ফলাফল এসেছে, তবুও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কখনো নেতিবাচক ফল ইতিবাচক ফল থেকেও বেশি উপকার বয়ে আনে।

ছয়.

আবু দুজানা নবিজির হাত থেকে তলোয়ার নিয়ে দস্তভঞ্জে কাতারে চলছিলেন। নবিজি তাতে নিষেধ করেননি। তিনি এইটুকু বলেছেন—

এ স্থান ছাড়া অন্য স্থানগুলোতে এ ধরনের চলাকে আল্লাহ তায়ালার অপছন্দ করেন।

এ থেকে বোঝা যায়—সাধারণ ক্ষেত্রে দস্ত-অহংকার নাজাযিজ। তবে যুদ্ধ চলাকালে এর বিধান পরিবর্তন হয়ে যায়। অর্থাৎ একজন মুসলিম সাধারণ অবস্থায় জমিনে



দস্তভরে চলবে না। এটা হারাম; কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে তা অপহৃন্দের ব্যাপার নয়; বরং তা কাম্য। এখানে একটা জিনিস মনে রাখা ভালো, ঘরবাড়ি, বিলাসবহুল আসবাবপত্র, স্বর্ণ-রূপা ইত্যাদি দিয়ে সাজানোও অহংকারের আলামত। তবে এসব দিয়ে যুদ্ধোত্তম সাজানো নিষেধ না। এখানে অহংকার হবে কী করে? এটা তো মূলত ইসলামের দাপটের বড়াই। তার ওপর এসব বিষয় মানসিক আক্রমণেও একটা ভূমিকা রাখে। যা গুরুত্বপূর্ণ। যেটাকে হাতছাড়া করা যায় না।

সাত.

আমরা যখন পুরো যুদ্ধকে বিশ্লেষণ করতে যাব, তখন এর দুটি ভাগ আমাদের সামনে আসবে—

০১. মুসলিমরা তাদের সেনাপ্রধানের কথা ও নির্দেশনার খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। এর ফলাফল কী দাঁড়িয়েছিল? মুসলিমরা দ্রুত বিজয় লাভ করেছেন। কাফিররা ভীষণ রকমের পরাজয় বরণ করেছে। তিন হাজারের বিশাল বাহিনীর অন্তরে ভয়ের সৃষ্টি হলো। তারা পালাল। এ দিকটা এ আয়াতে ফুটে উঠেছে—

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ

আর আল্লাহ সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে।”

০২. মুসলিমরা পরাজিত মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করেন। যাকে নাগালে পাবেন, খতম করে ছাড়বেন। গনিমত কুড়াবেন। পাহাড়ের ওপর থাকে সাহাবায়ে কিরাম এ দৃশ্য দেখেন—তাদের ভাইয়েরা শত্রুদের কচুকাটা করে গনিমত লাভ করছে। তাই তাদের কেউ কেউ সেই গনিমতে অংশগ্রহণের ইচ্ছে করলেন। তারা মনে করলেন—নবিজি যেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এখন সেই নির্দেশের মেয়াদ শেষ। তাই তারা নবিজির অনুমতিরও প্রয়োজন অনুভব করলেন না। তাদের এই সিদ্ধান্তে অন্যরা আপত্তি জানাচ্ছিলেন। আপত্তিকারীদের অগ্রগামী ছিলেন তাদের আমির ইবনে জুবাইর রা.; কিন্তু আপত্তি উপেক্ষা



করে ভুল ইজতিহাদ করে তারা গনিমতের দিকে ছুটে গেলেন। এর ফলাফল কী দাঁড়িয়েছিল?

যেই মুশরিকরা ছিল ভয়াতুর, তারা দুঃসাহস দেখানো শুরু করল। পলায়নরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ প্রতারণার আশ্রয় নিলেন। তিনি দেখলেন, পাহাড়ের চূড়া প্রায় শূন্য। লোকসমাগম নেই। প্রতিরক্ষা বা পাহারাদারি করার মতো কেউ নেই। সামরিক বৃষ্টি তার মাথায় খেলে গেল। তিনি তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে পাহাড়ের দিকে ঘুরে গেলেন। পাহাড়ের চূড়ায় যে অল্পকয়জন ছিলেন, তাদের হত্যা করে ফেললেন। এরপর পেছন দিক দিয়ে ঢুকে রণাঙ্গানে থাকা মুসলিমদের ওপর তির নিক্ষেপ শুরু করলেন। শুরু হলো মুসলিমদের ভয় ভয় অবস্থা। এ অংশটা কুরআনুল কারিম তুলে ধরেছে এভাবে—

حَتَّىٰ إِذَا فِشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّن بَعْدَ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে এবং কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করেছে, তাতে তোমাদের কারও কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারও বা কাম্য ছিল আখিরাত। অতঃপর তোমাদের সরিয়ে দিলেন ওদের ওপর থেকে, যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।”

একটু ভেবে দেখেন, এর ক্ষতি কতদূর গড়ায়। কী হয়েছিল শেষাবস্থা।

অল্পসংখ্যকের ভুলের প্রভাব সবার মাঝে পড়ে। সবার জন্যই বিপদ ডেকে আনে। এমনকি নবিজিকেও...এটাই আল্লাহর সূন্নাত (শাশ্বত বিধান)। স্বয়ং নবিজি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়নি। অথচ এই নবিজিই তো সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

তাদের ভুল ও আজকালের আমাদের ভুলকে তুলনা করেন। আমাদের যাপিত জীবনে আমরা কত রকম ভুলে ডুবে আছি! চিন্তা করে দেখেন, আমরা আজকাল ‘আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার’ (সংকাজের আদেশ অসংকাজের নিষেধ) পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি। এর জন্য আমরা কোনো পদক্ষেপও নিছি না। তবুও আল্লাহপাক আমাদের ছাড় দিচ্ছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের ওপর কতটুকু দয়া করছেন!

আপনি যখন এসব নিয়ে ভাববেন, তখন কিছু ধর্মের উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন। আজকাল মুসলিমরা মুসলিম হওয়ার পরও কাকিরদের কাছে পরাজিত হচ্ছে। মার খাচ্ছে। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো তাদের শেষ করে চলেছে। কেন এ রকম হচ্ছে?

আট.

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধে বিরাট ব্যথা পেয়েছেন। শরীরে ও মাথায় আঘাত লেগেছে। দাঁত ভেঙেছে, চেহারা রক্তাক্ত হয়েছে। কয়েকজনের ভুলের মশুল অন্যদের সাথে তাঁকেও দিতে হয়েছে।

একটা প্রশ্ন—নবিজি জীবিত নেই—এ কথাটার হেতু কী?

মুসলিমদের মাঝে তাঁর উপস্থিতি ও সজ্জাদান—এটা তাদের জন্য অন্যতম শক্তি। তারা নবিজির বিচ্ছেদকে কখনো সহ্য করে পারতেন না। তাঁর পরে তারা ভরসার কাউকে ভাবতে পারতেন না। তাই যেন নবিজির মৃত্যু খবর তাদের ধারণায়ও ছিল না। তাদের মনের আশপাশেও ছিল না। যদিও পরবর্তী সময়ে তাদের ভুল ভেঙেছে; পরে তারা বাস্তবতায় ফিরে এসেছেন, তবুও এ বিষয়টা তাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। এর তাদের ঈমানি কাঠামোতে নাড়া পড়েছে; বরং তা অনেকেরই হৃদয় চুরমার করে দিয়েছে!

হিকমতের দাবি ছিল এটাই। এ রকম ঘটনা ঘটুক। যাতে করে তাদের অভিজ্ঞতা লাভ হয়। যেন তারা সংবিৎ ফিরে পান। যেই বাস্তবতায় থাকা উচিত ছিল, তারা যেন সে বাস্তবতায় ফিরে আসেন।

আর নবিজি যদি (বাস্তবেই) তাদের মাঝ থেকে চলে যান, তখন তারা যেন পেছনে না হটেন। মুসলিমদের এ দুঃসময়ে নবিজির মৃত্যু সংবাদ রটার পর, এ গুরুত্বপূর্ণ পাঠের জন্যই আয়াত নাজিল হয়—



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ
 انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا
 وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣﴾

আর মুহাম্মাদ একজন রাসুল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রাসুল
 অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা
 নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? কবুত কেউ যদি
 পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃশি হবে না। আর
 যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সাওয়াব দান করবেন।”

এ পাঠের একটা ইতিবাচক ফলও পরবর্তী সময়ে চোখে পড়ে। নবিজি যেদিন দুনিয়া
 থেকে বিদায় নেন, সেদিন উহুদ যুদ্ধের একটা আবহ বিরাজ করার মতো অবস্থা
 ছিল। কিছু সে রকম অবস্থা বিরাজ করেনি। আগের নাজিল হওয়া আয়াত সেটা
 মুসলিমদের জাগিয়ে তোলে। তারা বাস্তবতায় বসবাস করেন। ব্যথিত হৃদয়ে তারা
 নবিজিকে বিদায় দেন। এরপর সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের কর্তব্য—দাওয়াত, জিহাদ
 কি সাবিলিল্লাহয় নিয়োজিত হন। তারা দুর্মর ঈমানের সাথে, আল্লাহর ওপর ভরসা
 করে নিজেদের কর্তব্যে জেগে ওঠেন।

নয়.

সাহাবায়ে কিরামের উৎসর্গ ও নিজেদের বিলিয়ে দেওয়ার চিত্রগুলো একটু কল্পনা
 করুন। তারা নবিজিকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করছেন। নবিজির দিকে ছুটে
 আসা তির নিজের শরীরে পেতে নিচ্ছেন। একের পর এক ঝরে পড়ছেন! আল্লাহু
 আকবার!

এসব কিছুর মধ্য দিয়েও তারা নবিজির জীবন বাঁচাতে তৎপর। তাদের কোনো
 পরোয়া নেই। কেন তাদের এই উৎসর্গ? নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দেওয়া?

প্রথম কথা হলো—আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি সুদৃঢ় ঈমান। এরপর নবিজির প্রতি
 তাদের অসম্ভব ভালোবাসা। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি সুদৃঢ় ঈমান, নবিজির
 প্রতি নির্জলা ভালোবাসা এগুলোই তাদের জীবনোৎসর্গ করতে প্রাণিত করছিল।
 এজন্য একজন মুসলিমের জন্য দুটো জিনিসই আবশ্যিক। তার হৃদয়-মন নবিজির



ভালোবাসায় ভরপুর হওয়া পর্যন্ত সে একজন পূর্ণাঙ্গা মুমিন হতে পারে না। এ কথাটিই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ভাষায় বলেছেন—

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (প্রকৃত) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সম্মানসম্মতি ও সব মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হই।”

ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন—আল্লাহ তায়ালা মানুষের মাঝে বিশেষ দুটি শক্তি রেখেছেন—

■ এক. চিন্তাশক্তি।

■ দুই. হৃদয়।

চিন্তাশক্তি দিয়ে সে চিন্তা করবে, সে ঈমান আনবে। আর হৃদয় দিয়ে সে আল্লাহ যা ভালোবাসতে বলেছেন, তা ভালোবাসবে। যা ঘৃণা করতে বলেছেন, তা ঘৃণা করবে। তার অন্তর যখন আল্লাহ, তাঁর রাসুলের ও সালিহিনদের (সংকর্ষশীল) ভালোবাসাশূন্য হবে, তখন তাতে প্রবৃত্তির দখল বসবে। আর যখন হৃদয়ে প্রবৃত্তির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে, তখন সে হৃদয় থেকে উৎসর্গের দেখা পাওয়া আকাশকুসুম কল্পনার মতোই।

শাস্ত্রত এসব বাস্তবতা অনেক দার্শনিকের নিকট স্বীকৃত। বাস্তবতাও এর বড়ো সাক্ষী। এ ব্যাপারে দার্শনিক Jean-Jacques Rousseau-এর বক্তব্য শোনেন। তিনি তার বই إميل (Emile)-এ লিখেছেন—

শুধু চিন্তা-দর্শনের ওপর ভিত্তি করে (মানুষের মাঝে) ইতিবাচক মূল্যবোধ জাগানো নিয়ে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। (ইতিবাচক মূল্যবোধ জাগানোর ক্ষেত্রে) এটা কি ভিত্তি? এটা কোন ধরনের মূলনীতি?...তাদের কথামতে, আইনই ইতিবাচক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করবে; কিন্তু আইনের এ দর্শন কি আমার একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলতে পারবে?...অনুমানের এ দর্শন শুধু শব্দ ও কথার ফুলঝুরি।”...



১৯৩৩ সালে আমেরিকা যখন নাইটক্লাবসহ বিভিন্ন আসরে মদের বর্ণাঢ্য আয়োজন নিষেধ করতে গেল, তখন তা থেকে মানুষকে সংযত করা যায়নি। কিছুকাল পরেই আইনকারী ব্যক্তিরাই উলটো পথে চলল। ভোগের বশ্তুনার ব্যথায় তারা ছিল দোদুল্যমান। পরিশেষে তারা যেই আবশ্যকীয় আইন করেছিল, তা বাতিল করল। নতুন করে আবার ভোগে মত্ত হলো...

ওদিকে ইসলামের ইতিহাস দেখেন। যখন মদ নিষিদ্ধ হলো, তখন সাহাবায়ে কিরাম নিরঙ্কুশচিত্তে তা মেনে নেন। মদের পাত্রগুলো ছুড়ে ফেলেন। পথে পথে মদ বয়ে যায়। এপরও তারা বলছিলেন—

انتھینا یا رب انتھینا

হে রব, আমরা তো শেষ হয়ে গেছি!

দুটি ঘটনার মধ্যে পার্থক্য হলো—তাদের মনে এমন কিছু আছে, যার কারণে তাদের প্রবৃত্তি আল্লাহর বিধানের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। আর তা হলো, ভালোবাসা। নবিজির প্রতি তাদের এই তীব্র ভালোবাসাই নবিজির জন্য উৎসর্গ হতে প্ররোচিত করছিল। নবিজির জীবন রক্ষা করতে গিয়ে তারা নিজের প্রাণটা পর্যন্ত বলিয়ে দিয়েছেন। উহুদ যুদ্ধে নবির জন্য এ রকম অপূর্ব ভালোবাসার দৃষ্টান্ত বহু। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন—

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে বললেন—
সাদ ইবনের রাবির খোঁজ কে নিয়ে আসবে? সে জীবিত না মৃত, তা কে দেখে আসবে?

এক আনসারি বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি সাদের ব্যাপারটা দেখে আসব। সাহাবি গিয়ে দেখলেন—সাদ রণাঙ্গনে আহত হয়ে পড়ে আছেন। জীবনসায়াকে তিনি দুনিয়ার জিন্দেগির শেষ মুহূর্ত পার করছেন।

তিনি সাদকে বললেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আদেশ করেছেন, তুমি কি জীবিত না মৃত—তা দেখে যেতে!..



তিনি বললেন—এই তো শেষ বিদায় নিচ্ছি আমি। তুমি নবিক্সির নিকট আমার সালাম পৌঁছে দিয়েও এবং তুমি নবিক্সিকে বলো—সাদ ইবনের রাবি আপনার কাছে বলে পাঠিয়েছে—

وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما
جزى نبيا عن أمته

আল্লাহ তায়ালা একজন নবিকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে যতটুকু
প্রতিদান দিয়ে থাকেন, আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তায়ালা
আপনাকে সে রকম প্রতিদান দিক।...

আনসারি সাহাবি বলেন—আমি স্থান ত্যাগ করার আগেই তিনি মারা
যান।

আজকের সময়ে যেদিন মুসলিমদের অন্তর এ রকম ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হবে,
মুসলিমরা তাদের প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকবে, প্রবৃত্তিকে নিজেদের বশ করে নেবে, আমি
বলতে পারি—সেদিন নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে। তারা আর সেদিন মার খাবে না,
শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ করবে। প্রতিবন্ধকতা যতই আসুক, এটা হবেই।

কীভাবে তা অর্জন করা সম্ভব?

জিকির করা; অর্থাৎ, নবিক্সির কথা বেশি বেশি আলোচনা ও বেশি বেশি দরুদ পড়া।
আল্লাহর নিয়ামতরাজি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা, নবিক্সির সিরাত (জীবনচরিত)
শামায়িল (জীবনবৈশিষ্ট্য) নিয়ে বেশি বেশি ভাবা। তবে এসব কিছু নিষ্ঠার সাথে
ভালোভাবে ইবাদত আদায় করার পরের স্তর। আগে (আবশ্যকীয়) ইবাদত (বিধান)
ভালো করে পালন করতে হবে। এরপর এসব বিষয়ও অর্জন করতে হবে।

দশ.

আমরা সহিহ বুখারির বর্ণনায় দেখেছি—নবিক্সি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
শহিদদের জানাজা পড়া ছাড়াই রক্তসহ দাফন করতে বললেন। দুজনকে এক কবরে
দাফন করা হয়।

এখান থেকে আলিমগণ বলেন—জিহাদের ময়দানে যারা শহিদ হবে, তাদের গোসল
দেওয়া হবে না, জানাজাও পড়া হবে না; বরং রক্তসহই দাফন করা হবে।

ইমাম শাফি'রি রহ. বলেন—



শিকহস সিরাহ

মুতাওয়াতির হাদিস থেকে বোঝা যায়, তাদের জানাজা পড়া হবে না। আর ‘নবিজি দশজন দশজন করে তাদের জানাজা পড়েন, প্রতিবারই হামজা ছিলেন। সব মিলিয়ে সম্ভববার পড়া হয়, সম্ভববার’—এই যে বর্ণনা এটা দুর্বল। বর্ণনাটা ভুল।

এগারো.

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ফিরে আসার পরপরই দ্বিতীয়বার মুশরিকদের খাওয়া করার জন্য বের হন—এ ব্যাপারে ভাবলে আমরা উহুদ যুদ্ধ থেকে পরিপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারব। আমাদের সামনে এখান থেকে ইতিবাচক নেতিবাচক দুটি দিকই ফুটে উঠবে। এখানে আমাদের স্বীকার করতেই হবে, বিজয় এসে থাকে সবার, (ধৈর্য) ইতাআত (অনুসরণ), আমালুস সালিহা (সংকাজ), সেনাপতির আদেশ মান্য করা, নিরঙ্কুশ ধীরের উদ্দেশ্যে কাজ করার মাধ্যমে।

আমরা দেখেছি, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার সবাইকে অনুমতি দেননি। শুধু গতকাল যারা অংশ নিয়েছিল, তারাই অংশ নেবে। সাহাবায়ে কিরাম এসে এখনও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেননি। দেহ ক্ষতবিক্ষত। বিজয়ের খুশিতে আটখানা হওয়া মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরাম ছুটলেন। তখন অবস্থাটা এমন ছিল না যে, তারা গনিমতে লোভ করবেন। তারা ক্ষতবিক্ষত ক্লান্ত দেহ নিয়েই আল্লাহর রাহে নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিতে বা বিজয় লাভ করতে বের হলেন। এর ফলাফল কী হলো?

মুশরিকরা আনন্দ-খুশিতে আত্মহারা হয়ে থাকলেও তাদের কাক্ষিত বিজয় অর্জন হয়নি। আর মুসলিমদের এই ক্ষতবিক্ষত নিশ্চিন্দ দেহ ইত্যাদিও তাদের চূড়ান্ত বিজয়ের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

এটা কীভাবে সম্ভব হয়েছে?

এখানেও আল্লাহর সেই অলৌকিক শক্তি কাজ করছিল। যেন আমরা এখান থেকে পাঠ নিতে পারি। ওই ব্যক্তির সংবাদ—‘এবার মুহাম্মাদ তো মৃত্যু হাতে নিয়ে তার সজ্জী-সাথিদের নিয়ে এসেছে’—তাদের মনে ভয়ের সৃষ্টি করল। ফলে তারা মদিনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়ার পরও মকায় দ্রুত ছুটল....

কীভাবে অবস্থার এতটা পরিবর্তন ঘটল? কিছুকাল আগে যারা বীরদর্পে সব উড়িয়ে দিচ্ছিল, তারাই এখন ভয়ে থিতু!



উত্তর এটাই—আল্লাহ তায়ালাই ইচ্ছা।

এখানে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো দিক এনে আল্লাহ তায়ালা এতে আমাদের জন্য বিশাল পাঠ রেখেছেন।

পরিশেষে উল্লুদের পাঠ পূর্ণ করতে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়—

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ

যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেজ্জাগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সাওয়াব।

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

যাদের লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজসরঞ্জাম; তাদের ভয় করো। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে—আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই-না চমৎকার কামিয়াবিদানকারী!

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ دِيَارِهِمْ فَأَتَىٰ خِثْيَاءَ الْأُتَىٰ ۚ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

অতঃপর ফিরে এলো মুসলিমরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হলো। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট।”

* * *





ইয়াওমুর রাজি ও বিরে মাউনা

ইয়াওমুর রাজি

তৃতীয় হিজরি। আদাল ও কারাহ গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল নবিজির নিকট এলো। তারা বলল—তারা ইসলামের ব্যাপারে জেনেছে। (তাদের মাঝে ইসলাম ছড়িয়েছে)। এখন তাদের স্থানি বিষয়াদি শেখা প্রয়োজন। নবিজি তাদের কথায় সাহাবায়ে কিরামের একটি দল পাঠালেন। সে দলে ছিলেন মারসাদ ইবনে আবু মারসাদ, খালিদ, জায়িদ ইবনে আবু বুকাইর, আসিম ইবনে সাবিত, খুবাইব ইবনে আদি, জায়িদ ইবনেদ দাসিনাহ, আবদুল্লাহ ইবনে তারিক। তাদের প্রধান ছিলেন আসিম ইবনে সাবিত। ইমাম বুখারি আবু হুরাইরার সূত্রে বর্ণনা করেন—

‘তারা পথ চলতে লাগলেন। যখন উসফান ও মক্কার মাঝামাঝি স্থানে তারা অবস্থান করছিলেন, তখন বনু লিহয়ানকে (হুজাইলের শাখাগোত্র) তাদের আগমনের সংবাদ দেওয়া হলো। তারা সাহাবায়ে কিরামের খোঁজে চলল। প্রায় একশত তিরন্দাজ সাহাবির পথ অনুসরণ করে ছুটল।

এরপর তারা একটি স্থানে এসে থামল। তখন দেখল, সাহাবায়ে কিরাম মদিনা থেকে পাথের হিসেবে যে খেজুর নিয়ে এসেছিলেন, তার বিচি পড়ে রয়েছে। তারা বলল, এটা তো দেখা যায় ইয়াসরিবের (মদিনা) খেজুর। (তাহলে তারা এদিকেই গিয়েছে)। তারা সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণে ছুটল। একসময় তারা গিয়ে মুসলিমদের সাথে মিলিত হতে পারল। আসিম (মুসলিম বাহিনীর প্রধান) ও তার সাথিরা তা বুঝতে পেরে (এক উপায়ান্তর না দেখে) একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় নেন।

এরপর তারা এসে সাহাবায়ে কিরামকে ঘিরে ফেলে এবং বলে, তোমরা যদি আমাদের কাছে নেমে এসে আত্মসমর্পণ করো, তাহলে আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি



দিচ্ছি—তোমাদের কাউকে হত্যা করব না। আসিম বললেন, না, কোনো কাফিরের নিরাপত্তায় আমি নামব না। (এবং তখন তিনি এই দুআ করলেন) হে আল্লাহ, আমাদের এ অবস্থা সম্পর্কে নবিজিকে জানিয়ে দেন। এরপর তারা আসিমসহ সাতজনকে তির ছুড়ে হত্যা করল।

খুবাইব, জায়িদ ও অন্য আরেকজন বাকি রইলেন। কাফিররা তাদের (হত্যা না করার) প্রতিশ্রুতি দিলো। প্রতিশ্রুতি পেয়ে তারা তাদের নিকট নেমে এলেন। তাদেরকে কাছে আনতে যখন তারা সক্ষম হলো, তখন তারা তাদের খনুকের রশি খুলে তা দিয়ে বেঁধে ফেলল।

মুসলিমদের সঙ্গে থাকা তৃতীয় ব্যক্তি বললেন—এটা প্রথম খোঁকা। তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাই তারা তাকে টানাটানি করে নিয়ে যেতে চাইল; কিন্তু তিনি রাজি হননি।

পরিশেষে তারা তাকে হত্যা করল। আর খুবাইব ও জায়িদকে নিয়ে তারা মক্কার বাজারে বিক্রি করে ফেলল। খুবাইবকে হারিসের গোত্রের লোকেরা (প্রতিশোধ নিতে) কিনল। কারণ, খুবাইব হারিসকে বদরের দিন হত্যা করেছিলেন। খুবাইব তাদের নিকট বন্দি হয়ে দিন যাপন করতে লাগলেন।

এভাবে একদিন তারা সিঁখান্ত নিল, তাকে হত্যা করা হবে। তিনি হারিসের কোনো এক মেয়ের কাছ থেকে স্কুরকর্ম করতে একটা স্কুর চেয়ে নিলেন। সে (হারিসের মেয়ে মুসলিম হওয়ার পর) বর্ণনা করেন—আমি (সেদিন) আমার শিশুসন্তানের ব্যাপারে অসতর্ক থাকার ফলে শিশুটি আন্তে আন্তে খুবাইবের কাছে চলে গেল। খুবাইব শিশুকে তার উরুতে বসাল। তার হাতে স্কুর দেখে আমি বেশ শক্তিকত হলাম (সেই বলতে পারবে—আমি কী পরিমাণ ভয় পেয়েছিলাম)। তখন সে আমাকে বলল, তুমি কি ভয় পাচ্ছ যে আমি তাকে হত্যা করে ফেলব? ইনশাআল্লাহ, আমি তা করতে যাব না। তিনি (হারিসের মেয়ে) বলতেন—আমি খুবাইবের চেয়ে ভালো কোনো বন্দিকে দেখিনি। আমি তাকে (সে সময়) দেখেছি, সে আঙুরের থোকা থেকে আঙুর খাচ্ছে। অথচ মক্কায় তখন কোনো ফল ছিল না। আবার সে জিজ্ঞারাবন্দ!

এ রিজিক আল্লাহ তায়ালা তাকেই দিয়েছেন। তারা হত্যার জন্য তাকে নিয়ে হারাম এলাকা থেকে বের হলো। তখন তিনি বললেন, আমাকে দুই রাকাত সালাত আদায়ের সুযোগ দাও। এরপর (সালাত শেষ করে) তিনি ফিরে এসে তাদের বললেন—তোমরা যদি এ কথা মনে না করতে যে, আমাকে মৃত্যুর ভয়-উৎকণ্ঠা



পেয়ে বসেছে, তাহলে আমি আমার সালাত আরও দীর্ঘায়িত করতাম। তিনিই সর্বপ্রথম সেই ব্যক্তি, যিনি হত্যার পূর্বে দুই রাকাত সালাতের নিয়ম চালু করেছেন। এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন—

ولست أبالي حين أقتل مسلماً :: على أي شق كان في الله مصرعي

وذلك في ذات الإله وإن يشأ :: يبارك على أوصال شلومزع

আমি যেহেতু মুসলিম হয়ে মৃত্যুর সৌভাগ্য লাভ করেছি, তাই আমার কোনো পরোয়া নেই যে, মৃত্যুর সময় আমি কোন পাশে ঢলে পড়ব।

আমার এ উৎসর্গ তো নিরেট আল্লাহর জন্য। তাই তিনি চাইলে আমার শরীরে কর্তৃত্ব ছিন্নবিচ্ছিন্ন প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে বরকত দান করবেন।

এরপর উকবা ইবনুল হারিস উঠে গিয়ে তাকে হত্যা করল। কুরাইশরা আসিমের নিহত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তার মৃতদেহের কিছু অংশ নিয়ে আসতে একমুদ্র লোক পাঠাল। কারণ, আসিম বদরের দিন কুরাইশদের বড়ো এক নেতাকে হত্যা করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তার (মৃতদেহের) ওপর ভিম্বুলের চাক ছাতার মতো করে দিলেন। তা তাকে কুরাইশদের প্রেরিত বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করল। তাই তারা তার মৃতদেহের কোনো অংশই নিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি।”

ইবনে ইসহাক বলেন—

আর জায়িদকে সফওয়ান ইবনে উমাইয়া কিনে নিল। তারা যখন তাকে হত্যার জন্য হারামের বাইরে নিয়ে গেল, তখন আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করল, জায়িদ, তোমাকে আল্লাহর শপথ দিচ্ছি, তুমি কি এটা পছন্দ করো যে, এখন তোমার স্থানে মুহাম্মাদ হোক? আমরা (তোমার পরিবর্তে) তার গর্দান উড়িয়ে দেবো, আর তুমি তোমার পরিবারে নিরাপদে থাকবে?

৩২৯ সহিহ বুখারি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪১; তাবারির বর্ণনায় এখানে আরেকটি বৃষ্টি করেছেন; তিনি আবু কুরাইবের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন—আমার নিকট জাফর ইবনে আউন বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবরাহিম ইবনে ইসমাইল থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, আমার নিকট জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন—নবীজি তাকে পর্ববেশে পাঠালেন। তিনি বলেন; এরপর আমি খুবাইবের (হত্যার জন্য প্রস্তুত করা) কাঠখণ্ডের নিকটে এলাম। আমার তখন পাহারাদারদের ভয় হচ্ছিল। আমি তাতে উঠে তাকে ছাড়িয়ে দিলাম। তিনি তখন মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি একটু দূরেই অবস্থান করছিলাম। এরপর আমি দৃষ্টি দিলাম। তখন খুবাইবের মৃত দেহকে দেখিনি। মনে হচ্ছিল, মাটি তাকে খেয়ে কেলেছে।...

তিনি বললেন—আল্লাহর শপথ! আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমি যে স্থানে আছি, সে স্থানে নবিজি হবেন আর তাঁকে কষ্ট দেওয়া হবে (হত্যা করা হবে)। আর আমি বসে থাকব ঘরে।

আবু সুফিয়ান তখন বলল—মুহাম্মাদের সঙ্গী-সাথিরা তাঁকে যে রকম ভালোবাসে, সে রকম কোনো মানুষ মানুষকে ভালোবাসে, তা আমি দেখিনি।”

বিরে মাউনায় নির্ভরতম ঘটনা

৪র্থ হিজরি। আমার ইবনে মালিক নবিজির নিকট এলো। নবিজি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করেনি, আবার ইসলাম থেকে বিমুখতা প্রদর্শনও প্রকাশ করেনি; বরং সে বলল—হে মুহাম্মাদ, তুমি যদি তোমার কিছু সঙ্গী-সাথিকে নজদবাসীদের নিকট পাঠাতে! তারা নজদবাসীকে তুমি যে পথের দাওয়াত দিয়ে থাকো, সে পথের দাওয়াত দিত। (তুমি তোমার সাথিদের একদল পাঠাও) আশা করি, তারা তোমার ডাকে সাড়া দেবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তাদের ব্যাপারে নজদবাসীকে ভয় করছি। আমার বলল, (সমস্যা নেই) আমি তো তাদের প্রতিক্ষী। (আমি তাদের বিষয়ে খেয়াল রাখব।) তাদের পাঠাও, তারা তোমার মিশনে মানুষকে দাওয়াত দেবে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্বাচিত সাহাবিদের সম্ভরজনের একটি জামাত সেখানে পাঠালেন। ইবনে ইসহাক ও ইবনে কাসিরের বর্ণনানুযায়ী, তা উহুদ যুদ্ধের শেষ হওয়ার চার মাসের মাথায় সফর মাসে সংঘটিত হয়। সাহাবায়ে কিরাম পথ চলতে চলতে বিরে মাউনায় গিয়ে যাত্রাবিরতি করলেন। সেখানে এরপর তারা তাদের একজনকে (হারাম ইবনে মিলহান) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র দিয়ে আমির ইবনে তুকাইলের নিকট পাঠালেন। তার নিকট চিঠি নিয়ে এলে সে তা দেখারও প্রয়োজন অনুভব করল না। উলটো বরং সেই সাহাবির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে বসল।

ইমাম বুখারি রহ. আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেন, হারামকে যখন আক্রমণ করা হলো এবং তার চেহারা রক্তাক্ত হলো, তখন তিনি উচ্চ আওয়াজে বলছিলেন—

فرت ورب الكعبة

কাবার রবের শপথ, আমি সফলকাম।



এরপর আমির ইবনে তুফাইল বনু আমিরকে বাকি সাহাবায়ে কিরামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান করল; কিন্তু তারা তার ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানাল। তারা বলল—আমরা আবু বারার (আমির ইবনে মালিক) দেওয়া প্রতিশ্রুতির খেলাফ করতে পারব না।

এরপর আমির ইবনে তুফাইল সুলাইম গোত্রের শাখা গোত্র উসাইয়্যাহ, রি'ল, জাকওয়ানকে ডাকলে তারা তার ডাকে সাড়া দেয়। তারা গিয়ে সাহাবায়ে কিরামকে বেঁটন করে ফেলল।

মুসলিমরা এ অকথায় তলোয়ার হাতে নিয়ে তাদের মোকাবিলা শুরু করলেন; কিন্তু পরিশেষে সব মুসলিমই নিহত হলেন। তবে দুজন সাহাবি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না (অপরায়িত দায়ি সাহাবায়ে কিরামের পশু চরানোর কাজে দূরে গিয়েছিলেন।) তাদের একজন আমর ইবনে উমাইয়্যা আজ-জামরি। তিনি এ নির্ধুর কাহিনি ঘটায় পর সংবাদ জানতে পারলেন। বাকি থাকা সাহাবি দুজন তাদের ভাইদের প্রতিশোধ নিতে গেলেন। আমরের সঙ্গে যে আরেকজন সাহাবি ছিলেন, তাকেও শহিদ করা হয়। আর আমর পালিয়ে মদিনার পথ ধরলেন।

রাস্তায় দুজন মুশরিকের সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি মনে করলেন, লোক দুজন বনু আমিরের। তাই তিনি তাদের হত্যা করে ফেললেন। এরপর নবিজির কাছে পৌঁছেলে নবিজির মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন, লোক দুজন বনু কিলাবের। আর নবিজি বনু কিলাবেকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যেহেতু তুমি দুজনকে হত্যা করে ফেলেছ, তাই আমি তাদের দিয়ত (রক্তপণ) দেবো।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মর্যাদাসিক ঘটনায় খুব ব্যথিত হলেন। এমনকি বনু সুলাইমের শাখা গোত্র—রি'ল, জাকওয়ান, বনু লিহয়ান, উসাইয়্যার বিরুদ্ধে বদদুআ করেন; এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাজে কুনুতে নাজিলাহ^{৩৩} পড়েন।^{৩৪}

৩৩১ কুনুতে নাজিলাহ পড়ে বনু সুলাইমের শাখাগোত্রগুলোর ওপর বদদুআ করার বিষয়ে ইমাম বুখারি ও মুসলিম তাদের কিতাবে বর্ণনা এনেছেন।

৩৩২ বিস্তারিত আরও জানতে দেখুন—সিরাতু ইবনে হিশাম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৭৩



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

ইয়াওমুর রাজি বিরে মাউনার ঘটনা দুটিতে আমাদের বেশ কিছু জ্ঞানার ও বোঝার মতো বিষয় রয়েছে, যেগুলো আমরা এই পর্যায়ে জানা ও বোঝার চেষ্টা করব—

০১.

বিরে মাউনা ও রাজির ঘটনা থেকে বোঝা যায়—সব সাহাবায়ে কিরামই ইসলামের দাওয়াত, ইসলামের প্রচার-প্রসার, মানুষকে ইসলাম বোঝানোর কাজ করতেন। বোঝা গেল, দাওয়াতের কাজ শুধু নবি-রাসুল-খলিফা বা আলিমদের ওপরই ন্যস্ত না; সবার ওপর এর দায়িত্ব।

নির্বাচিত সন্তরজন যুবক সাহাবিকে দাওয়াতের কাজে পাঠানো থেকে দাওয়াতের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যিকতা বোঝা যায়। নবিজি তাদের পাঠানোর অল্প কিছুদিনের মাঝেই তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়...

আমির ইবনে মালিক যখন নবিজির কাছে সাহাবি প্রেরণের আবেদন করছিল, নবিজি তখনই এ আশঙ্কা করছিলেন; কিন্তু প্রমাণ হলো—এরপরও নবিজি সাহাবায়ে কিরামকে কেন পাঠাতে গেলেন?

কারণ, নবিজি চিন্তা করে দেখলেন, দাওয়াত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে যদি এ রকম সমূহ আশঙ্কার মুখে পড়তে হয় হোক; তবুও দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালার ভাগ্যে যা রেখেছেন, তা-ই হবে।

০২.

আমরা আগেও এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি যে, ধর্মপালন সম্ভব না হলে দারুল কুফর বা দারুল হারবে মুসলিমদের জন্য বসবাস করা জারিজ নয়। আর যদি ধর্ম পালন করা যায়, তাহলে বসবাস করা জারিজ হলেও মাকনুহ। তবে এখন থেকে



বোঝা যায়—আবশ্যকীয় ইসলামের দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে কাফির রাষ্ট্রে বসবাস করা যেতে পারে। এটাও একপ্রকার জিহাদের অন্তর্ভুক্ত, যা ফরজে কিফায়া। কিছু মানুষ আদায় করে নিলে বাকি সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হবে।”

০৩.

আমরা যখন এ দুটি ঘটনায় মুশরিকদের হিংসা-বিষেবের ঝড় দেখছি, তাদের বিশ্বাসঘাতকতার নিষ্ঠুর উপাঙ্গান পড়ছি, তখন আমরা ঠিক এর বিপরীত মুশরিকদের ষড়যন্ত্রে পিষ্ট হওয়া সাহাবায়ে কিরামের মহানুভবতার দাঙ্গানও পড়ছি। আমরা দেখছি—খুবাইবকে হত্যার জন্য কীভাবে বনু হারিসের ঘরে আটকে রাখা হয়, আর তিনি দুর চেয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন শিশু তার কাছে হামাগুড়ি দিয়ে এলো। তার মা তখন নিখর ঘুমিয়ে। এটা তাদের হিংসা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধের সুবর্ণ সুযোগ ছিল। শিশুকে শেষ করে দেওয়ার ফুরসত এসেছিল এবং সুযোগকে কাজে লাগানোই ছিল স্বাভাবিকতার দাবি; কিন্তু ব্যাপারটা এমন হয়নি। শিশুর মা শিশুর এ অশুভ দৃশ্য দেখার কথা কখনো ভাবতে পারেনি। শিশুটি খুবাইবের কোলে ঝেঁলছে, তিনি তাকে আদর করছেন, যেন স্নেহময় পিতা তার আদুরে সন্তানটাকে মায়া বুলিয়ে দিচ্ছেন!...

তিনি শিশুর মায়ের দিকে চেয়ে যখন ভয়ের আবহ দেখতে পেলেন, তখন তিনি একজন মুমিনের শানে নিয়ে বললেন—

أَتُخْشِينَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتَ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

তুমি কি ভয় করছ যে, আমি তাকে হত্যা করে ফেলব? ইনশাআল্লাহ আমি তা করতে যাব না।

ইসলামের এই সুন্দর তরবিয়তের (দীক্ষা) কথা একটু ভাবেন। তিনি হচ্ছেন সেই অনন্য মানুষ খুবাইব। আর তারা হচ্ছে হিংসার অনলে দগ্ধ মুশরিক। তারা সবাই একই পরিবেশে গড়ে উঠেছেন, একই মাটিতে বেড়ে উঠেছেন; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর খুবাইব অনন্য মানুষ হয়ে গেলেন। আর তারা স্রষ্টার অতল গহ্বরেই



নিধর পড়ে থাকল। তাদের থেকে হিংস্রতা, রুচতা ঝরছিল। এটা ইসলামের কত বড়ো বিপ্লব, কত বড়ো অবদান!...

০৪.

এখান থেকে (আসিমের কাজ) বোঝা যায়, শত্রুর হাতে বন্দি হওয়ার পর নিরাপত্তা গ্রহণ না করার সুযোগ আছে। যদিও এ কারণে তাকে হত্যা করার ব্যাপার থাকে। আসিম এমনটাই করেছিলেন; কিন্তু সহজতা চাইলে নিরাপত্তাও গ্রহণ করতে পারে। সুযোগও গ্রহণ করতে পারে। যেমনটা করেছেন খুবাইব, জারিদ।

বিশুদ্ধ কথামতে, কাকিরদের মাঝে ধীন প্রকাশ করার সুযোগ থাকলেও যদি মুসলিম বন্দির পালানোর সুযোগ থাকে, তাহলে পালানো আবশ্যিক। কারণ, কাকিরের হাতে একজন মুসলিমের থাকা মানে লাঞ্ছনার জীবনবাণন করা। একজন মুসলিম এই লাঞ্ছনা সহ্যেতে পারে না। তাই এই লাঞ্ছনা থেকে তার নিজেকে মুক্ত করা আবশ্যিক।”

০৫.

হত্যার একটু আগে আবু সুফিয়ানকে দেওয়া জারিদ ইবনে দাসানার জবাবটি নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে, সাহাবায়ে কিরামের অন্তরে নবিজির মহত্ত্ব কী পরিমাণ ছিল! সাহাবায়ে কিরাম নবিজির প্রতি এই তীব্র ভালোবাসার কারণেই ধীনের পথে নিজেদের উৎসর্গ করতেন, সব ধরনের বিপদ নবিজির ওপর আসা থেকে প্রাণপণে প্রতিরোধের চেষ্টা করতেন।

আপনার ঈমান যত বেশিই হোক, নবিজির প্রতি এ রকম ভালোবাসা না থাকলে আপনার ঈমানে অপূর্ণতা থেকেই যাবে। এটাই বাস্তবতা, যার কথা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট বলেছেন—

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন হতে পারবে না; যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় না হব।”

০৬.

খুবাইব সন্ধ্যার বন্দি দিন ষাপনের সময় যে অলৌকিক বিষয় (ফলের মৌসুম না। ফল আসারও কোনোই ব্যবস্থা নেই; তবুও তিনি ফল পেয়েছেন) থেকে বোঝা যায়, একজন নবির পক্ষে যা মুজিজা হতে পারে, তা একজন ওলির জন্য কারামত হতে পারে। তবে এ দুটির মাঝে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে —

- এক. নবীদের মুজিজা—এটা তাঁর নবুয়তের দাবিকে সত্যায়ন করে। এখানে চ্যালেঞ্জের ব্যাপার রয়েছে।
- দুই. ওলিদের কারামত—এটা স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে, এখানে চ্যালেঞ্জের কোনো ব্যাপার থাকে না।

এটা জুমহুর আহলুস সুন্নাহর (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের বড়ো অংশের) অভিমত। খুবাইবের ব্যাপারটা এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কথা বলবে। খুবাইবের ব্যাপার প্রমাণিত সত্য। আমরা তা ইমাম বুখারিসহ অন্যান্যদের বর্ণনায় দেখেছি।

০৭.

এখানে প্রশ্ন হলো—কেন আল্লাহ তায়ালা কাফিরদের এত শক্তি দিলেন? কেন তাদের পরাজয়বরণ করালেন? অথচ তারা তো তার দ্বীন প্রসারের কাজেই গিয়েছিলেন।

জবাব একটাই—আগেও অনেকবার এ রকম জবাব দিয়েছি।

মুসলিমদের এ রকম কঠিন বিপদে ফেলার হিকমত হলো—এর মাধ্যমে পার্থক্যরেখা টানা হবে। মুনাফিক গোষ্ঠী থেকে সত্যিকার মুসলিমদের সহজে আলাদা করা যাবে। আল্লাহর রাস্তায় যারা নিজেকে বলিয়ে দিতে তৎপর, তাদের চেনা যাবে। আল্লাহ ও বান্দাদের মাঝে যেই চুক্তি হয়েছিল—

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۖ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۖ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলিমদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জannah। তারা যুশ্ব করে আল্লাহর রাহে;



অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিষ্ঠুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিষ্ঠুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের ওপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য।”

এই আয়াত এর বাস্তব রূপ প্রতিবিম্ব হবে।

এখন যদি সেই চুক্তিরই বাস্তবায়ন না হয়, তাহলে এ চুক্তির কী লাভ? বরং এ চুক্তি রাখারই—বা অর্থটা কী? যার বিনিময়ে সে চিরস্থায়ী জন্মাতের অধিকারী হবে?

দুনিয়ার পেছনে অত্যধিক ছুটে বেড়ানো, দুনিয়া যতটুকু গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল, এরচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়া এবং আশ্বিনাতের বিষয়ে সম্পৃক্ততা কম থাকা অর্থাৎ যেগুলো দুর্বল ঈমানের পরিচয় বহন করে—এগুলো এক্ষেত্রে (চুক্তি বাস্তবায়নে) মূল সমস্যা। এসব সমস্যায় জর্জরিত ব্যক্তিদের থেকে জানমালের উৎসর্গের আশা পোষা যায় না।

পক্ষান্তরে যারা প্রকৃত মুমিন, তাদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। কঠিন বিপদ তাদের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যাই না। আল্লাহর নিকটবর্তী করে—এমন কোনো একটা আনুগত্য করতে গিয়ে যদি তাকে বন্দিও হতেও হয়, তাহলে তা দুনিয়ার উপভোগের চেয়ে তার নিকট প্রিয়। তাদের প্রাণোৎসর্গের কারণ হলো—সংকীর্ণ দুনিয়ার জেল থেকে বেরিয়ে জন্মাতের দিকে যাওয়া। যা মুমিনের জীবনের চূড়ান্ত আশা। এ অনুভূত টাই খুবাইবকে হত্যার সময় তার কবিতায় ফুটে উঠেছে—

ولست بمبد للعدو تخشعا :: ولا جزعا إلى الله مرجعي

আমি শত্রুর সামনে বিনয় প্রকাশকারী নই। তাদের সামনে আমি ভীত নই, উৎকণ্ঠিতও নই। আল্লাহর কাছেই তো আমার সর্বশেষ ফিরে যাওয়া। (আমি সেখানেই সবকিছুর প্রতিদান পাব।)

* * *





বনু নাজিরের দেশান্তর

নবিজিকে হত্যার বক্তব্য

চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে এ ঘটনাটি ঘটে। ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন—

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত একদল সাহাবায়ে কিরাম নিয়ে শনিবারে বের হলেন। কুবা মসজিদে ফজরের সালাত আদায় করলেন। এরপর বনু নাজিরের কাছে গেলেন। নবিজি তাদের কিলাব গোত্রের দুই ব্যক্তি (যাদের সাথে নবিজির চুক্তি ছিল, যাদের আমরা ইবনে উমাইয়া আজ-জামরি হত্যা করে)-র দিয়তের (রক্তপণ) ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে বললেন। কারণ, বনু আমির ও বনু নাজিরের মাঝে চুক্তি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল।

ইবনে ইসহাকসহ অনেকেই বর্ণনা করেছেন—

তারা প্রত্যন্তরে বলল, হে আবুল কাসিম, আপনি যা চেয়েছেন, তা আমরা অবশ্যই পালন করব।

কিন্তু ওদিকে তারা একান্ত বৈঠক করে নবিজির ব্যাপারে ষড়যন্ত্রের জাল ফাঁদল। নবিজি বনু নাজির গোত্রের কোনো এক ঘরের দেওয়ালের পাশে বসা ছিলেন। আমরা ইবনে জাহাশ আন-নাজরি বলল, আমি ঘরের ছাদের ওপরে উঠে তাঁর মাথায় পাথর নিক্ষেপ করব।

ইবনে সাদের বর্ণনায় পাওয়া যায়—

এ কথা শুনে সালাম ইবনে মুশকিম (বনু নাজিরেরই একজন ইহুদি) বলল, তোমরা এ রকম কিছু করতে যেয়ো না। তোমরা যে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিচ্ছ, তার কথা তিনি অবশ্যই জেনে যাবেন। পরিশেষে আমাদের পারস্পরিক চুক্তি বিনষ্ট হবে।”

নবিজি তাদের এই ঘৃণা ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে দ্রুত সেখান থেকে সটকে পড়লেন। মদিনার দিকে ছুটলেন। সাহাবায়ে কিরাম তার পেছনে পেছনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি উঠে এলেন যে!

নবিজি বললেন—ইহুদিরা আমার (হত্যার) ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করেছে। আল্লাহ তায়ালা আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। তাই উঠে এলাম।

এরপর নবিজি তাদের বলে পাঠালেন—তোমরা ঘৃণা ষড়যন্ত্র করেছে, তোমরা আমার শহর থেকে বের হয়ে যাও। তোমাদের দশ দিনের সময় দিচ্ছি; এরপর যাকে দেখা যাবে, তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে।

ইহুদিরা বের হওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল; কিন্তু ইবনে উবাই তাদের বলে পাঠাল, তোমরা তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের হবে না। নিজেদের দুর্গে অবস্থান করবে। আমার সাথে আমার গোত্রের দুই হাজার লোক রয়েছে। অন্যরাও আছে। তারা সবাই তোমাদের পক্ষ হয়ে লড়বে। তোমরা বের হওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসো। নিজেদের দুর্গে আশ্রয় নাও।

মুনাফিক ইবনে উবাইয়ের এ উসকানিতে বনু নাজিরের স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার কথা জেনে নবিজি সাহাবায়ে কিরামকে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও তাদের এলাকা অভিমুখে ছুটতে আদেশ করলেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে তাদের অভিযানে বের হলেন। ইহুদিরা তখন দুর্গে অবস্থান করেছে। সজ্জা তির, পাথর; কিন্তু ইবনে উবাই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। সে তাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা রাখল না। বনু নাজির এখন মুসলিমদের সামনে অসহায়।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অবরোধ করলেন। তাদের খেজুরগাছ কেটে বিনষ্ট করে দিতে বললেন।”



তারা তখন নবিজিকে ডেকে ডেকে বলছিল—মুহাম্মাদ, তুমিই তো কোনো কিছুকে বিনষ্ট করা থেকে মানুষকে নিষেধ করতে। কেউ নষ্ট করলে তুমি তাকে দোবারোপ করতে। আর এখন তুমি নিজেই খেজুরগাছ কেটে ফেলার, তা জ্বালিয়ে দেওয়ার আদেশ দিচ্ছ!

আল্লাহ তায়ালা তাদের এ কথার জবাবে এ আয়াত নাজিল করেন—

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا فَاثِمَةٌ عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِىَ
الْفَاسِقِينَ.

তোমরা যে কিছু কিছু খেজুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশ এবং যাতে তিনি অবাধ্যদের শাস্তি করেন।”

নবিজি তাদের যেভাবে বের হতে বলেছিলেন, তার ওপর তারা আপত্তি তুলল... কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—আজ তা গ্রহণ করা হবে না। তোমরা শুধু তোমাদের রক্ত নিয়েই বের হবে। যুদ্ধান্ত্র ছাড়া উট যতটুকু মাল বহন করে নিয়ে যেতে পারে, ততটুকু মালই শুধু সঙ্গে নিতে পারবে। ইহুদিরা এ সিদ্ধান্ত মেনে নিল। তারা উটের পিঠে যতটুকু মাল বহন করা সম্ভব নিয়ে নিল।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, তাদের এক ব্যক্তি তার ঘরের ঢৌকাঠ পর্যন্ত খুলে তা উটের পিঠে করে নিয়ে চলছিল।

পরিশেষে বনু নাজিরের ইহুদিরা শাম ও খাইবারের মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস শুরু করল। তাদের মধ্য থেকে দুজন ইসলাম গ্রহণ করে। ইয়ামিন ইবনে উম্মাইর ইবনে কাব ইবনে আশ্বি আমর ইবনে জাহাশ ও আবু সায়িদ ইবনে ওয়াহাব।

ফলে তারা নিজেদের মাল ফিরে পায়।”

বনু নাজিরের সম্পত্তি নবিজির জন্যই বিশেষভাবে ছিল। এরপরও এ থেকে তিনি মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করেন। খুব দরিদ্র হওয়ার কারণে আনসারদেরও দুজনকে দিয়েছেন। সাহল ইবনে হানিফ, আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারশা। বালাজুরি ফুতুহুল কুলদানে বর্ণনা করেছেন—

৩৩৯ সূরা হাশর, আয়াত : ৫

৩৪০ বিস্তারিত আরও জানতে দেখুন—তাবাকাত ইবনি সআদ, সিরাতে ইবনে হিশাম, তারিখুত তাবারি, তাফসিরে ইবনে কাসির, সূরা হাশরের তাফসির।



বনু নাজির থেকে প্রাপ্ত খেজুরগাছের নিচে থাকা জমিতে নবিজি সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাষ করে ফসল তুলতেন। এ থেকে তাঁর পরিবার-পরিজন ও স্ত্রীদের এক বছরের খাবার চলত। আর অতিরিক্ত যা থাকত, তা তিনি মুসলিমদের অশ্রুশস্ত্রের কাজে ব্যয় করতেন।”

বনু নাজিরের ব্যাপারেই পুরো সূরা হাশর নাজিল হয়। বনু নাজিরের মাল বন্টনে নবিজি সাদ্লামাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই নীতি অবলম্বন করেছেন, এর ব্যাপারে আয়াত নাজিল হয়—

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

আল্লাহ বনু নাজিরের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যে ধনসম্পদ দিয়েছেন, সেজন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করোনি; কিন্তু আল্লাহ যার ওপর ইচ্ছা, তাঁর রাসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়স্বজনের, এতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে ধনৈর্ঘর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।”

* * *



আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

এটা ইহুদিদের চিত্রাচারিত স্বভাব—গান্দারি, খেয়ানত, বিশ্বাস ভাঙ্গা, ধোঁকাবাজির ঐতিহাসিক দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। এর আগে ইহুদিদের আরেকটি গোত্র বনু কাইনুকা এ রকম বিশ্বাসঘাতকতা করছিল।”

এটাই ইহুদি জাতির ঐতিহাসিক বাস্তবতা। এর ভূমিভূমি প্রমাণ রয়েছে। সবগুলো এখানে তুলে ধরার সুযোগ দেখছি না। তাদের এসব ঐনৈতিক কাজই তাদের বিরে ধরা আল্লাহর লানতের কারণ। কুরআন তাদের লানতপ্রাপ্তির চিত্র এভাবে তুলে ধরেছে—

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٣٥﴾

বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা কাফির, তাদের দাউদ ও মারইয়ামতনয়
ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা
অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত।”

বনু নাজিরের এই ঘটনায় আমাদের বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। ইসলামি শরিয়তের বিভিন্ন
হুকুম-আহকামের (বিধিবিধান) গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে এখানে—

০১.

আল্লাহর পক্ষ থেকে ইহুদিদের গোপন ষড়যন্ত্রে সম্পর্কে নবজিকে জানিয়ে দেওয়ার
ব্যাপারটা নবজির অন্যতম মুজিব্বা হিসেবে পরিগণিত। নবি-জীবনে এ রকম

৩৪৩ (পূর্বে ‘বনু কাইনুকা: মুসলিমদের সাথে ইহুদিদের প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা’ এ শিরোনামে অধীনে তাদের নিয়ে
বিশদ আলোচনা করেছি।)

৩৪৪ সূরা মারিগা, আয়াত : ৭৮



মুজিব্জার উপস্থিতি ঢের। শুধু যে নবুয়তপ্রাপ্তির পর ঘটেছিল তা না; নবুয়ত লাভের আগেও কিছু মুজিব্জা প্রকাশ পেয়েছিল। কেন এত মুজিব্জা? কারণ, যেন আমরা তাঁর রিসালাতের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করতে পারি।

নবিজির প্রতি কি ইলহাম হতো

কোনো কোনো সিরাতকিশারদ নবিজির এই আশ্চর্য মুজিব্জাকে ‘ইলহাম’ হিসেবে ব্যক্ত করেন। এখানে আমার আপত্তি আছে।

তাঁর ক্ষেত্রে ইলহামের প্রয়োগ হবে কীভাবে? ইলহাম জিনিসটা ব্যাপক। এটা যেকোনো মানুষের ক্ষেত্রেই হতে পারে। ইলহাম মানে, যেখানে বিভিন্ন কারিনা ও ইশারা (ইজ্জিত ও প্রসঙ্গ) থাকবে এবং এসব কিছুর সমন্বয়ে আশ্চর্যজনক কিছু ঘটবে। এটাকে ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ করা যায় না। যে কসরও ক্ষেত্রেই হতে পারে। পক্ষান্তরে সিরাতকিশারদগণের সংজ্ঞামতে, খবরে ইলাহি (আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে জানানো সংবাদ) হলো, যেটা নবুয়তের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে।

আমরা জানি, এটাই (নবিজি বেই খবরে ইলাহিতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত) সেই জিনিস; যার মাধ্যমে নবিজির ইহুদিদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেছিলেন। এটা নবিজির ব্যাপারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি—

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۝

আর আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ (অনিষ্ট) থেকে রক্ষা করবেন।”

—এই প্রতিশ্রুতিরই বিশেষ একটি অংশ। তো, ব্যাপারটি এমন হলে কীভাবে নবিজির এ বিশেষ জ্ঞানকে ‘ইলহামের পরিচয়ে কল্প করা যায়?...’

আমি মনে করি, এ ধরনের বক্তব্য মূলত নবিজির মুজিব্জাকে অস্বীকার করারই নামান্তর। আর (আমরা আগেও জেনে এসেছি) নবিজির মুজিব্জা প্রমাণ্য হওয়ার পরও তা অস্বীকারের সূত্রপাত নবিজির ব্যাপারে বিশ্বাসের দুর্বলতা থেকেই হয়ে থাকে।

০২.

বনু নাজিরের পাছ কর্তন ও ছালাফো হয়েছে—এ ব্যাপারে সবাই একমত। তবে মনে রাখতে হবে, নবিজি যা নষ্ট করেছেন, তার পরিমাণ হলো ‘যা নষ্ট



করেননি’—এর চেয়ে অনেক কম। নবিজির কাজ ছিল যথার্থ। এর সমর্থনে কুরআনের আয়াত পর্বত নাজিল হয়েছে—

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِجَ
الْفَاسِقِينَ ۝

তোমরা যে কিছু কিছু খেজুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশ এবং যাতে তিনি অবাধ্যদের লাহিত করেন।”

এখান থেকে অধিকাংশ আলিম মনে করেন, শত্রুপক্ষের ধনসম্পদ এ রকম বিনষ্টকরণে যদি ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক বা প্রধান সেনাপতি কোনো কল্যাণ দেখেন, তাহলে তা করতে পারবেন। এ মাসয়ালাটি মূলত ‘আস-সিয়াসাতুস শারইয়াহ’ (ইসলামি রাজনীতি)-এর আলোচনা।

নবিজি যে এখানে যে কাজটি করেছেন, তা কল্যাণ বুঝেই করেছেন। এখানে তার পরে ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক যারা হবেন, তাদের জন্য ইয়শাদ (নির্দেশনা) রয়েছে।

এক্ষেত্রে (শাসকের জন্য শত্রুর সম্পদ বিনষ্টকরণের বৈধতার ব্যাপারে) ইমাম শাফিয়ি রহ. আরেকটা ইম্মত (কারণ) বলেন। শামের বিভিন্ন যুশে আবু বকর রা. কর্তন বা জ্বালানো—এসব কাজ থেকে নিষেধ করেন; কিন্তু তিনিই যখন খালিদকে তুলাইহা ও বনু তামিমের অভিযানে পাঠান, তখন ‘কাটো, জ্বালাও-পোড়াও’-এর আদেশ করেন।

ইমাম শাফিয়ি রহ এ ব্যাপারে বলেন—

‘আবু বকর রা. যে ফলপ্রদ গাছ না কাটতে আদেশ করেছেন, এটা সম্ভবত এ কারণে যে, তিনি নবিজি থেকে মুসলিমদের শাম বিজয়ের সংবাদ শুনোছিলেন। সুতরাং তার জন্য কর্তন করা না-করা দুটিরই অনুমতি ছিল। তিনি মুসলিমদের কল্যাণে কর্তন না করাকে বেছে নিয়েছেন।’”

আমরা যে ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধান কোনো কল্যাণ দেখলে তার জন্য কাফিরদের সম্পদ বিনষ্ট করা গাছকাটা, জ্বালানো ইত্যাদির বৈধতার কথা বললাম, এটি নাফে (মাওলা



ইবনে উমর), মালিক, সুফিয়ান আস-সাউরি, আবু হানিফা, শাফিয়ি, আহমাদ, ইসহাক ও জুমহুর ফুকাহার (অধিকাংশ ফকিহ আলিমের) মত। তবে লাইস, ইবনে সাদ, আবু সাওর ও আউজায়ি থেকে নাজায়িজ হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত আছে।”

০৩.

যুদ্ধ ছাড়াই মুসলিমরা কাফিরদের থেকে যে গনিমত লাভ করবেন (পরিভাষায় যাকে ‘ফাই’ বলা হয়।), এতে শাসক যেভাবে কল্যাণ মনে করেন, সেভাবে তাসারবুফ (ব্যয়) করা হবে। যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মাল যেভাবে সৈন্যদের মাঝে বন্টন করতে হয়, সেভাবে তা বন্টন করা আবশ্যিক না। এ ব্যাপারে ফকিহগণ একমত। তাদের প্রমাণ—নবিজি বনু নাজিরের ফাই সব সৈন্যদের দেননি। শুধু মুহাজিরদের দিয়েছেন। কুরআনও তার এ কাজকে সমর্থন করেছে—

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

আল্লাহ বনু নাজিরের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যে ধনসম্পদ দিয়েছেন, সেজন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করোনি, কিন্তু আল্লাহ যার ওপর ইচ্ছা, তাঁর রাসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا مَتَّعْتُكُمُ الرُّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়স্বজনের, এতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য; যাতে ধনৈর্ঘর্য কেবল তোমাদের বিস্ত্রাশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ



করেন, তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ
কঠোর শাস্তিদাতা।”

কিছু যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমরা যদি ভূমি লাভ করেন, তাহলে এক্ষেত্রে আলিমগণ
ইখতিলাফ করেন। ইমাম মালিকের মত হলো—তা বণ্টনই করা হবে না। এটা
ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে থাকবে। মুসলিমদের কল্যাণের কাজে ব্যবহার হবে। তবে
শাসক যদি মনে করেন তা বণ্টন করে দিলেই ভালো, তাহলে তিনি তা করতে
পারবেন। হানাফিদের মাজহাবও প্রায় কাছাকাছি। তবে ইমাম শাফিয়ি মনে করেন,
অন্যান্য কিছুর মতো একেও বণ্টন করা আবশ্যিক। ইমাম আহমাদের মাজহাবের
জাহিরও (বাহ্যিক রূপ) এটাই।

শাফিয়ি রহ.-এর দলিল—বনু নাজিরের মালে নবিজির সাধারণ নিয়মের বিপরীত
তাসারবুফ এটা ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে। সরাসরি আয়াতই নবিজির এ কাজের ব্যাপারে
কথা বলেছে—

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيٍّ خَيْرٍ
الْفُسِقِينَ.

তোমরা যে কিছু কিছু খেঁজুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে
দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশ এবং যাতে তিনি অব্যাহতদের লালিত
করেন।”

এটা যেহেতু ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের সাথে সম্পৃক্ত, তাই ওই পরিপ্রেক্ষিতের
অনুশ্লিষ্টিতে স্বাভাবিক হুকুম করে আসবে; চাই তা ভূমি হোক বা অন্য কিছু।
আবু হানিফা ও মালিকের দলিল প্রচুর। এর মাঝে অন্যতম হলো, উমর রা.
‘সাওয়াদুল ইরাক’ (ইরাকের কৃষিসমৃদ্ধ এলাকা ও ভূমি; যা উমর রা.-এর
শাসনামলে মুসলিমরা জয় করেন) বণ্টনে নিষেধ করেন। তিনি বরং তা ওয়াকফ
সম্পত্তি হিসেবে রাখেন, যার খরাজের (ভূমিকর) মাধ্যমে মুসলিমদের লাভ হবে।
এ জটিল বিষয় নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই।

এখানে নবিজি বনু নাজিরের মাল বণ্টনে যে নীতি অবলম্বন করেছেন এবং সে
নীতির স্পষ্টকরণে যে আয়াত দুটি নাযিল হয়েছিল, সে আয়াত দুটিতে যে তালিল



(কারণ) কলা হয়েছে, তা বিশেষভাবে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা এখানে—

كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

যাতে ধনৈর্ধর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।”

তালিল হিসেবে ‘সম্পদ সীমাবদ্ধ না হওয়া’-কে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সম্পদ যেন বিত্তশালী শ্রেণির মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে না পড়ে।

এ কারণ থেকে বোঝা যায়—ইসলামি অর্থনীতি এ আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামি অর্থনীতির বিস্তার আলোচনাসম্বন্ধ বই পাঠ করলে বোঝা যাবে, ইসলামি অর্থনীতি যা চায়, তা হলো—একটি অর্থনৈতিক ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক ভারসাম্য থাকবে। যার মাধ্যমে বিদ্রোহের পথগুলো বন্ধ হবে। অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হবে না। ইসলামি অর্থনীতির বাস্তব রূপ যদি সমাজে প্রয়োগ করা হয়, জাকাত ঠিকমতো আদায় করা হয়, সুদের অবৈধতার প্রয়োগ করা হয়, গুদামজাতকরণের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, তাহলে সমাজের মানুষ শান্তির জীবনযাপন করবে। তাদের আয়ের রূপ হয়তো ভিন্ন হবে; কিন্তু সবারই যথেষ্ট পরিমাণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি থাকবে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—আল্লাহ যেহেতু এ শরিয়তের মাধ্যমে এ রকম ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করবেন, তখন এজন্য কিছু আসবাব ও ওসায়লও (উপায়-উপকরণ ও ব্যবস্থা) প্রণয়ন করবেন; যা আমাদের মানতে হবে, যা থেকে বেরোনো যাবে না। চূড়ান্ত সেই উদ্দেশ্য পৌঁছাতে হলে আল্লাহর প্রীতি সেরব ওসিলা ও আসবাবের অনুসরণ অবশ্যই করতে হবে। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত প্রমাণ রয়েছে। ইতিহাসই এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষ্য দেবে।

প্রিয় পাঠক, সূরা হাশর আবার পুরোটা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। আল্লাহ তায়ালা এ পুরো ঘটনা ও ঘটনা-সংলগ্ন বিষয়—ইহুদি, মুনাফিক, নবিজির নীতি ও রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে যে তালিক (পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন) করেছেন, তা ভালো করে ভাববেন। এ সূরা গভীর মনোযোগে পাঠ করলে আপনি এই সূরায় আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা কী কী শিক্ষা রেখেছেন, তা বুঝতে পারবেন।

* * *





অনুবাদক পরিচিত

মুসা আহাম্মদ। লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক। হিজ্র-২০০৯। দাওরা-২০১৮। ইলুমিনাতি, আরব্য রজনীর অজানা অধ্যায়, আমাদের আকিদা, ছোটোদের আকিদা তার অনূদিত-সম্পাদিত বই।

উম্মুলুজ্জাহ্ তাসনিম। দাওরা, জামিআতুল উলুমিল ইসলামিয়া ও আরবি সাহিত্য, মাদানি নগর মাদরাসা। তরুণ অনুবাদক। ইখলাস প্রথম অনূদিত বই। নবিজির মাদরাসা-সহ আরও কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশের পথে।



অনন্ত অসীম পরকালের যাত্রায় দুনিয়া হলো এক অন্ধকার,
পিচ্ছিল ও বন্ধুর পথ। এই পথ নিরাপদে অতিক্রম করতে
প্রয়োজন উপযুক্ত বাহন ও আলোর মশাল। ‘ফিকহুস সিরাহ’
মূলত আখিরাতের যাত্রাপথে আমাদের সেই বাহন ও আলোর
মশালের মতোই।

আমাদেরকে সহজ ও সরল পথ দেখানোর জন্য এখানে বর্ণিত
হয়েছে নবিজির আলোকিত জীবন, নবিজীবন থেকে প্রাপ্ত
শিক্ষা ও নির্দেশনা। যা একজন মুসলিমকে শুধু আখিরাতের
পথ-নির্দেশই নয়, দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় সফলতা কীভাবে
স্পর্শ করবে, তারও পথ বাতলে দেয়।

এই বই আমাকে, আপনাকে এবং আমাদের সকলকে
আলোকিত করবে, উজ্জীবিত করবে এবং আখিরাতের অনন্তর
যাত্রায় আমাদের মুখে হাসি ফোটাবে, এমনই প্রত্যাশা।



লেখক-পরিচিতি : ড. শাইখ মুহাম্মাদ সায়িদ রামাদান বুতি।
আরববিশ্বের প্রখ্যাত আলিম ও ফকিহ। জন্ম তুরস্কে। দ্বীনি
শিক্ষা ও দাওয়াতের স্বার্থে আমৃত্যু বসবাস করেছেন সিরিয়ার
দিমাশক শহরে।

তিনি ছিলেন মসজিদে বনু উমাইয়ার সম্মানিত খতিব, দিমাশক
বিশ্ববিদ্যালয়ে কুল্লিয়ায়ে শরিয়ার ডিন। তার রচিত গ্রন্থসংখ্যা
৬০ টি। তবে ‘ফিকহুস সিরাহ’ রচনার মাধ্যমে তিনি অনন্য
উচ্চতায় সমাসীন হন। এটি আরববিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত,
পঠিত ও সমাদৃত সিরাতের কিতাব।



Fikhus Sirah
Shayekh Said Ramadan Buti
Price BDT : 600

